আহমদ ছফার উপন্যাসে সমাজ ও জীবনের রূপায়ণ

গবেষক

মো. আলমগীর কবীর

শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-১৩

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৭৯

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মো. আবদুস সোবহান তালুকদার

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

আহমদ ছফার উপন্যাসে সমাজ ও জীবনের রূপায়ণ

মো. আলমগীর কবীর

স্বীকারপত্র

এই মর্মে স্বীকার করছি যে, 'আহমদ ছফার উপন্যাসে সমাজ ও জীবনের রূপায়ণ' শিরোনামের অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক রচনা। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল গবেষণা হিসেবে উপস্থাপিত।

অভিসন্দর্ভটির কোনো অংশ কিংবা অংশবিশেষ কোনো গ্রন্থ, পত্রিকা, সাময়িকীতে এর আগে প্রকাশিত হয়নি।

মো. আলমগীর কবীর

গবেষক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, 'আহমদ ছফার উপন্যাসে সমাজ ও জীবনের রূপায়ণ' শিরোনামের অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এটি গবেষকের মৌলিক রচনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপিত।

অভিসন্দর্ভটির কোনো অংশ কিংবা অংশবিশেষ কোনো গ্রন্থ, পত্রিকা, সাময়িকীতে এর আগে প্রকাশিত হয়নি।

ড. মো. আবদুস সোবহান তালুকদার

তত্ত্বাবধায়ক ও সহযোগী অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৬-১০
প্রথম অধ্যায়	
আহমদ ছফা : প্রসঙ্গ ও পরিপ্রেক্ষিত	১১-৩০
দ্বিতীয় অধ্যায়	
আহমদ ছফার উপন্যাসে সমাজ ও জীবনভানার ক্রমবিকাশ	৩১-৩৯
তৃতীয় অধ্যায়	
আহমদ ছফার মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব উপন্যাসে সমাজ ও জীবনের রূপায়ণ	৪০-৬০
চতুর্থ অধ্যায়	
আহমদ ছফার মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী উপন্যাসে সমাজ ও জীবনের রূপায়ণ	৬১-১৮২
উপসংহার	১৮৩-১৮৫
তথ্যপঞ্জি	১৮৬-১৯৪

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর ছয় দশকের শেষদিকে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১ খ্রিস্টাব্দ) স্বতন্ত্র একটি আসন স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বাধীনতা-পূর্ব এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্য রচনায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ব্যক্তিক জীবনের নানামাত্রিক প্রবণতা এবং তার পাশাপাশি সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের নানা ঘটনা-অঘটনাকে উপজীব্য করে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও প্রাকরণিক পরিচর্যায় নিবিষ্টমনে তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন; যার গভীরে ছিল দেশপ্রেম। আহমদ ছফা দুই হাত ভরে লিখেছেন সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে। তিনি রচনা করেছেন গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনি, গান ইত্যাদি। সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই তার বিচরণ লক্ষণীয়; তা সত্ত্বেও কথাসাহিত্যে বিশেষ করে উপন্যাস রচনায় তার সাফল্য ও প্রশংসা গবেষণাযোগ্য।

আহমদ ছফা বাঙালির আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা, শোষণ-সংগ্রাম ও রাজনীতির অন্তঃস্রোত ও বহিঃস্রোতকে ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে উপন্যাসে স্থাপন করেছেন। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ, তার পরবর্তী পাকিস্তানি সামরিক শাসনের বেড়াজাল ও রাজনৈতিক সমাজে তার প্রভাব, গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের অবস্থা এবং তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসনামলে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থা গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর উপন্যাসগুলোতে। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বাঙালি জাতির রাজনৈতিক-সামাজিক জীবনের সামগ্রিক অন্ধকার, বাঙালি জাতীয়তাবাদবিরোধী শক্তির উত্থান এবং তদ্বিপরীতে ব্যক্তি-সমষ্টির চেতনাগত পরাজয়বোধ এবংবিধ রাজনৈতিক পরিবেষ্টনে নীতিক্ষয়িষ্ণু ব্যক্তির খণ্ড খণ্ড অভিব্যক্তি ও তার আশা-হতাশার সমান্তরাল দুটি ধারা তিনি তার উপন্যাসে স্বকীয় বয়নকৌশলে গ্রন্থন করেছেন।

বিষয় নির্বাচনে সমকাল মনস্কতা ও তা বয়নের আধুনিক কৌশল শিল্পী আহমদ ছফাকে করে তুলেছে অনন্য ও গবেষণাযোগ্য- আহমদ ছফা সম্পর্কিত এই বোধ-ই আমাকে বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনায় উৎসাহী করে তুলেছে। কথাশিল্পী আহমদ ছফা রচিত উপন্যাসের সংখ্যা অল্প হলেও শিল্পমানে

এগুলোর পরিধি বিস্তর। এই শিল্পীর সৃষ্টি নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাকর্ম তেমন চোখে পড়ে না। কিন্তু বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের সাম্প্রতিকতম উৎকর্ষ ও অগ্রগতি বিবেচনায় আহমদ ছফা আবশ্যকভাবে আলোচ্য। এই আবশ্যকতাবোধ, বিশেষ করে সমাজ ও জীবন সম্পর্কে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে তার সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। আমার আগ্রহের পরিণতি দানে সহায়তা করেছেন পিতৃপ্রতীম শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. আবদুস সোবহান তালুকদার। গবেষণাকর্মটির যতটুকু সফলতা তা সম্ভব হয়েছে স্যারের একনিষ্ঠ তাগিদ ও প্রেরণার মাধ্যমে।

২.

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথমদিকে আহমদ ছফার দুটি বই পড়েছিলাম। একটি হলো 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' (১৯৭২) অপরটি হলো 'যদ্যপি আমার গুরু' (১৯৯৮)। এরপর বাংলা বিভাগের এক সেমিস্টারে 'ওঙ্কার' (১৯৭৫) আমাদের পাঠ্য ছিল। আহমদ ছফার তিনটি বই-ই ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখিত। সেই থেকে এই লেখকের প্রতি আমার প্রেম, বিশ্বাসও বহুমুখী। কারণ বহু বিষয়ে লেখকের আগ্রহ। এম.ফিল গবেষণার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর স্যারের সঙ্গে আলোচনা করলাম আহমদ ছফার বিষয়ে, জানালাম বহুদিনের লালিত আগ্রহের কথা। স্যারও রাজি হলেন আমার মতো তুলনামূলক 'পিছিয়ে পড়া' এক ছাত্রকে নিয়ে কাজ করতে। ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে এম.ফিল করার সুযোগ পাই। এমফিল প্রথম পর্বে যোগদান করি ২০ আগস্ট ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যার নিবন্ধন নম্বর- ১৭৯।

গবেষণাকর্মে চারটি অধ্যায় রেখেছি। অধ্যায়গুলো হলো 'আহমদ ছফা : প্রসঙ্গ ও পরিপ্রেক্ষিত', 'আহমদ ছফার উপন্যাসে সমাজ ও জীবনভাবনার ক্রমবিবর্তন', 'আহমদ ছফার মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী উপন্যাসে সমাজ ও জীবনের রূপায়ণ', 'আহমদ ছফার মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী উপন্যাসে সমাজ ও জীবনের রূপায়ণ।' প্রথম অধ্যায়ে ইতিহাসের মধ্যে আহমদ ছফার বেড়ে ওঠা এবং সাহিত্যমানস সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস চালিয়েছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিয়েছি বাহ্যিক দৃষ্টিতে আহমদ ছফার উপন্যাসগুলো আলাদা মনে হলেও অন্তর্জাগতিক বিচারে-বিশ্লেষণে তা আলাদা নয়, ইতিহাস কিংবা ঘটনার সময়প্রবাহ থেকে উপন্যাসগুলো বিচ্ছিন্ন কিছু নয় বরং ইতিহাসের-সমাজের একেকটি ধারাবাহিকতা মেনে সেগুলো রচিত। তৃতীয় অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ পূববর্তী সমাজ-রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করেছি এবং সবশেষ অধ্যায়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্র, তার আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে রাষ্ট্রীয়-সামাজিক-

ব্যক্তিগত হতাশা, অধঃপতন, তথাকথিত গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নানা অন্ধকার দিক, সঙ্গতি-অসঙ্গতি নিয়ে আলোচনা করেছি।

গবেষণা পদ্ধতিতে দুটি উৎসের সহায়তা নিয়েছি। প্রথম উৎস আহমদ ছফার উপন্যাসগুলো এবং দ্বিতীয় উৎস বিভিন্ন গ্রন্থ-পত্র-পত্রিকা-সাময়িকী। প্রধানত বিশ্লেষণাত্মক রীতিপদ্ধতি অনুসরণ করেছি গবেষণায়। মনোযোগ দিয়ে প্রতিটি উপন্যাস পড়ার চেষ্টা করেছি। উপন্যাসের বিষয়ভাবনা, আখ্যানবয়ন, চরিত্রায়ণ, সমাজ ও রাজনীতিভাবনার স্বরূপ লিপিবদ্ধ করেছি গবেষণায়। এ ছাড়া উদ্ভূত সমস্যা মোকাবিলায় কিংবা কোনো কোনো বিষয় জানার জন্য স্যারের সাহায্য নিয়েছি। স্যারকে কারণে-অকারণে বিরক্ত-বিব্রত করেছি, যা করেছি নিজের প্রয়োজনেই, নিজেরই স্বার্থে। স্যার আমার যাবতীয় 'অপরাধ' ক্ষমা করেছেন তার প্রমাণ মিলেছে তাঁরই একনিষ্ঠ সহায়তায়, কিঞ্চিত গ্লুকোমায় আক্রান্ত চোখ জোড়া কাজে লাগিয়ে তিনি আমার গবেষণাকর্মটির প্রতিটি লাইন পড়েছেন। আমার বক্তব্যে কিছুটা সংযোজন-বিয়োজন করেছেন। শারীরিক নানা প্রতিকূলতার মাঝেও আমার কাজটিকে এগিয়ে নিতে তিনি সহায়তা করেছেন। সুতরাং তাঁর অবদান দুই এক বাক্যে শেষ করার নয়, স্যারের প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞতা রইল। এখানে আরেকটি বিষয়টি উল্লেখ না করলে কৃপণতা প্রকাশ করা হবে স্যার নিজের পকেটের টাকা খরচ করে আমাকে আহমদ ছফার উপন্যাসসমগ্র কিনে দিয়েছিলেন। যতবার এই বইটি হাতে নিয়েছি ততবার স্যারের প্রেরণাদায়ক মুখখানা ভেসে উঠেছে। আর তাগিদ অনুভব করেছি, যথাসময়ে গবেষণা শেষ করতে হবে। স্যারও হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি গবেষণার সময় বাড়ানোর সুপারিশ করবেন না। স্যারের এই হুঁশিয়ারি আমার গবেষণাকর্মের পরিণতি দানে সহায়তা করেছে।

৩.

স্বীকার করছি, গবেষক হিসেবে আমি বয়সে তরুণ। আহমদ ছফার মতো ওজনদার শিল্পী নিয়ে পুরোপুরি আলোচনা কিংবা তাকে পুরোপুরি ধারণ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয় এবং এটি আমার এ তরুণ বয়সে একটি দুঃসাহসও। আমার ছফাকে যারা চেনেন, যাদের সঙ্গে গভীর-অগভীর মিতালি ছিল তার কিংবা আহমদ ছফাকে নিয়ে যারা কাজ করেছেন বছরের পর তারা আমার এই গবেষণাকর্মের কোনো কোনো বক্তব্যে-অংশে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। আমি বিশ্বাস করি, সাহিত্যের সমালোচনা চিরন্তন কিছু নয় বরং তা ব্যক্তির পর্যবেক্ষণ দৃষ্টিতে আলাদা। তার উপন্যাসগুলো নিয়ে আমার পর্যবেক্ষণ অন্যদের চোখে আলাদা হতে পারে এটিই স্বাভাবিক- এটিই বাস্তবতা। আহমদ ছফাকে

নিয়ে পড়ার সময় তার উপন্যাস সম্পর্কে আমার ভেতরে যে বিশ্লেষণ জমা হয়েছে এ গবেষণাকর্মে সেটিই তুলে ধরেছি। কোনো কোনো সমালোচক-গবেষক আমার বক্তব্যে দ্বিমত পোষণ করলেও আমি আমার বক্তব্যে-পর্যবেক্ষণে স্থির থাকতে চাই, তাহলে আমার অভীষ্ঠ লক্ষ্য পূরণ হবে। এটিই আমার একমাত্র সততা। আমার আরো একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা হলো আহমদ ছফা সম্পর্কে কেবল বিভিন্ন লেখা পড়েছি, এই লেখালেখির সঙ্গে সাহিত্যিক আহমদ ছফার অবয়ব কল্পনা করেছি সঙ্গে সঙ্গে। আহমদ ছফাকে দেখার মতো ভাগ্য আমার হয়নি এটিই আমার প্রধানতম সীমাবদ্ধতা। আহমদ ছফার উপন্যাস সম্পর্কে খুব বেশি লেখালেখি পাইনি সুতরাং গবেষণার ক্ষেত্রে নিজস্ব মত-বিশ্বাস-বিশ্লেষণের ওপরই আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে বেশি।

৪.

গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার পেছনে কাছের দূরের অনেক মানুষ প্রেরণা দিয়েছেন। আমার বাবা-মা আমাকে প্রেরণা দিয়েছেন এই বলে যে, যা-ই করি তা যেন ভালোভাবে শেষ করতে পারি। বন্ধুমহলে এহসানুল হাবিব, আবুল কাসেম খান প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিয়েছে নানাভাবে। আমার কলেজ শিক্ষক হাসান অরিন্দম, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান, অধ্যাপক ড. গিয়াস শামীম, সহকারী অধ্যাপক মোমেনুর রসুল নানাভাবে সহায়তা করেছেন। বিশেষ করে মোমেনুর রসুল স্যার তার সংগ্রহে থাকা আহমদ ছফা বিষয়ক নানা লেখা আমাকে সরবরাহ করেছেন। স্যারকেও নানাভাবে বিরক্ত করেছি।

বড় ভাইয়ের মধ্যে মনোজ কুমার দে'র নাম উল্লেখ না করলেই নয়। তিনি আমার গবেষণাকর্মের কাজ অনেকখানি সহজ করে দিয়েছেন সূচিপত্র তৈরি করে। এছাড়া আহমদ ছফা বিষয়ক কোনো আলোচনা, কিংবা কোনো বই দরকার হলে দাদা আমাকে উপায় বের করে দিয়েছেন, দাদার চোখেমুখে একটুও বিরক্তিভাব দেখিনি। এ ছাড়া আমার বড়ভাই অ্যাডভোকেট শফিউদ্দীন আহমেদ, সহকর্মী শ্রদ্ধাভাজন হোসেন শহীদ মজনু, ড. কাজল রশীদ, ওয়াহিদ সুজন নেপথ্যে প্রেরণা দিয়েছেন। তারা প্রয়োজনীয় দুই একটি বই ধার দিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক শরীফ সিরাজ ও ইসলামের ইতিহাস বিভাগের আবুসালেহ সেকান্দার ভাই, এম. ফিলের সহপাঠী মো. জাহাঙ্গীর আলম প্রেরণা দিয়েছেন।

এ ছাড়া আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন অধ্যাপক ড. সলিমুল্লাহ খান। তার সঙ্গে মোবাইলে বেশ কয়েকবার কথা হয়েছে, তিনি আমাকে প্রয়োজনীয় রেফারেন্স দিয়ে কৃতজ্ঞ করেছেন। এ ছাড়া আহমদ

ছফার ভাইয়ের ছেলে সাহিত্যিক নূরুল আনোয়ার, সাহিত্যিক স্বকৃত নোমান, সর্বজন পত্রিকার সম্পাদক আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান আমাকে সহায়তা করেছেন। এই মুহূর্তে নাম মনে না আসা অগণিত মানুষের কাছেও আমি ঋণী।

সবচেয়ে বেশি ঋণী আমার স্ত্রী নীলা আকতারের কাছে। সাংসারিক-পারিবারিক নানাচাপে মাঝে মাঝে আমি হতাশ হয়েছি। ভেবেছি যথাসময়ে হয়ত আমার গবেষণাটি শেষ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার স্ত্রী আমাকে প্রেরণা দিয়েছে, কাজ করার সাহস দিয়েছে। নিজে নানা অসুবিধা-চাপ মাথায় নিয়ে আমার গবেষণাকর্মে সহায়তা দিয়েছে। আমার একমাত্র ছেলে রাতিব রিয়ানকে আমি প্রতিনিয়ত ঠকিয়েছি। কাজের প্রয়োজনে তার সঙ্গে স্বার্থপরের মতো আচরণ করেছি, তাকে বঞ্চিত করেছি বেশ কয়েকমাস পিতার স্নেহ থেকে। কখনো মনে হয়েছে আমি স্বার্থপর স্বামী, স্বার্থপর বাবা।

আমি কৃতজ্ঞ আমার স্ত্রী ও ছেলের প্রতি। আমার স্বার্থপরতার এই কলঙ্ক মোচন করতে চাই তাদের প্রতি আজীবন ঋণী থেকে।

প্রথম অধ্যায়

আহমদ ছফা : প্রসঙ্গ ও পরিপ্রেক্ষিত

আহমদ ছফা : প্রসঙ্গ ও পরিপ্রেক্ষিত

আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১) একাধারে প্রতিবাদী, আপসহীন, নির্ভীক, প্রাণোচ্ছল, জীবনবাদী এবং সমাজ-সচেতন এক লেখকসত্তা। সাহিত্যের বহুমুখী শাখায় তার সফল পদচারণা। বাংলাসাহিত্যের বহুলমাত্রিক এই লেখকের জন্ম চট্টগ্রামের নিভৃত গ্রাম গাছবাড়িয়ায়। তৎকালীন এক কৃষক পরিবারে জন্ম তার। আহমদ ছফা এসেছিলেন বাংলাদেশের গ্রামসমাজ থেকে। কৃষকজাতির ভেতর তিনি জন্মেছিলেন। (সলিমুল্লাহ ২০১৩ : ৩৫)। ছফার ভাষায় যে পরিবার বাঙালি মুসলমান পরিবার।

এই বাঙালি মুসলমান কারা, বাঙালি মুসলমানের স্বরূপই বা কী; এ নিয়ে নানাদর্শন নানা মতবাদ-মতভেদ থাকতে পারে। তবে বিষয়টির সুরাহা করেছেন ছফা নিজেই। বাঙালি মুসলমান সমাজের পরিচয় সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'যারা বাঙালি এবং একইসঙ্গে মুসলমান, তারাই বাঙালি মুসলমান।' (ছফা : ২০০৬ : ৩৬)

আহমদ ছফা এও বলেন, আমি নিজে জাত চাষা। অনেকে চাষার ছেলে আসল পরিচয় দেয় না। তাদেরকে মনে করে জঞ্জাল। আমি মনে করি না। আমি দারিদ্রকে আমার অলঙ্কার মনে করি। (নাসির ২০০২ : ১৭)

এক জটিল, এক বিচিত্র সময়ে আহমদ ছফার জন্ম। একদিকে দেশ পরাধীনতার নিগড়ে বন্দি হতে চলছে ব্রিটিশ শাসনের কারসাজিতে। বাংলার প্রতি চলছে নানা ষড়যন্ত্র অপরদিকে চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ওই বছরেই যুদ্ধের প্রভাবে সৃষ্ট মন্বন্তরে বাংলা প্রদেশে লাখ লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল। সর্বভারতীয় বিশেষ করে বাংলার রাজনীতি ও সমাজজীবনে হিন্দু-মুসলমানের জাতিগত প্রশ্ন এবং এ

সংক্রান্ত বিরোধ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর রামমোহন-মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথের পরে নজরুল ইসলামের যুগও প্রায় শেষ হয়েছে। ঠিক এমন সময়ে জন্মলাভ করেন আহমদ ছফা। এরপর আসে বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক নানা পটপরিবর্তন। পূর্ব-বাংলার রাজনৈতিক সামাজিক জীবনে সে সময় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। যে সব ঘটনার মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ করেছেন আহমদ ছফা, গঠন করেছেন মানস।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সূর্য তুমি সাথী' ২১ বছর বয়সে প্রকাশিত হয়েছে তার আগেই আহমদ ছফা নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন, ইতিহাসের নানা ঘটনাবলির সঙ্গে নিজের বোঝাপড়ার বোধ নিশ্চিত করেছেন। পরবর্তী সময়েও এই বোঝাপড়ার মধ্যেই ছিলেন অঅহমদ ছফা। তবে তাকে সাহায্য করেছে ইতিহাস। বিশেষ করে ১৯৬৬ সালের ছয়দফা উত্থাপন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ আহমদ ছফার মানসলোকে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। এ ছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশের নানা ঘাত-প্রতিঘাত তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসনের নানা বাস্তবতা অবলোকন করেছেন নিজের চোখে।

আহমদ ছফার জীবনকে আমরা পাঁচ ভাগে ভাগ করতে পারি। ঢাকার মানুষের অন্তরালে তাঁর জীবনের প্রথমে ১৮টি বছর আমাদের প্রায় অজানা। অনেকের সাথে চাটগাঁয়ে রেল লাইন উপড়ে ফেলেছিলেন যে সময়ে সেটি জীবনের প্রথমপর্ব। তারপর ঢাকা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া। তৃতীয় সময়টা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চতুর্থটি হলো ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধ ও রাজনীতি এবং পঞ্চম জীবন হলো শাহবাগ কেন্দ্রীক যোগাযোগ।

এ ছাড়া ব্যক্তিনির্ভর বা ব্যক্তিসম্পর্কের দুটো গুরুত্বপূর্ণ পর্ব আছে আহমদ ছফার। ব্যক্তি প্রথমজন প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক এবং দ্বিতীয়জন শিল্পী এস এম সুলতান।

প্রফেসর আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে আহমদ ছফার সম্পর্কের নানা বর্ণনা 'যদ্যপি আমার গুরু' (১৯৯৮) বইয়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া কিছু সাক্ষাৎকার-বিভিন্ন লেখায় এ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক ছাত্র আহমদ ছফাকে জ্ঞানের সাগরে ডুব দিতে শিখিয়েছিলেন। জ্ঞানের রাজ্যে 'সাগর সেঁচার কাম' করতে গিয়ে আহমদ ছফা শেষ পর্যন্ত নিজের গবেষণার পরিণতি আনতে পারেননি। ছফা বলেন :

> প্রফেসর আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আমার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহের একটি। দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা নির্মাণে, নিষ্কাম জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে প্রচলিত জনমত উপেক্ষা করে নিজের বিশ্বাসের প্রতি

স্থিত থাকার ব্যাপারে প্রফেসর আবুদর রাজ্জাকের মত আমাকে অন্য কোনো জীবিত বা মৃত মানুষ অতটা প্রভাবিত করতে পারেননি। প্রফেসর রাজ্জাকের সান্নিধ্যে আসতে পারার কারণে আমার ভাবনার পরিমণ্ডল বিস্তৃত হয়েছে, মানসজীবন ঋদ্ধ এবং সমৃদ্ধতর হয়েছে।

ছফা আরো লিখেছেন :

'আমার একটা অপরাধবোধ রয়েছে। প্রচলিত নিয়ম ভেঙে সুযোগ দেয়ার পরও আমার পক্ষে পিএইচডি করা সম্ভব হয়নি। একা একা যখন চিন্তা করি আমার মনে একটা অপরাধবোধ ঘনিয়ে আসে।...পিএইচডি শেষ করতে না পারার যে বাস্তব কারণ তার জন্য প্রফেসর আবদুর রাজ্জাককে আমি দায়ী মনে করি। (ছফা ২০০০ : ১৮৪)

এছাড়া ছফার জীবনযাপনে এস এম সুলতানের প্রভাব ছিল অপরিসীম। অসীম সাহা লিখেছেন, অনেকদিন যোগাযোগ না থাকলেও খবর পাই, ছফা ভাই নানা ধরনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। শিল্পী এস এম সুলতানের প্রভাবে তিনি বড়ো চুল রাখতে শুরু করেন, হাতে বাঁশি তুলে নেন এবং তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী হয়ে ওঠে একটি টিয়া। সুলতানের সঙ্গে আহমদ ছফার চেহারায় অনেকটা মিল থাকায় লম্বা চুল, বাঁশি এবং টিয়াতে তাকে বেশ মানিয়ে যায়। সম্ভবত সুলতানের সংস্পর্শে তার ভেতর শিল্পী হওয়ার বাসনা তীব্র হয়ে ওঠে। তিনি একদিন ছবি আঁকা শুরু করেন। চলতে থাকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। (অসীম ২০০৩ : ৮৭)

ছফার আরেকটি তাৎপর্যময় সময় যেখানে তিনি জীবনের ইতি টানছেন, সেখান থেকে তাঁর প্রতি আমাদের আকর্ষণ-ব্যাকুলতা ক্রমাগত বাড়ে সেটি হলো আজিজ সুপার মার্কেটে তার অবস্থান, নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলার রাজনীতি-অর্থনীতি, সামাজিক ইতিহাসের যে বিকাশ, পরিবর্তন, রূপান্তর, স্থায়িত্ব; সে সব অনেক ঘটনার সাক্ষী আহমদ ছফা। লেখকের এই সাক্ষীরূপ বজায় থেকেছে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত। আহমদ ছফা দেখেছেন পূর্ব-বাংলার গর্জে ওঠা, দেখেছেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রসবযন্ত্রণা, দেখেছেন শিশু বাংলাদেশের বিকাশ, দেখেছেন কিশোর বাংলাদেশের বিপথগামিতা। দেখেছেন ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন ভঙ্গের বাস্তবতা। আহমদ ছফার জীবনের বারো আনাই ঢাকা শহরে কাটে। মুক্তিযুদ্ধের প্রায় একবছর কলকাতায়, শেষ জীবনের একবছর জার্মানি আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সফর করেন। বাংলাদেশের চলনশীল কৃষক পরিবার আর উদিত শহরের নতুন বড়লোকদের একাংশ তার লেখায় জড় হয়েছে।

আহমদ ছফা নিজেই লিখেছেন 'আমি একটা ইতিহাসের ভেতর থেকে উঠে এসেছি।' প্রত্যেক মানুষ ইতিহাস থেকে বেরিয়ে আসেন, কেউ বেরিয়ে আসা সম্পর্কে সচেতন, কেউ নির্বিকার। আহমদ ছফা সচেতনভাবে উপলব্ধি করেছেন তিনি ইতিহাসের উৎপাদ। ইতিহাসের গতি সম্পর্কে যেহেতু তিনি সচেতন সে কারণে গতিমুখ নির্ধারণে ভূমিকা রাখার একটি প্রচেষ্টা তার সাহিত্য সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে লক্ষ করা যায়। বিশ শতকের পাঁচের দশকের ও ছয়ের দশকে পাকিস্তানি আমলের রুদ্ধবাক পরিবেশে অনেক বামপন্থী চিন্তাধারার মানুষ মনে করতেন বিপ্লব ছাড়া মানুষের মুক্তির কোনো উপায় নেই। মুক্তির মূর্তমান দৃষ্টান্ত ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণপ্রজাতন্ত্র চীন। পত্রিকায় বের হতো ভিয়েতনাম যুদ্ধের খবর। সুতরাং ভিয়েতনাম যে মানুষকে চীন- সোভিয়েতের বিপ্লবাত্মক পথের যৌক্তিকতার দিকে আকর্ষণ করিয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ছফা স্কুলজীবন থেকেই বিপ্লবের দিকে ঝুঁকেছিলেন। সেই পথযাত্রায় তিনি আসহাবুদ্দিন, সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, অজিত গুহ অনেকের সংস্পর্শে এসেছিলেন। (মুসা ২০০৩ : ৫৪)

ছফার জন্মের পাঁচ বছরের মাথায় দেশভাগের সূচনা, ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর আইউব খানের সামরিক শাসন শুরু হয়। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী চেতনাকে অবরুদ্ধ করার চেষ্টা চলে সক্রিয় রাজনৈতিক নেতৃবর্গকে করা হয় কারারুদ্ধ। জাতির সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের গতিও এর ফলে বাধাগ্রস্ত হয়। পাঞ্জাবি বেনিয়া পুঁজিবাদী শক্তি তাদের শাসন ও শোষণকে দৃঢ়মূল করার লক্ষে কেবল রাজনীতি-ক্ষেত্রেই নানামুখী পদক্ষেপ নিলো না- সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে তারা সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিএনআর, প্রেস ট্রাস্ট, পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড (পূর্বাচল শাখা) ইত্যাদি সংস্থা যেমন প্রতিষ্ঠা করা হলো- তেমনি আদমজি, দাউদ ও অন্যান্য পুরস্কার প্রবর্তন এবং উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। (সুকুমার ১৯৮৮ : ২০০)

সামরিক আইন প্রবর্তন, প্রকাশ্য রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা, গণতন্ত্রের অবয়বে স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বাঙালি জনগোষ্ঠীর সংগ্রামশীল চেতনাস্রোতকে সাময়িকভাবে স্তব্ধ করতে সক্ষম হলেও জাতিসত্তার গভীরে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও দ্রোহ ক্রমাগত পুঞ্জীভূত হতে থাকে। চার বছর পর সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। তারপরও পশ্চিম পাকিস্তানি ষড়যন্ত্র থেমে ছিল না। প্রকৃতপক্ষে নব-উপনিবেশবাদী পাকিস্তানি শাসকচক্র পূর্বাঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিটি গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ফলে জনমানসে ক্রমশ প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে ওই

চক্রের বিরুদ্ধে। ছাত্রসমাজের নানামুখী আন্দোলন স্বৈরাচারী ও গণবিরোধী প্রশাসনের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (রফিকউল্লাহ ১৯৯৭ : ৯৯)

ঠিক এই কালপর্বে আহমদ ছফা ঢাকায় আসেন। বলা যায়, তার জীবনের বারো আনা কেটেছে ঢাকার বুকে। সুতরাং ইতিহাসের ধারাবাহিক ঘটনার সঙ্গে সরাসরি যোগসূত্র স্থাপন করতে শুরু করলেন তিনি। আহমদ ছফা যখন ঢাকায় আসেন তখনো পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম মাত্রায় পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। জাতীয় মুক্তির চিন্তা-তখনো মানে ১৯৬২ সন নাগাদ-বিকাশের প্রথম পর্যায়। এই পর্যায়ে লোকে সচরাচর আবেগ বলে। তরুণ হৃদয়ে যে চিন্তার অধিষ্ঠান তাকে আমরা আবেগই বলি। আহমদ ছফা দেশের মানুষের মুক্তির পথ হিসেবে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছিলেন।

কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের চলতি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতারা জাতীয় মুক্তির বিষয়টি ঠিকমতো আমল করতে না পারায় তরুণ আহমদ ছফা জাতীয় সংগ্রামের প্রশ্নে উদীয়মান মধ্যশ্রেণির আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেন। এই আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম হয়ে ওঠে। (সলিমুল্লাহ ২০১৩ : ৫৯)

এরপর ১৯৬৪ সালের ৩ জানুয়ারি মুসলিম লীগের কনভেশন কাশ্মীর দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এ থেকে সৃষ্টি হয় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। বিভাগোত্তরকালে ভারত থেকে আগত বিহারী মুসলমানরা দাঙ্গার মূলশক্তি হিসেবে কাজ করে। এই দাঙ্গার পশ্চাতে ছিল মোনায়েম খাঁর শাসনাধীন পূর্বপাকিস্তান সরকার। সরকারি ঈঙ্গিত পেয়ে বিহারীরা দাঙ্গা শুরু করে। কিন্তু দাঙ্গার ভয়াবহতার মধ্যেও বাঙালি জনসাধারণ বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী দাঙ্গা প্রতিরোধ ব্যাপারে বিস্ময়কর ঐক্যের পরিচয় দেন। বাঙালি মালিকাধীন ঢাকার সকল পত্রিকা একযোগে একইদিনে 'বাঙালী রুখিয়া দাঁড়াও' শিরোনামে অত্যন্ত জোরালো সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ১৯৬৫ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আইউব খান জয় লাভ করেন। আইউব খান জয়ের মাধ্যমে রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ শুরু হয় অন্যদিকে বিরোধী শিবিরে চলতে থাকে গণমুখী কর্মসূচির নানা ইঙ্গিত। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ১৪ দফা দাবি ঘোষণা করে। এই ১৪ দফা দাবি অর্থনীতি-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনগণের সামনে ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিত উন্মোচন করে দেয়।

১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসেন সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ইস্যুভিত্তিক কর্মসূচি নিয়ে পুনর্গঠিত রূপে আত্মপ্রকাশে সচেষ্ট হয়। আওয়ামী লীগের পাশাপাশি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির রাজনৈতিক সম্ভাবনা থাকলেও আদর্শগত

বিরোধ আর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে সংগঠনটি জনজীবনে পরবর্তীতে আবেদনের ধারাবাহিতা ধরে রাখতে পারেনি। এগিয়ে যায় আওয়ামী লীগ।

অস্থির এক রাজনৈতিক সময়ে ১৯৬৬ সালে অল পাকিস্তান ন্যাশনাল কনফারেন্সে শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। ১১ ফেব্রুয়ারি দেশে ফেরার পর আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতি ও তাজউদ্দীন আহমদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে প্রকৃতপক্ষে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের গতি তীব্রতা লাভ করে (হাসান ১৯৮২ : ২৫৯)।

আওয়ামী লীগের নেতারাও ছয় দফার প্রচার-প্রচারে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। বাংলার জনগণের মধ্যে ছয়দফার মর্মবস্তু তুলে ধরতে সচেষ্ট হয় আওয়ামী লীগ। কয়েকদিনের মধ্যেই ছয় দফা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ছয় দফার ব্যাপক জনপ্রিয়তায় শাসকগোষ্ঠী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠে।

১৯৬৬ সালের ৫ মে নারায়ণগঞ্জে মে দিবসের এক জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তৃতা রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান। এর পরদিন শেখ মুজিবকে কারাগারে যেতে হয়। এ সময়ে বারবার শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শাসকচক্রের অমানবিক আচরণ অব্যাহত থাকে (কাসেম ১৯৭২ : ৪১৫)।

রাজনৈতিক ঘটনাবলির ধারাবাহিকতায় আসে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান। বাংলাদেশের সচেতন ও সংগ্রামী ছাত্রসমাজ তাদের ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে ১৯৬৯ সালের ১৭ জানুয়ারি 'দাবি-দিবস' পালন করে। সমাবেশের পর ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল অগ্রসর হলে ছাত্রদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস ছোড়া হয়। পুলিশের এই নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৮ জানুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ কওে পুনরায় মিছিল বের করলে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি পাল্টে যায়; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় খণ্ডযুদ্ধ দেখা দেয়। ২০ জানুয়ারি ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান শহীদ হন। (হাসান ১৯৮২ : ৪৩৮)

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয়। ১৮ তারিখে সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. সামসুদ্দোহা। এ সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সান্ধ্য আইন অগ্রাহ্য করে মানুষের ঢল নামে

ঢাকার রাজপথে। সমগ্র রাত ভরে শোনা যায় আন্দোলনকারীদের স্লোগান আর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বুলেটের আওয়াজ। সরকারি হিসাব অনুসারে সে রাতে নিহতের সংখ্যা ছিল ৩৯। সরকার গণজাগরণের প্রচণ্ডতায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দিকে মুক্তি দেয়।

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে রেসকোর্সে গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান। সংখ্যাসাম্য নয়, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবি উঠে আসে শেখ মুজিবুর রহমানের ওই বক্তৃতায়। গণসংবর্ধনায় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঐতিহাসিক ১১ দফা বাস্তবায়নের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানায়। দেশের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধানকল্পে প্রেসিডেন্ট আইউব খান রাওয়ালপিন্ডিতে সর্বদলীয় গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করলে সদ্য কারামুক্ত শেখ মুজিবুর রহমান সেখানে যোগ দেন। শেখ মুজিবুর রহমান বৈঠকে ছয়দফা দাবি ও ১১ দফা বাস্তবায়নের তাগিদ দেন। দুই দফা অনুষ্ঠিত বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মতি জানায়। দৃশ্যত বৈঠক ব্যর্থ হলেও সর্বজনীন ভোটাধিকারভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং সংসদীয় গঠনতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন দাবি দুটো গৃহীত হয়। ১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ বেআইনিভাবে সামরিক বাহিনী প্রধান ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন আইউব খান। ইয়াহিয়া খান সমগ্র দেশে সামরিক আইন ঘোষণা করেন।

১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা করেন এবং আইনগত কাঠামো আদেশ ১৯৭০ পেশ করেন। এর ভিত্তিতে ৩০০টি আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১৬২টি আসন নির্ধারিত হয়। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে।

আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়ে পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠী কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রে এসে দাঁড়ায় পাঞ্জাবি বেনিয়া পুঁজির মদদপুষ্ট জাতীয় পরিষদে ৮৮ আসন লাভকারী পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং প্রধান সেনাপতি ইয়াহিয়া খান। ডিসেম্বরের ২০ তারিখে ইয়াহিয়া খান লাহোরে ঘোষণা করেন যে, পিপলস পার্টি জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের আসনে বসবে না। (হাসান ১৯৮২ : ৪৩৮-৫৯০)

বেশিদিন যেতে না যেতেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের অগণতান্ত্রিক চেহারা বের হয়ে এলো। শুদ্ধ মুসলমান অভিধা দিয়ে পূর্ব-বাংলার নির্যাতিত মানুষগুলোকে বেশিদিন দাবিয়ে রাখা গেল না। জাতীয় মুক্তি

সংগ্রামের দুটি লক্ষ্য ধীরে ধীরে মূর্ত হয়ে ওঠে। চলমান অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যেই ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দেন শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ মুজিবুর রহমানের রেসকোর্সের ভাষণের পর 'ঘরে ঘরে দুর্গ' গড়ে ওঠে। পশ্চিম পাকিস্তানের যাঁতাকল থেকে বেরিয়ে আসতে চায় পূর্ব বাংলার মানুষ। তারা 'ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র' গঠনের সংগ্রামে অংশ নেয়। স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা তীব্র থেকে তীব্র হতে শুরু করল।

আহমদ ছফা লিখেছেন :

> ইতিহাসে কোনো কোনো সময় আসে যখন একেকটা মিনিটের ব্যাপ্তি, গভীরতা এবং ঘনত্ব হাজার বছরকে ছাড়িয়ে যায়। আমাদের জীবনে একাত্তর সাল সেরকম। একাত্তর সাল যারা দেখেছে, ঘটনাপ্রবাহের মধ্যদিয়ে যারা বড় হয়েছে, একাত্তর সালের মর্মবাণী মোহন সুন্দর বজ্রনিনাদে যাদের বুকে বেজেছে তারা ছাড়া অন্য কেউ একাত্তরের তাৎপর্য উপলব্ধি করবে পারবে আমার তেমন মনে হয় না। (ছফা ২০০০ : ১২০)

কেবল আহমদ ছফা স্বাধীনতা পূর্ব ইতিহাসের পরম্পরায় সীমাবদ্ধ থাকেননি। তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন নরকযন্ত্রণা উপভোগ করেছেন প্রতিমুহূর্তে, দেশ ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছেন কলকাতায়। উদ্বাস্তু মানুষের জীবনসংগ্রাম দেখেছেন নিজের চোখে। নরকযন্ত্রণার মধ্য দিয়েই এক সময় দেশ স্বাধীন হলো। দেশে ফিরে এলেন শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতা উত্তরকালে তিনি দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশে দেখা দেয় নানা বিশৃঙ্খলা। ঘাতকদের গুলিতে পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্যসহ তিন বছরের মাথায় নিহত হন শেখ মুজিবুর রহমান। এরপর ক্ষমতায় আসেন জিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমান ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। সাধারণ মানুষ ভেবেছিলেন জিয়াউর রহমানের ক্ষমতায় আসার মধ্যদিয়ে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। কিন্তু নিরাশ হতে হলো বাংলাদেশের জনগণকে। একাত্তর সালের যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলার মানুষ যে বিপ্লব বয়ে এনেছিল সেই 'বিপ্লব বেহাত' হলো।

জিয়াউর রহমানও নিহত হন। এরপর ক্ষমতায় জেঁকে বসে স্বৈরাচার। সেনা শাসনের আড়ালে এ স্বৈরাচার তার আসন নিশ্চিত করেছিল। কখনো এ স্বৈরাচার এসেছে গণতন্ত্রের লেবাসে। আসল কথা জনগণের 'বিপ্লব বেহাত হলো'। (সলিমুল্লাহ ২০১৩ : ৯৯)।

আহমদ ছফার মানস সম্পর্কে আলোচনার সুবিধার্থে ইতিহাসের নানা পটপরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা। আহমদ ছফা নিছক সাহিত্যিক নয়, তিনি কেবল লেখার জন্য অবারিতভাবে লিখে চলেননি; তার

কলম হয়েছে সমাজের বিদ্যমান অসঙ্গতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বাধাহীন উচ্চারণে বর্ণনা করেছেন 'নিরেট সত্য।' যা কিছু লিখেছেন আহমদ ছফা দায়বোধ প্রকাশ করেছেন সমাজের প্রতি, সমাজের প্রতি। তিনি ছিলেন 'ব্যক্তি ও লেখক সত্তায় এক'। মানে 'ক্ষ্যাপাটে।' আহমদ ছফা বলেন :

> সম্ভবত আমি লেখকদের মধ্যে প্রতিনিয়ত অন্যায়ের প্রতিবাদ করে বলেছি। আপোষ আমি করতে জানি না। আমার জন্মই হয়েছে ভয়ঙ্করভাবে বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। (নাসির ২০০২ : ২১)

আহমদ ছফা এও বলেন :

> আমি কোনো ব্যাপারে নিজেকে একেবারে আসল সাহসী বীর পুরুষ, এ দাবি করি না। আমি কিছুটা ক্ষ্যাপাটে, কিছুটা বোকা, কিছুটা ধূর্ত, কিছুটা স্বার্থপর, এরকম মানুষ। আমি নিজেকে কোনো মহাপুরুষ মনে করি না। (নাসির ২০০৪ : ৩৯)

আহমদ ছফা বিশ্বাস করতেন লেখালেখিতে অবশ্যই লেখককে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। দায়বোধ না থাকলে সে লেখা ব্যর্থ তবে লেখকের দায়বোধ ও সমাজের অন্য আরো মানুষের দায়বোধের মধ্যকার পার্থক্য আছে। আহমদ ছফা বলেন :

> আমার কথা হলো লেখত যদি দায়বদ্ধতা স্বীকার না করেন তাহলে তিনি লিখবেন কেন? অন্য কাজ করলেও তো পারেন। রাজনীতিবিদদের দায়বদ্ধতা এবং লেখকের দায়বদ্ধতা এক নয়। রাজনীতিবিদ বারবার দল এবং দল পরিবর্তন করেও টিকে থাকতে পারেন। একজন লেখকের পক্ষে সেটা সম্ভব হয় না। (নূরুল ২০১৩ : ৬০)

আহমদ ছফা দেশকে ভালোবেসেছেন প্রাণ খুলে। তার মতো দেশকে এমন গভীর অনুভব করতে পারা এত সহজ কথা নয়। দেশ-দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল গভীর, অন্তরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কোনো মতবাদের ছাঁচে সে- ভালোবাসাকে ঢালাই করতে কিংবা আদর্শের হাঁড়িকাঠে তাকে উৎসর্গ করতে তিনি রাজি ছিলেন না। এ ব্যাপারে রাইট অর রং দিস ইজ মাই কান্ট্রি- প্রায় এ মনোভাব দ্বারাই তিনি চালিত হতেন। আর এখানে তিনি ছিলেন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থেকে আলাদা, সাধারণ মানুষের কাছাকাছি বা তাদের একজন। (মোরশেদ ২০০২ : ৩৩)

নিজের জাতিকে এমন গরিমার সহিত ভালোবাসেন, আহমদ ছফার তেমন সমান বা দ্বিতীয় জীবনে আজও আমার এই অল্প জীবনের সজ্ঞার মধ্যে পড়ে নাই। তাঁর সকল লেখার গোড়ায় এই ভালোবাসা। এই ভালোবাসার জোরেই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে, ১৯৭১ সালের সশস্ত্র সংগ্রামে,

মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন, স্বাধীনতা বাংলাদেশের হাজার বছরের পুরনো সমাজে নতুন জীবন গড়ার সুযোগ নিয়ে আসবে। সে আশা পূরণ হয় নাই তাঁর। বাংলাদেশের সমাজ তবু থেমে থাকে নাই। আহমদ ছফার লেখা প্রায় সকল কাহিনী এই আমারও ভালোবাসার, এই নিরাশা ও কশাঘাতের সাক্ষী। (সলিমুল্লাহ : ২০০৪, ভূমিকা)

আহমদ ছফা ছিলেন সৃজনশীল, মৌলিক সাহিত্যিক। তার বড় একটি দিক হলো তিনি নিজের মতো করে সময়কে ধরতে পেরেছেন, নিজের মতো তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সার্বজনীন করতে চেয়েছেন এবং নিখুতভাবে সেগুলো তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন।

'জিনিয়াস' বলতে যা বোঝায় আহমদ ছফা সেই ধারার লেখক। জিনিয়াস শব্দটিকে সঠিক অর্থে আমাদের সময়ে ও সমাজে বোধ করি একমাত্র আহমদ ছফা সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়। অভিধানে জিনিয়াস এর বাংলা সাধারণত করা হয়েছে 'প্রতিভা' বা সৃজনীশক্তির অধিকারী'। কিন্তু এ শব্দ বা শব্দবন্ধের কোনো এশটি বা উভয়ের মধ্যে কি জিনিয়াসের সবকটি মাত্রা বা তাৎপর্য ধরা পড়ে। ভালোমন্দ সকল বৈশিষ্ট্য-eccenricit, অহমিকা, ছন্নছাড়া জীবনপ্রণালী ইত্যাদি নিয়েই আহমদ ছফা ছিলেন একজন জিনিয়াস। (মোরশেদ ২০০৯ : ০৯)

'ছন্নছাড়া জীবন প্রণালী' ছিল বলে আহমদ ছফার কি কোনো লক্ষ্য ছিল না? জীবনযাপন প্রণালী নিয়ে তার কোনো পরিকল্পনা ছিল সত্য কিন্তু সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে তিনি পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়েছেন। জীবনের লক্ষ্যে আহমদ ছফা স্থির থাকতে না পারলেও সমাজ বদলের লক্ষ্যে নিখুঁত স্থিরতা ছিল তাঁর। আর সমাজ বদলের হাতিয়ার হয়েছে তার লেখনি। তবে লক্ষ্যে হয়ত খুব বেশি স্থির থাকতে পারেননি, অবিচল হতে পারেননি।

সাঈদ-উর রহমান লিখেছেন, জীবন নিয়ে তার কোনো পরিকল্পনা ছিল বলে মনে হয় না- সেদিকে তাকে সাহায্য বা পরামর্শ দেবার কেউ ছিলেন না। অন্যকে গায়ে-পড়ে সাহায্য করার তাঁর যে স্বভাব ছিল, তাঁর প্রতি সে ধরনের উৎসাহ কারো চরিত্রে দেখা যায়নি। একটি শান্তিময় গৃহ এবং জীবিকা অর্জনের নিশ্চিত উৎস থাকলে তার মেধা সুনির্দিষ্ট খাত ধরে এগিয়ে যেত-জীবনেও তিনি স্থিত হতে পারতেন। কিন্তু দুটোর কোনোটিই তিনি পাননি। সংসারী হওয়ার তাঁর আগ্রহ ছিল, দু একবার নিজের সে সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন।

সাঈদ-উর রহমান আরও লিখেছেন, সবগুলি বিষয় নিবিষ্ট মনে চিন্তা করলে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, আহমদ ছফার জীবনের যেমন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না, সাহিত্যচর্চায়ও তিনি ছিলেন লক্ষ্যহীন, অগোছালো। তিনি প্রায়ই উত্তেজিত হতেন, দ্রুত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতেন এবং অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তিনি ছিলেন বন্ধন-অসহিষ্ণু স্বাধীন মানুষ। (সাঈদ ২০০৩ : ৭৩-৭৪)

আহমদ ছফা পাঁচজনের মতো দোষেগুণে ভরা মানুষ। কিন্তু মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম। হৃদয়বৃত্তিতে তিনি সবাইকে কাছে টানতেন। ডান-বাম নির্বিশেষে তিনি বহু মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, ভালোবেসেছেন। কিন্তু অনেকের সঙ্গে সম্পর্কটা বেশিদিন ধরে রাখতে পারেননি। এর বিশেষ কারণ অস্থির ও অস্থিতিশীল জীবনযাপন।

সোহরাব হাসান লিখেছেন, একবার পত্রিকায় কবি শামসুর রাহমান ও প্রাবন্ধিক হুমায়ুন আজাদের সঙ্গে ছফা ভাইয়ের বাকযুদ্ধ হয়। দুপক্ষই মেছোবাজারের ভাষায় গালাগাল করেছিলেন- যা অনেকের মতো আমারও পছন্দ হয়নি। ছফা ভাইকে কথাটি বলেছিলাম। তিনি আক্ষেপ করে শামসুর রাহমানের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বলেছিলেন, একটা সময় ছিল যখন সপ্তাহের প্রায় সাতদিনই আমি শামসুর রাহমানের বাসায় যেতাম। কবিতা নিয়ে আলোচনা করতাম। তাঁর বাসায় না খেয়ে আসতে পারতাম না। কবি মোহাম্মদ রফিকের কাছে শুনেছি, একাত্তরে কলকাতায় কফি হাউসে শামসুর রাহমান সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করায় আল মাহমুদকে মারতে গিয়েছিলেন ছফা ভাই। স্বাধীনতার পর তাঁদের সেই সম্পর্কে চিড় ধরে। (সোহরাব ২০০৩ : ১৪৮)

আহমদ ছফা যা কিছু করেছেন, যা কিছু লিখেছেন একটি উদ্দেশ্য নিয়েই লিখেছেন। তা হলো এ-সমাজে একটা রেনেসাঁ সৃষ্টি করা। সেই রেনেসাঁর জন্য নতুন নতুন মালমশলা চাই, অনেক কুশলী চাই- তিনি প্রতিনিয়ত সে সব সংগ্রহে ব্যস্ত থাকতেন। কাউকে ছোট করবার জন্য, অপমানিত করবার জন্য বা হেয়প্রতিপন্ন করবার জন্য ভুলেও তাঁর কলম কোনোরকম নীচতার পরিচয় দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। লেখালেখির মাধ্যমেই নিরন্তর তাঁকে সুবিধাবাদ, লুঠপাট, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অনাচার এবং অবিচার, দলবাজি, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হয়েছে। কখনও কখনও প্রাণনাশের হুমকিও এসেছে। কিন্তু তিনি তার কর্তব্যে এবং সিদ্ধান্তে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। (শিবনারায়ণ ২০০৩, ১৬৪)

আহমদ ছফা সমাজ পরিবর্তনের চিন্তা করেছেন বটে, কিন্তু রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নানা কারণে স্থির থাকতে পারেননি, কখনো তাকে হতাশ হতে হয়েছে; আবার কখনো তিনি নতুন উদ্যমে শুরু করেছেন নতুন কিছু করার। তবে সমাজপরিবর্তনের প্রয়োগপদ্ধতিতে ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব দেখিয়েছেন।

প্রথাগত অর্থে কমিউনিস্ট বামপন্থী আহমদ ছফা ছিলেন না। যদিও সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের আবশ্যকতা বিষয়ে শেষাবধি তিনি ছিলেন নির্দ্বন্দ্ব। আর এ- বিষয়ে গোঁজামিলে তিনি বিশ্বাস করতেন না। রাজনৈতিক-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও দিক থেকে তাঁর অবস্থানকে বরং স্বাধীন-বাম বলে চিহ্নিত করা যায়। এদেশের বামপন্থী বলে পরিচিত রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে নানা সমালোচনার পরও, সমাজ পরিবর্তনের অবিকল্প শক্তি হিসেবে তিনি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। জীবনের শেষ দিকে বাম ঐক্যের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। আহমদ ছফা বলেন :

> রাজনীতি হচ্ছে এ যুগের মানুষের নিয়তি। রাজনীতি যে বুঝে না, করতে চায় না, সে লোক কিছুই করতে পারবে না। (নাসির ২০০২ : ২০)

বাংলাদেশের বিশেষ বাস্তবতায় ধর্মের ইতিবাচক দিক- ইসলামের নৈতিক ও বিপ্লবী শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামের কথা বলেছেন আহমদ ছফা। তাঁর মতে দেশের লক্ষ লক্ষ মোল্লা-মৌলবী তথা মাদ্রাসা শিক্ষিত মানুষকে বৈরী অবস্থানে রেখে বা ঠেলে দিয়ে সমাজ বা রাষ্ট্রের কোনো প্রগতিই সম্ভব নয় (পাশাপাশি অবশ্য তিনি তাদের অন্ধতা ও গোঁড়ামিরও সমালোচনা করেছেন, মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার ও আধুনিকায়নের ওপর জোর দিয়েছেন। আর সে দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি মাঝখানে বিভিন্ন ধারার ওলামা-মাশায়েখদের সঙ্গে একটি যোগসূত্র স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সম্ভবত তাদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ নেওয়ার জন্য তিনি তাঁদের বিভিন্ন মাহফিলে-মজলিসে সোৎসাহে যোগ দিতেন, বক্তব্য রাখতেন। তবে শেষাবধি এক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতা যথেষ্ট প্রীতিকর হয়নি বলেই আমার ধারণা। (মোরশেদ ২০০২ : ৫২)

আহমদ ছফা ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি সমাজ বদল করতে পারেননি, জীবনের অগোছালো রুটিনের যে পরম্পরা সেটিও ভাঙতে পারেননি। আহমদ ছফা স্বীকার করেছেন :

> এই অর্থে ব্যর্থ যে আমি সমাজে যে সমস্ত জিনিস করতে চেয়েছিলাম শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি কোনোটাই ভালোভাবে করা হয়নি। আর আমার সাহিত্য নিয়ে যে কথা বলা হয়, এইগুলো ভালো হোক, মন্দ হোক

আমার সাহিত্য। অশালীনভাবে কোনো একটা দাবি করা, এটা আমার কাছে খুব খারাপ লাগে। (নূরুল ২০১৩ : ৫৬)

ঘোষিতভাবে আস্তিক বা নাস্তিক কোনোটিই তিনি ছিলেন না। খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস প্রশ্নে কখনো ইতিবাচক আবার কখনো রহস্যময় নানা জবাব দিতেন। আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা নিয়ে বিচলিত হতে আমি তাঁকে দেখিনি। যদি পরলোক নিয়ে তার কৌতূহল ছিল, পরলোকত্ব বিষয়ে বইপত্র পড়তেন। জীবনাচরণের দিক থেকে ছিলেন প্রবল ইহজাতিক। নিজেকে যখন মুসলমান বলে পরিচয় দিতেন তখনও কথাটাকে তিনি যতটা না ধর্মীয় তার চেয়ে বেশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক অর্থে ব্যবহার করতেন। যদিও এ পরিচয়টাকে গৌণ মনে করতেন না। নিজেকেই একইসঙ্গে মনে করতেন বাঙালি মুসলমান। বাঙালি না বাংলাদেশি এ বিতর্কটাকে তিনি মনে করতেন অর্থহীন। পাশাপাশি এদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর স্বাধীন আত্মবিকাশের অধিকারের প্রতি তার জোরালো সমর্থন ছিল। (মোরশেদ ২০০২ : ৫২-৫৩)

ছফা গান্ধীবাদী ছিল না, কিন্তু সহিংসতার পক্ষাবলম্বী ছিল না। তার বিপ্লবী তরুণ বন্ধুদের সঙ্গে এখানে তার বিরোধ ছিল প্রকট। গান্ধীর সমালোচক ছিল সে অবশ্যই, কিন্তু গান্ধীর সঙ্গে সে পুরোমাত্রায় একমত ছিল যে বিপ্লবের প্রক্রিয়া বিপ্লবের ফলাফলের মতো সমান গুরুত্বপূর্ণ। যে-প্রক্রিয়ায় বিপ্লব সাধিত হয় সেই প্রক্রিয়ার ছাপ থেকে যায় ফলাফলে, বিপ্লবের পরিণতিতে। হিংসা বর্তমানের বাস্তবতা নিঃসন্দেহে, কিন্তু ভবিষ্যতের লক্ষ্য তো হিংসার অধিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠা নয়, বরং তার বিলুপ্তি। যদি বিপ্লবের প্রক্রিয়া-অর্থাৎ রণনীতি ও রণকৌশলের মধ্যে এই সত্য হাড়ে মজ্জায় হাজির না থাকে তাহলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। মানুষ হিংসুক হয়, দাঙ্গাহাঙ্গামা করে, যুদ্ধবিগ্রহ করে। কিন্তু সেটা তার স্বভাব নয়, মানুষ মাত্রই হিংসুক হতে পারে না, অসম্ভব। তা হলে তো ভবিষ্যৎ নির্মাণের ধারণাটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিপ্লব মানুষের মুক্তি আনে কথাটির অর্থ হতে পাওে মনুষ্য-স্বভাবের অফুরন্ত সম্ভাবনা তৈরি করা। যদি হিংসাই বৈপ্লবিক রূপান্তরের একমাত্র পথ, প্রকরণ ও পদ্ধতি হয়, তা হলে সেই সম্ভাবনায় সীমিতও সংকীর্ণ হয়ে যেতে বাধ্য। ছফা বিপ্লবী, মনে প্রাণে সে সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর চাইত। কিন্তু বিপ্লব নামক ধারণার মধ্যে যে সহিংসতার ইঙ্গিত আছে, সেটা একদমই তার পছন্দ ছিল না। কেন? কারণ বৈপ্লবিক ফলাফলের মধ্যে যে সজল-মাধুর্য আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিশ্রুতি তার সঙ্গে বিপ্লবের সহিংস ভাবমূর্তি তার কাছে ছিল স্বরিরোধী এবং অসঙ্গত। গান্ধীর কাছ থেকে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলো অহিংসবাদ' গ্রহণ করেছে। আহমদ ছফা করেছে তার প্রায়োগিক

তাৎপর্য। কার্ল মার্কসের কাছ থেকে বিপ্লবীরা 'হিংসা ইতিহাসের ধাত্রী' এই শিক্ষাটাই গ্রহণ করেছে, কিন্তু ছফা গ্রহণ করেছে মার্কসের মানবেতিহাসের আনন্দময় প্রতিশ্রুতি। (ফরহাদ ২০০৩ : ৩০৭-৩১০)

তবে আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান বলছেন, আহমদ ছফা বিপ্লব করিতে চাহিতেন। ইহা আমাদের সংস্কার। কিন্তু তাহাকে নৈরাজ্যবাদী বলিতে আমরা রাজি হইব না। একটি জনগোষ্ঠীর জীবনে রাষ্ট্রগঠনের গুরুত্ব কি তাহা তিনি জীবন দিয়ে অনুধাবন করিয়াছেন। সমাজকে তিনি ফেলনা মনে করিতেন না। মানুষের ইতিহাসে সভ্যতার কর্জ তিনি অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সহিত, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের সহিত তিনি একাকার হইয়া গিয়াছেন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মোহনায় আসিয়া আহমদ ছফার ইহকাল-পরকাল মিশিয়া গিয়াছে। আহমদ ছফার পাশ কাটিয়া এই জাতির কোনো ভবিষ্যত আছে কি না তা ভাবিবার সময় আসিতেছে। (আবুল ২০১৩ : ৩)

আহমদ ছফা যোগাযোগে বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন। তিনি কেবল যোগাযোগের সীমানাকে দেশের মধ্যে সীমিত করতে চাননি। নানা প্রয়োজনে, নানা কারণে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছে, যোগাযোগ করতে হয়েছে। বৈশ্বিক সম্পৃক্ততা প্রসঙ্গে ছফাকে কখনো কখনো বিতর্কের মুখে পড়তে হয়েছে, তোপের মুখে পড়েছেন তিনি।

মোরশেদ শফিউল হাসান উল্লেখ করেছেন- ছফা ভাইয়ের লিবিয়া কানেকশন নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন আছে। ব্যাপারটি তাকে বিতর্কিত করে তোলে। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কের অবনতি ও স্বল্পস্থায়ী ছেদও ঘটে এই সূত্রেই। তা সূচনা-পর্বে আমি ছিলাম কিছু ঘটনার সাক্ষী, এমনকি শরিকও। সুতরাং এ- সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি তা যদি না বলি অন্যায় করা হবে। ১৯৮১ সালের শেষ দিকে দৈনিক ইত্তেফাকে- এ 'সুহৃদ' গাদ্দাফিকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের প্রধান হোতা হিসেবে চিহ্নিত করে একটি উপসম্পাদকীয় লেখেন। গণকণ্ঠ- এ আমার উপসম্পাদকীয় কলামে আমি তার একটি কড়া রকমের জবাব দিই। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই আমি কাজটি করেছিলাম। এ ব্যাপারে ছফা ভাই বা গণকণ্ঠ কর্তৃপক্ষের কোনো নির্দেশ বা আগ্রজ ছিল না।... লেখাটিতে গাদ্দাফির প্রশংসা না যতটা না তার চেয়ে বেশি ওয়াশিংটনের সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও পত্রিকাটির মার্কিন-অনুরক্তির সমালোচনা করা হয়েছিল। ছফা ভাই পরে লেখাটি পড়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। এর দিন কয়েক দিন পর আবার গণকণ্ঠ- এ প্রায় একই ধারায় গাদ্দাফির সমর্থনে একটি দ্বিতীয়-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়।

এটিও ছফা ভাই নয় যতদূর মনে পড়ে, পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মরত আরেক সাংবাদিক সুভাষ সাহা লিখেছিলেন। এবং এ লেখাটির পেছনেও ছফা ভাই বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষের কোনো আগ্রহ কাজ করেছিল কি না আমার সঠিক জানা নেই। তবে যেভাবেই হোক লেখা দুটি স্থানীয় লিবীয় দূতাবাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিংবা কেউ তা তাঁদের নজরে আনেন। সে সময় গণকণ্ঠ এর দারুণ দুরবস্থা চলছিল। সাংবাদিক কর্মচারীদের বেতন দেওয়া যাচ্ছিল না। ছফা ভাই নিজে থেকে বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষের (তখন সম্পাদক ছিলেন মির্জা সুলতান রাজা) আগ্রহে এ-সময় লিবীয় দূতাবাসের জনৈক কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করেন। যোগাযোগের সূত্রপাতটা, আমি যতদূর জানি এভাবেই। তবে অন্য একটি কথাও এ প্রসঙ্গে বলে রাখতে চাই। ঢাকায় অবস্থানকারী প্যালেস্টাইন ছাত্রদের পিএফএলপি সমর্থক অংশটির মাধ্যমেও আগেই তাঁর এই যোগাযোগ ঘটে থাকতে পারে। এ ছাড়া প্যালেস্টাইন ছাত্রদের বিভিন্ন সভা-অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করা ছাড়াও ছফা ভাইকে দেখেছি তাদের প্রচার ও প্রকাশকের কাজে সহায়তা করতে। (শফিউল ২০০২ : ২২)

আহমদ ছফা 'বাংলা-জার্মান সম্প্রীতি' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তৈরিতে মনোযোগী হয়েছিলেন। ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯০ এ আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠনটি জন্ম লাভ করে। সংগঠনটি গঠনে তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন জার্মান নাগরিক ফাদার ক্লাউস বুয়েলে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আহমদ ছফা। সংগঠনের চেয়ারম্যান হন আজিজুল হক। ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন ড. আনিসুজ্জামান। ১৯৯১ সালে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলে উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক জানমালের ক্ষতি হয়। দুর্গত এলাকায় এই সংস্থাটির মাধ্যমে ত্রাণকার্য পরিচালনা করা হয়। বিশেষ করে দুর্গত এলাকার মানুষদের জন্য যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে সংগঠনটি। টাঙ্গাইলে মজলুম জননেতা মরহুম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রতিষ্ঠিত 'সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে' এক ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছিল এই সংগঠনটি। এখানে মহিলাদের কাজের বিরাট সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। ৯১ সালে বাংলা জার্মান সম্প্রীতির প্রতিনিধি হয়ে তিনি জার্মানিতে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল অর্থ সংগ্রহ করা। তিনি এ যাত্রায় প্রায় দুই কোটি টাকার তহবিল যোগাড় করেন। সেটি ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় ব্যয় করা হয়েছিল। চুরানব্বই সালে জার্মান কন্সাল জেনারেলে আর্থিক সহায়তায় মিরান্দা প্রকাশন থেকে ফাউস্ট এর অনুবাদের একটি সংস্করণ বের হয়েছিল। ৯৬ সালে জার্মান বাংলা সম্প্রীতি থেকে আহমদ ছফা বের হয়ে আসেন। তার দাবি- ষড়যন্ত্র করে তাকে এ সংগঠন থেকে বের করে দেওয়া হয়।

আহমদ ছফা এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, ওই দেশটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল, এতে লুকানোর কোনোকিছু আছে বলে মনে করি না।

কোনো কোনো সমালোচক দাবি তুলেছেন আহমদ ছফার সঙ্গে ইরানের সম্পর্ক গভীর ছিল। এ প্রসঙ্গে আহমদ ছফা বলেন, 'আয়াতুল্লাহ খোমেনীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকার সাফল্য সত্ত্বেও তার মতবাদকে আমি আধুনিক সভ্যতার পরিপন্থী মনে করি।'

যারা আহমদ ছফার সমালোচনা করেছেন তাদের প্রসঙ্গে আহমদ ছফা বলেছেন, আজকাল অনেক বড় মানুষ আমাকে মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত করতে আনন্দবোধ করেন। এঁদের মধ্যে দেশের বড় কবি, প্রথিতযশা অধ্যাপক, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেকেই রয়েছেন। তাঁরা এই সম্মানটা আমাকে দিতে এতটা আগ্রহবোধ কেন করেন তা সত্যি আমার অজানা। এ সমস্ত ভদ্রলোক যারা হাওয়া পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে ভোল পাল্টান, অতীতের কর্মকাণ্ড গর্ভগুহার মধ্যে লুকিয়ে রেখে শুধু গলাবাজির জোরে জনমানসে একটি স্থান অধিকার করতে চান, তাঁদের চিন্তাভাবনা এতই অপরিণত তাদের সুবিধাবাদ এতদূর; নিলর্জ্জভাবে ননী মাখন লুট করা ছাড়া দেশ জাতির উপকারে আসে এ ভূমিকায় তাঁদের কোনোদিন দেখা যায়নি। তাদের আসল স্বরূপ জনসম্মুখে উন্মোচন করে দেখানো আমার কর্ম নয়। আমার পথ আলাদা। আমি রোম বেছে কম্বল উজাড় করার কাজে লাগতে পারব না। (নূরুল ২০১০ : ১৩৪)

তাঁর লেখায় যেমন তেমনি কথাবার্তায় ভারত বিরোধিতার একটা সুর ছিল। আর প্রায়শ বেশ চড়াভাবেই তা প্রকাশ পেত। (মোরশেদ ২০০২ : ৫৩) আহমদ ছফা মনে করতেন রাষ্ট্র হিসেবে নিজ দেশের জনগণের ক্ষেত্রে ভারতের চরিত্র যেমন শোষণবাদী, তেমনি একটি উদীয়মান বৃহৎ শক্তি হিসেবে আশেপাশের দেশগুলোর ব্যাপারে তার একটা আধিপত্যবাদী লক্ষ্য রয়েছে। বাংলাদেশের মতো একটি ক্ষুদ্র ও দুর্বল দেশ যদি তার আপন স্বকীয়তা ও সম্মান নিয়ে বাঁচতে চায় তবে তাকে প্রতিবেশী দেশ ভারতের এই আধিপত্যবাদী আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সচেতন থেকে ও তার মোকাবিলা করেই সেটি করতে হবে।

আহমদ ছফা প্রতিষ্ঠানবিরোধী ছিলেন সন্দেহ নেই কিন্তু কোন অর্থে? প্রতিষ্ঠানবিরোধী বলতে যা বোঝায় আক্ষরিক অর্থে তিনি তা ছিলেন না। আসলে তাঁর ব্যক্তিত্বের বোহেমিয়ানপনার কারণে আমাদের প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি তার অনীহা জন্মেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চাকরি পেতে চেয়েছিলেন, আর তা না পাওয়া নিয়ে তার মনে ক্ষোভ-দুঃখ ছিল, পেশাগত জীবনে সাংবাদিকতা

করেছেন, কিন্তু এ কাজটাকে কখনো পেশা হিসেবে নিতে পরেননি। নিজে পত্রিকা বের করেছেন, প্রেস চালিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেননি। তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এনজিও থেকেও তাকে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে হবে। জীবনের শেষ দিকে এসে তিনি প্রতিষ্ঠানের বিকল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। শিল্পী এস এম সুলতান স্কুল তার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ও প্রয়াসের প্রতিশ্রুতি। আর এ জন্য অনেক মেধা, অনেক শ্রম, সময় ব্যয় করতে হয়েছে তাকে। তিনি রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করেছেন তবে সাংগঠনিক শৃঙ্খলার বাইরে থেকে। নিজে রাজনৈতিক দল গড়ার কথা বলেছেন কখনো। কিন্তু সেটি ভাবা পর্যন্তই। বস্তুত মনেপ্রাণে ও আপাদমস্তক তিনি ছিলেন একজন লেখক। অনেক সময় আত্মসর্ম্পণের ভঙ্গিতে তিনি বলতেন, 'আমি লেখক, এই কাজটিই পারি অন্যকিছু পারি না।'

আহমদ ছফা ছিলেন প্রতিবাদী। জীবনের শেষ অবধি পর্যন্ত তিনি প্রতিবাদ করে গেছেন। যেমনিভাবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন সক্রিয়, সৃজনশীল। পেশাগত বা বিবৃতিতে নাম সই করার মতো বুদ্ধিজীবীর কাতারে তিনি কখনোই ছিলেন না। তিনি ছিলেন আপোসহীন বুদ্ধিজীবী। মননচর্চার স্তরে, যেখানে মৌলিক মত বা বিশ্বাসের প্রশ্ন, সেখানে তিনি আপোস করেননি সত্য। তবে ব্যক্তিগত জীবনচর্চায় তাকে নানাভাবে আপোস করতে হয়েছে। (মোরশেদ ২০০২ : ৫৫-৫৬)

২০০১ সালে পার্থিব জগত শেষ করেন আহমদ ছফা। কামাল লোহানী তার স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন, ছফা আপনি চলে গেলেন এমন এক অস্থিরচিত্ত রাজনৈতিক দেনাপাওনার খেলার সময় যখন আপনার ক্ষুরধার লেখনি শান দেওয়া তরবারির মতো আগাছা উৎপাটনে অনেক সহায়ক ও নির্দেশক হতে পারত। (কামাল ২০০৩ : ৫৯)।

আহমদ ছফা বিষয়ে উপরে উল্লেখ করা আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় তাকে বিশেষ ঘরানার, বিশেষ রীতির সাহিত্যিক বলে বিবেচনার ঘরে আবদ্ধ রাখা যাবে না। বরং আহমদ ছফার গতিপথ বিচিত্রমুখী, প্রত্যেক গতিপথেই আহমদ ছফার সবল-শক্তিশালী অবস্থান। সাহিত্যের গতিপথে অবিচল থাকার সাধনার মধ্যেই আহমদ ছফা যুগে যুগে 'কালের নায়ক' হয়েছেন।

আহমদ ছফাকে এখনো যাঁহারা বন্দি করিয়া রাখিয়াছেন, বিশেষ ধরনের লেখক বলিয়া তফাতে রাখিতেছেন, ভবিষ্যৎ তাঁহাদিগকে দণ্ডিত করিবে। অথবা করিবে না। ইহাতে আমার হাত নাই। শয়তানের বিচারভার মানুষ লইবে কেন? সে তো তাহার স্রষ্টার খোদ এখতিয়ার (সলিমুল্লাহ ২০১৩ : ১৭)

তথ্যসূত্র

সলিমুল্লাহ খান, *আহমদ ছফা সঞ্জীবনী*, আগামী প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, ২০১৩

আহমদ ছফা, *বাঙালি মুসলমানের মন*, ঢাকা, ২০০৬

নাসির আলী মামুন, *আহমদ ছফার সময়*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২

আহমদ ছফা, *যদ্যপি আমার গুরু*, মাওলা ব্রাদার্স, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ২০০০

অসীম সাহা, *ছফা ভাই-অভিমানী বিদায়*, মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান সম্পাদিত 'আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ' মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ২০০৩

মনসুর মুসা, *আহমদ ছফা মিত্র ও শিল্পী*, আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ

সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা : ১৯৪৭-১৯৭১*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮

রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭

হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, , তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২।

আবুল কাসেম ফজলুল হক, *মুক্তিসংগ্রাম*, প্রথম পর্ব, ১৯৭২, ঢাকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আহমদ ছফা, *রাজনৈতিক অরাজনৈতিক প্রবন্ধ*, ঢাকা, ২০০০

নাসির আলী মামুন, *আহমদ ছফার সময়*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০

নাসির আলী মামুন, *পূর্বদেশের মনীষী*, আহমদ ছফা স্মৃতিবক্তৃতা, আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা, ঢাকা, ২০০৪

মোরশেদ শফিউল হাসান, *ছফা ভাই আমার দেখা আমার চেনা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২

নূরুল আনোয়ার, *ছফামৃত*, খান ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১০

আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান সম্পাদিত *সর্বজন*, আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা, ঢাকা ২০১৩

নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত *আহমদ ছফার সাক্ষাৎকার সমগ্র*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১৩

সল্লিমুল্লাহ খান, ভূমিকা, *আহমদ ছফা উপন্যাস সমগ্র*, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪

সাঈদ উর রহমান, *আরেকজন সাহসী মানুষ চলে গেলেন*, আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ

সোহরার হোসেন, *আমাদের ছফা ভাই*, আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ

শিবনারায়াণ দাশ, *আমার অনুভূতিতে ছফার প্রতিবিম্ব*, আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ

ফরহাদ মজহার, *আহমদ ছফা এবং মানুষের মতো কর্তব্য কিংবা ব্যক্তির মুক্তিতত্ত্ব*, ছফা স্মারকগ্রন্থ

কামাল লোহানী, *আপসহীন আহমদ ছফা জীবিতই রয়ে গেলেন*, আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ

দ্বিতীয় অধ্যায়

আহমদ ছফার উপন্যাসে সমাজ ও জীবনভাবনার ক্রমবিবর্তন

আহমদ ছফার উপন্যাসে সমাজ ও জীবনভাবনার ক্রমবিবর্তন

আহমদ ছফার প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা আটটি। আপাতত বিচারে কোনো কোনো সমালোচকের মনে হতে পারে উপন্যাসগুলো বোহেমিয়ান লেখকসত্তার বিক্ষিপ্ত ভাবনার প্রকাশ। মনে হতে পারে উপন্যাসের মধ্যে সম্পর্কের কোনো বাঁধনসুতো নেই। একটু গভীর বিবেচনায় স্পষ্ট হবে যে, আহমদ ছফার উপন্যাসগুলো ঘটনার পরম্পরায় সম্পর্কযুক্ত। ইতিহাসের বাঁকবদল, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, সামাজিক নানা বাস্তবতাকে ধারণ করে তার উপন্যাসগুলো বিকশিত হয়েছে, পরিণতি লাভ করেছে। উপন্যাসের মধ্যে লেখক একটি যাত্রাপথকে অবলম্বন করে চলতে চেয়েছেন। সে যাত্রাপথ প্রায় তিন দশকের।

আহমদ ছফা ব্রিটিশ শাসনের গহ্বরে থাকা রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজের শোষণ-যন্ত্রণার স্বরূপ এবং এ থেকে উত্তরণের আভাস দিয়ে লিখেছেন প্রথম উপন্যাস 'সূর্য তুমি সাথী' (১৯৬৭)। এ উপন্যাসে অন্ধকার থেকে শুরু হয়ে যাত্রা হয়েছে আলোর দিকে, নতুনত্বের দিকে। হয়ত সে আলোকরেখা মুহূর্তের মধ্যে জ্বলেছে, মুহূর্তে নিভেছে। হয়ত কখনো কখনো লেখককে হতাশ হতে হয়েছে, মনুষ্যসমাজ থেকে ছুটেছেন প্রকৃতির দিকে আবার ফিরেছেন মনুষ্যসমাজে। শেষ পর্যন্ত তার উপন্যাসেই মানুষই সত্য হয়ে দাঁড়ায়। আহমদ ছফার উপন্যাসের কাঠামোর মধ্যে অন্ধকার আছে, আলো আছে, হতাশা আছে, প্রেরণা আছে, প্রকৃতি আছে, প্রেম আছে, নিরুদ্দেশ যাত্রা আছে, সুনির্দিষ্ট গন্তব্যও আছে। এক কথায় আহমদ ছফার উপন্যাস মানেই সমাজ, তার উপন্যাস মানেই রাষ্ট্র সমাজের গভীরতর ব্যবচ্ছেদ।

আহমদ ছফার উপন্যাসগুলো হলো- 'সূর্য তুমি সাথী' (১৯৬৭), 'ওঙ্কার' (১৭৭৫), 'একজন আলী কেনানের উত্থান-পতন' (১৯৮৮), 'মরণ বিলাস' (১৯৮৯), 'অলাতচক্র' (১৯৯০), গাভী বিত্তান্ত (১৯৯৫), অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী (১৯৯৬), পুষ্পবৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ (১৯৯৬)।

কাল বিভাজনে উপন্যাসগুলো দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটি বিভাজন হলো স্বাধীনতা পূর্ববর্তী উপন্যাস এবং স্বাধীনতা পরবর্তী উপন্যাস। সে হিসেবে 'সূর্য তুমি সাথী' স্বাধীনতা পূর্ববর্তী উপন্যাসের শ্রেণিভুক্ত এবং বাকি উপন্যাসগুলো স্বাধীনতা পরবর্তী ইতিহাস-সময়-সমাজ-রাষ্ট্রের পর্যায়ক্রমিক উপন্যাস।

আহমদ ছফা তার কবিতা, গল্প, গান, প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, সমালোচনার মাধ্যমে যে সব ভাবনা প্রকাশ করেছেন, করতে চেয়েছেন পাত্র-পাত্রী ঘটনার আবহে সেটি উপন্যাসের আশ্রয়ে বিস্তারিত-বিস্তৃত করেছেন। এমনকি নিজের ব্যক্তিজীবনের নানা অনুভূতি, ঘটনাবলিও বাদ যায়নি উপন্যাসের প্লট-কাহিনি থেকে। কাহিনি ও চরিত্র যে চিত্রণের প্রয়োজনে যে সব মানুষের কথা তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন সেগুলো এই দেশে বসবাসরত মানুষ। এই ভূ-খণ্ডে বসবাসরত মানুষের নানা আখ্যান-উপাখ্যান রূপায়িত হয়েছে তার উপন্যাসে। তবে উপন্যাসগুলোতে তিনি কার্যকারণহীন করে তোলেননি।

আহমদ ছফার সাহিত্য পূর্বাপর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সেই উদ্দেশ্যের কার্যকারণ সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন। (মহীবুল ২০০৩ : ৩৩০)

আহমদ ছফা উপন্যাসের কার্যকারণ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলে তার ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের নানা ঘটনাপুঞ্জ উপন্যাসের অবধারিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির গর্ভযন্ত্রণা থেকে শুরু করে নব্বই দশকের প্রথমভাগ পর্যন্ত বিরাট এক সময়কে ধারণ করেছেন উপন্যাসের মাঠে। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মোৎসব প্রক্রিয়া, স্বাধীনতার স্বপ্নময় অগ্রযাত্রা, দেশের বিচ্যুতি, সামাজিক-রাজনৈতিক সর্বক্ষেত্রে ভাঙনের কার্যকারণ ইঙ্গিত দিয়েছেন উপন্যাসে সেই সঙ্গে এ থেকে উল্টোরথের পথ নির্দেশনা আরোপ করতে চেয়েছেন।

আহমদ ছফার আট উপন্যাসের ঘটনাবৃত্তে যে পারস্পরিক এবং যৌক্তিক যোগসূত্র তাকে কালানুক্রমিক ইতিহাস-প্রবাহের মানদণ্ডেও বিচার করা যায়। কাহিনিক্রমকে একক ও বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করলে তাকে শাদামাটা এক স্বল্প পরিসরের আপাতত শিল্পসফল উপন্যাস মনে হতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত বাংলাদেশের বৃহৎ রাজনৈতিক পটভূমিতে ফেলে যদি প্রসঙ্গসমূহের কার্যকারণ ব্যাখ্যা ও দার্শনিক ভিত্তি আবিষ্কারের প্রচেষ্টা করা হয়, তবে সেখানে পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে একটি অন্তর্গত ক্রমধারা। সেই আন্তরসম্পর্ক সূত্রাবদ্ধ করার জন্য আহমদ ছফা ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৯৬ সীমার মধ্যে বাঙালি জাতির যে বিকাশ-বিবর্তন, উত্থান-পতন, আশা-নিরাশা, বিশেষত বাঙালির ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায় মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের দায় ও অসমাপ্ত মীমাংসা-এ সবকে প্রাধ্যান্য দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সৃষ্ট যুদ্ধবিধ্বস্ত নবীনস্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পথ তৈরির চেতনা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন। (হান্নান ২০১৪ : ২৬-২৭)

আহমদ ছফা 'সূর্য তুমি সাথী' উপন্যাসে দেশভাগের পরবর্তী পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন। দেশভাগের ফলে কার্যত পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও যে লক্ষ্যে পাকিস্তানের যাত্রা শুরু তা ব্যাহত হয়। ধর্মের প্রভেদ দেয়াল তুলে যে সময় চাঙ্গা হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক মনোভাব। গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে ধর্মের বিভেদনীতি। দেশভাগের মানুষ আর ভৌগোলিক পরিচয়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি, জাতিগত পরিচয়ের প্রশ্নটি ওই সময় বড় হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ পরিণত হয় হিন্দু-মুসলমান জাতিতে। ধর্মীয় বিদ্বেষের এই কদর্যরূপ আহমদ ছফা উপস্থাপন করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। উপন্যাসে হাসিমের যে সংকট সে সংকট কেবল একজন মানুষের সংকট নয়; হাসিমের এ সংকট একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসরত সকল মানুষের সংকট। উপন্যাসের শেষে হাসিম একসময় বেরিয়ে পড়ে নিরুদ্দেশ গন্তব্যে। নতুন জীবনধারা ও নতুন স্বপ্নের আশায় তাকে গ্রাম থেকে চলে যেতে হয়। যারা কিছুটা আশা নিয়ে ধর্মান্তরিত হয়েছিল তারা রয়ে যায় গ্রামে। কিন্তু তাতেও মুক্তি মেলেনি। সমাজের অভ্যন্তরে তারাও অবিরামভাবে শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে থাকেন।

ধর্মের আড়ালে বোবা যে জাতি এতদিন শোষণের জটাজালে বন্দি হচ্ছিল সে জাতি এবার প্রতিবাদ করতে শিখেছে। যে জাতি কথা বলতে শুরু করেছে, প্রতিবাদ করতে শিখেছে। বোবা চরিত্রের প্রতীকী ব্যঞ্জনায় আহমদ ছফা 'ওঙ্কার' উপন্যাসে বোবা জাতির প্রতিবাদী সত্তাকে উন্মোচন করেছেন। ঊনসত্তর সালের গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাসটিতে আহমদ ছফা বাঙালি জাতির আত্মপ্রকাশোন্মুখ অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং এই অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে বোবা এক গৃহবধূর চরিত্রের আশ্রয়ে। একটি পরিবারের কাহিনির আড়ালে উপন্যাসটিকে সত্তর দশকের বাঙালি জাগরণের কথা আছে। কয়েকটি মাত্র চরিত্রের ম্যামে লেখক গণঅভ্যুত্থান, স্বাধিকার ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে জীবিত করে তুলেছেন। দ্বিজাতিতত্ত্বের মাধ্যমে বাঙালি জাতির মূল সমস্যার সমাধান করা যায়নি, জনগণের মুক্তির পথ

প্রসারিত হয়নি এবং সাম্প্রদায়িকতার অবসান হয়নি। এমন অবস্থায় পূর্ব বাংলার জনগণ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় ৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ৬৬ এর গণঅভ্যুত্থান এবং ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের সূত্রপাত। জনগণের মুক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা বোবা মেয়েটির মাধ্যমে প্রতিকায়িত। বোবা মেয়ের মুখ দিয়ে বাংলা শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে আহমদ ছফা বাঙালি জাতির বাঁকবদলের সূচনা ঘটালেন।

'অলাতচক্র' উপন্যাস বাংলাদেশের জন্মপ্রক্রিয়ার প্রসববেদনা যেন। এ উপন্যাসে যুদ্ধকালীন সময়ে ভারতে আশ্রয়রত বাঙালিদের যন্ত্রণা নিয়ে বিকশিত। এ উপন্যাসের যুদ্ধের বর্ণনা সরাসরি নেই কিন্তু যুদ্ধের কারণে মানবজীবনের নানা দুর্দশার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে যা যুদ্ধের ভয়ানক রূপকে মনে করিয়ে দেয়। হাসপাতালে ক্যান্সারাক্রান্ত তায়েবার মৃত্যুর বিপরীতে ঔপন্যাসিক আমাদের হাজির করেন ধ্বংসের চরে জেগে ওঠা অপর এক নতুন স্বপ্নের বাস্তবতায়। তায়েবার মৃত্যুর সমান্তরালে জেগে উঠেছে রক্তস্নাত বাংলাদেশ। কিন্তু রক্তস্নাত জেগে ওঠা বাংলাদেশের মধ্যে রয়ে যায় 'গলদ।' দেশ স্বাধীন হলেও বিপ্লবের সুফল সাধারণ মানুষের হাতছাড়া হয়, বিপ্লব বেহাত হয়।

এমন বেহাত বিপ্লবের সংকটময় সময়ে আবির্ভাব একজন আলি কেনানের। 'একজন আলি কেনানের উত্থান-পতন' উপন্যাসে আহমদ ছফা ব্যক্তির বিকাশ, ক্ষমতা লাভ, প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন এবং নিষ্ঠুর নিয়তির ফেরে তার পতনকে ভাষ্যরূপ দিয়েছেন। একজন আলী কেনানের উত্থানের কালগত পরিধি ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৫। আলী কেনানের সূচনা গণআন্দোলনের জোয়ারে, সমাপ্তি শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে। মোট ছয় বছর সময়ের ব্যবধানে আলি কেনানের উত্থান ও পতন। আলি কেনানের উত্থান ও পতনের মাধ্যমে বাঙালি জাতির স্বপ্নভঙ্গের আখ্যান রচিত হয়েছে। গণআন্দোলনের উত্থানপর্বে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরকে রক্ষার মাধ্যমে ভোলার তামাপুকুর গ্রামের সম্পূর্ণ অখ্যাত এক আলি কেনানের নাটকীয় উত্থান। গর্ভনরের খাস পিয়ন থেকে হঠাৎ এক ভুলে আলি কেনানের পতন ঘটে। এরপর পীর সেজে নেমে পড়েন মাজার ব্যবসায়। তারপর শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর মাধ্যমে করুণঘন হয়ে ওঠে আলি কেনানের পরিণাম। জয়বাংলার দরবেশ আলি কেনান হয়ে পড়েন পথের ফকিরতুল্য। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আলি কেনান নিজেকে নিঃস্ব অবস্থায় আবিষ্কার করেন। এর আগে তার শিষ্যরা মাজার লুট করে যে যার মতো পালিয়েছে। আলি কেনান শুনতে পায় রেডিওতে শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। আলি কেনানের

পতন এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর সমান্তরালে আহমদ ছফা বাংলাদেশে বিশেষ অবস্থাকে প্রতীকায়িত করেছেন।

১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সর্বত্র চলছিল অনাচার। অসুস্থ রাজনীতির ধারা জেঁকে বসে সর্বত্র। যথাযথ নেতৃত্বহীনতা আর পরিণামহীনভাবে পথ চলতে চলতে দেশ বিচ্যুত হয়ে পড়ে তার স্বাভাবিক গতিপথ থেকে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন হয়ে পড়ে কলুষিত। 'মরণ বিলাস', 'গাভী বিত্তান্ত' উপন্যাসে রাষ্ট্রীয় নানা অসঙ্গতি এবং 'অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী' উপন্যাসে আহমদ ছফা সামাজিক অবক্ষয়কে তুলে ধরেছেন। রাষ্ট্র ও সমাজ যে আদর্শহীনভাবে চলতে থাকে তার প্রমাণ পেলে 'মরণ বিলাস' উপন্যাসে একজন মন্ত্রীর পূর্বাপর কাহিনি উন্মোচনের মাধ্যমে। ওই মন্ত্রী আইনের রক্ষক হয়ে ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। যিনি নষ্টজীবন চর্চার মধ্যদিয়েই একসময় মন্ত্রী হওয়ার গৌরব লাভ করেন। স্বৈরশাসনের নীতিবর্জিত জীবনাচরণ রূপায়িত হয়েছে 'মরণ বিলাস' উপন্যাসে। কেবল রাষ্ট্রীয় জীবনবৃত্তই নয় অশুভ জীবনধারা যে অপরাপর প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রবহমান ছিল তা 'গাভী বিত্তান্ত' ও 'অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী' উপন্যাসে পাওয়া যায়। উপন্যাসটির কাহিনি মূলত বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপর্যায়ের শিক্ষকদের নিয়ে রচিত। এত প্রকাশ পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদ ভাইস চ্যান্সেলর নির্বাচন, নিয়োগ ও তার জ্ঞানের সীমাহীন দারিদ্র, টেন্ডার কাহিনি, সুবিধাবাদী শিক্ষক রাজনীতির চালচিত্র, ছাত্র নেতাদের রাজনীতির চালচিত্র। স্বাধীনতা পরবর্তী জ্ঞান, বিদ্যা, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে কতটা পচন বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার বিশদ বিবরণ 'গাভী বিত্তান্ত' উপন্যাস। গাভী বিত্তান্তে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ পদের প্রভাব এবং সেটিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা ক্ষমতার জগতে সমাজের সর্বোচ্চ ডিগ্রিপ্রাপ্ত ও উচ্চশিক্ষিত বলে কথিত ব্যক্তিত্বেও অদ্ভুত-হাস্যকর বিচরণ। সমাজ ও রাষ্ট্রের পচনের ব্যারোমিটার নির্ধারণের উপায় 'গাভী বিত্তান্ত' উপন্যাস।

'অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী' উপন্যাসটি লেখকের আত্মজৈবনিক ধাঁচের উপন্যাস। উপন্যাসটিতে এমন এমন কাহিনি, কার্যকারণের বিবরণ আছে যা লেখক জীবনের বাস্তব ঘটনার ঘটে সঙ্গতিপূর্ণ। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন, সমাজের একদল শিক্ষিত মানুষের মনের কুটিলতা, তাদের রুচিহীন জীবনযাপনের বাস্তবতা। এবং এর বিপরীতে দাঁড় করিয়েছেন নারী চরিত্রকে। শিক্ষিত সমাজের একদল নারীর প্রকৃত অবস্থানের স্বীকৃতি দিতে নারাজ এবং তারা মনে করে নারীরা কেবল পণ্য, নারীরা কেবল ভোগের উপায়। অপর দল নারীর প্রকৃত মর্যাদা দিতে কোনো কার্পণ্য করেন না। যেমন

ড. হাসনাত। শামারোখ যেন ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক হতে না পারেন সেজন্য ড. হাসানের বিরুদ্ধে অপবাদ রটান ড. শরিফুল ইসলাম। লেখক নারী পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সচেতনাকে গুরুত্ব দিতেন বলে উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র জাহিদ হাসান প্রেয়সী সোহিনীর কাছে তার অতীতের ঘটনা বয়ান করে চলে। দুরদানার দুরন্ত সাহসী চরিত্রের মধ্যে নারীমুক্তির প্রয়াস দেখেছেন নায়ক। তার সাইকেল চালানোর রেখকের মনে হয়েছে মুসলিম সমাজের সামন্তযুগীয় অচলায়তনের বিধি নিষেধ ভেঙে নতুন যুগ সৃষ্টির প্রেরণা। ছফা দেশের জন্য, সমাজের কাজ করার প্রেরণাতেই তিনি বামপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এই অভিজ্ঞতাও তিনি উপন্যাসে প্রকাশ করেছেন। দুরদানার ভাই ইউনুস জোয়ারদার সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি করে। সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি করার অপরাধে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক কর্মীদের ওপর তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল নির্যাতন চালিয়েছে, দুরদানার ভাইকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিম পিছু নিয়ে। একসময় ইউনুস জোয়ারদার খুন হন। ইউনুস জোয়ারদার একবছর যেতে না যেতে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে আততায়ীদের হাতে খুন হন।

স্বাধীনতা উত্তর ওই যে দিশাহীন জীবন বাংলাদেশের তাকেই যেন আহমদ ছফা দুরদানা ও শামারোখ চরিত্রের ভেতর দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন। দুরদানা-শামারোখরা এ দেশের গতানুগতিক জীবনধারার বাইরে গিয়ে যে প্রগতির ধারণা সূচনা করেছি তা পারিপার্শ্বিক কাঠামোর সহায়তার অভাবে মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল। এ উপন্যাসটিতে সমকালীন মানুষের বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যা শেষ পর্যন্ত পরিণতি লাভ করেছে শৈল্পিক বাস্তবতায়।

মোট কথা উপন্যাসে ব্যক্তির সংকট-আত্মীক সংকটকে তুলে ধরেছেন। একাধিক নারীর সঙ্গে জাহিদ হাসানের সম্পর্ক তৈরি হলেও পারিপার্শ্বিক নানা কারণে নরনারীর সম্পর্কেও পরিণতি আসেনি। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আচরণ ভালো না লাগলেও তাকে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে যেতে হয়েছে।

এতদিন আহমদ ছফা মানুষের মধ্যে ছিলেন। তিনি এবার মুখ ফেরালেন মানুষ থেকে এলেন প্রকৃতির জীবনে। মানুষের জীবন থেকে প্রকৃতির জীবন এরপর আবার মানুষ এভাবেই বিহার করেছেন ঔপন্যাসিক। শেষ পর্যন্ত জেনেছেন প্রকৃতির জীবনও মানুষের জন্য যথার্থ নয়, মানুষই অপরিহার্য। স্বাধীনতা উত্তর নানা অসঙ্গতি পর্যবেক্ষণ করতে করতে এক সময় ক্লান্ত আহমদ ছফা হয়ত পশু-পাখি প্রকৃতি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চেয়েছিলেন, এর মাধ্যমে তিনি হয়ত শান্তির আশ্রয় অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন। আহমদ ছফার এই অনুসন্ধান জীবনের অনুসন্ধানও। 'পুষ্প বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ' এর কেন্দ্রীয় চরিত্র আহমদ ছফা নিজেই। গণকণ্ঠ পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর লেখক বিপন্ন হয়ে

পড়েছিলেন। ওই অবস্থা থেকেই কাহিনির শুরু। ওইদিনই তিনি একটি বেগুনচারা রাস্তায় পায় এবং নিজের হোস্টেলের একপাশে তা রোপণ করেন। এভাবেই শুরু হয় তার প্রকৃতির জীবন।

এই প্রকৃতির জীবনের মধ্যেই লেখক জীবনের সার্থকতা খুঁজেছেন। লেখকের দাবি প্রকৃতির জীবনই তার জীবনের পূর্ণতা দান করিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির জীবন থেকে একসময় লেখককে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। মাটির মানুষের জগতে হিংস্রতা এবং হানাহানি দেখে আকাশের পাখির জগতে ছফা আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানেও হিংস্রতা এবং জাতি বৈরিতার প্রকোপ। সুতরাং মানুষের মতো কর্তব্য পালন করার জন্য মানুষের মাঝে না ফিরে গিয়ে উপায় ছিল কী?

আহমদ ছফা মৌলিকতাহীনতার ভিড়ে একজন যথার্থ মৌলিক শিল্পী। দোষগুণ-ভালোমন্দ মিলেই তিনি এ মৌলিকতার ধারাবাহিতকতা বজায় রেখেছেন তার সাহিত্যে। আহমদ ছফার উপন্যাসগুলো নিঃসন্দেহে মৌলিকতার নির্দশন, যার মাধ্যমে লেখক সমজা-রাষ্ট্রের ব্যবচ্ছেদ করেছেন, ফুটিয়ে তুলেছেন ব্যক্তি-মানসের নানা অভিজ্ঞতাও। সম্পর্কের সুতোয় উপন্যাসগুলো বেঁধে আহমদ ছফা সমাজ-রাষ্ট্রের গতিপথ, পথচ্যুতি দেখিয়েছেন। তাই আহমদ ছফার উপন্যাস নিছক উপন্যাস নয়। বরং তা সমাজ-রাষ্ট্রের প্রকৃত বাস্তবতা।

তথ্যসূত্র

মহীবুল আজিজ, *আহমদ ছফা : তাঁর সাহিত্যিক অনুসন্ধিৎসা*, মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান সম্পাদিত 'আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩

সুদীপ্ত হান্নান, আহমদ ছফার উপন্যাস : বাংলাদেশের জন্ম ও বিকাশের রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যাকরণ, দ্বাদশ আহমদ ছফা স্মৃতিবক্তৃতা, ঢাকা ২০১৪

তৃতীয় অধ্যায়

আহমদ ছফার উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব সমাজ ও জীবন

আহমদ ছফার উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব সমাজ ও জীবন

'সূর্য তুমি সাথী (১৯৬৭)'র মাধ্যমে ঔপন্যাসিক হিসেবে যাত্রা শুরু আহমদ ছফার। চট্টগ্রামের চন্দনাইশের বরগুইনিপাড়ের গ্রামীণ মানুষের যাপিত জীবনের চিত্র এ উপন্যাসে উপস্থাপিত। পাশাপাশি ওই অঞ্চলের মানুষের জীবন-যাপন অভ্যাস, ধর্মীয় মূল্যবোধের আড়ালে ঔপন্যাসিক যেন ধর্মবিভক্ত রাষ্ট্রের কুৎসিত রূপ উন্মোচন করেছে। উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হিসেবে একটিমাত্র অঞ্চলের চিত্র উঠলেও বাস্তবে যেন তা পুরো বাংলাদেশের চিত্র। বরগুইনিপাড় যেন পুরো বাংলাদেশেরই প্রতিধ্বনি। দেশভাগ পূর্ব-উত্তর হিন্দু-মুসলিম অধ্যুষিত একটি পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মের নামে শোষণ-অপমান, গ্রামীণ মানুষের মধ্যবিত্ত-মাতব্বর শ্রেণীর অন্যায় দাপুটে অত্যাচারের বর্ণনার পাশাপাশি শোষণের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা উপন্যাসে বিদ্যমান।

ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসের বিষয় হিসেবে হিন্দু ও মুসলিম অধ্যুষিত বরগুইনি পাড়ের পাশাপাশি দুটো গ্রাম গাছবাড়িয়া-সাতবাড়িয়া অঞ্চলের সাম্প্রদায়িকতা, গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ও মাতব্বর শ্রেণীর অন্যায় দাপটে সাধারণ মানুষের করুণ জীবনের আলেখ্য নির্মাণ করেছেন।

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বসাধনা ও জীবন সংগ্রামের গতিশীল রূপ বিন্যস্ত হয়েছে আহমদ ছফার 'সূর্য তুমি সাথী উপন্যাসে'। সংলাপে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ সত্ত্বেও এ উপন্যাস সমগ্র বাংলাদেশের সমাজবিবর্তনের মৌল বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়েছে। জীবন নির্বাচন ও রূপায়ণের প্রশ্নে আহমদ ছফা ব্যক্তিজীবনের পূর্ণবৃত্ত ছককে গ্রহণ করেননি। বিশেষ ভৌগোলিক কাঠামোর

জীবনসমগ্রতা উন্মোচনের প্রয়োজনে তিনি একাধিক চরিত্রের অন্তর-বাহিরকে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কৃষিভিত্তিক জীবনের ধ্বংসস্তূপের মাঝ থেকে তিনি শ্রমজীবী মানুষের মর্মন্তুদ জীবনস্বরূপ এবং তার সম্ভাবনার সূত্র সন্ধান করেছেন। (রফিকউল্লাহ ২০০৯ : ১২৮)

আহমদ ছফা লিখেছেন, প্রথম উপন্যাসটি আমি লিখেছি বাজী ধরে 'সূর্য তুমি সাথী'। যখন মানিকের উপন্যাসে আমরা পড়লাম 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'পুতুল নাচের ইতিকথা'- আমি তখন ফার্স্ট ইয়ারের ছেলে, তখন আমার দাড়ি গোঁফ ওঠেনি। তো, লিখাটা লিখলাম তখন বাজী হলো যদি লেখাটা 'সংবাদ' এ ছাপতে পারি একশো টাকা দেবে আমার বন্ধু জামাল খান (ছ. সা. ১৯৯৬ : ৭০)

আহমদ ছফার ভাতিজা নূরুল আনোয়ার লিখেছেন, সূর্য তুমি সাথীকে আহমদ ছফার প্রথম প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হিসেবে মনে করা হয়। কিন্তু আমার জানামতে তার আগে তিনি আরও একটি বই লিখেছিলেন এবং তা প্রকাশিতও হয়েছিল। বইটির নাম ছিল 'বরুমতির আঁকে বাকেঁ।' বইটি আমাদের এলাকায় জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এখনও বইটি অনেকের মুখে মুখে। বরুমতি নদীর দুপাড়ের মানুষ নিয়ে বইটি রচিত হয়েছিল। বর্তমানে বইটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। ছফা কাকাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বলেছিলাম, আপনি বরুমতির আঁকে বাঁকে একটি বই লিখেছিলেন। মনে পড়ে? তিনি একগাল হেসে জবাব দিলেন, লিখেছিলাম তো। কিন্তু সে তো আগের কথা। এ রকম লেখা খুঁজলে আহমদ ছফার অনেক পাওয়া যাবে। (নূরুল ২০১০ : ৫৮)

নূরুল আনোয়ার উল্লেখ করেছেন বরুমতির আঁকে বাঁকে বইটি আহমদ ছফার প্রথম বই হলে তার দ্বিতীয় বই তানিয়া। তানিয়া বইটি তিনি অভাব-অনটনের কারণে অনুবাদ করেছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজ থেকে বিএ প্রাইভেট পরীক্ষার ফরম পূরণের টাকা যোগাড় করার জন্য তিনি দুই দিনে তানিয়া বইটি অনুবাদ করেছিলেন। 'সূর্য তুমি সাথী' তারও পরের রচনা।

ঔপন্যাসিকরা সমাজ সচেতন উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে তাতে বাস্তবধর্মী চরিত্র উপস্থাপনে সচেষ্ট হন, এটাই সাধারণত ধারণা করা হয়। কিন্তু আহমদ ছফা উপন্যাসে লেখক কিছু চরিত্র উপস্থাপন করেছেন যা বাস্তবধর্মী নয়, বরং একেবারেই বাস্তব। চরিত্রগুলোর নামগুলো তিনি পরিবর্তন করেননি।

সূর্য তুমি সাথী বিষয়ে আহমদ ছফা বলেছেন :

এটার কাহিনীগুলো প্রায় আমাদের পরিবারের সংলগ্ন কাহিনী। যে চরিত্রগুলো, ও আল্লাহ এখানে এক খলু মাতব্বর আছে। যে মারা গেলো একশ বিশ বছর বয়সে ক'দিন আগে, সে আমার খালাতো বোনের জামাই। (নাসির ২০১৩ : ৭৭)

ক. পায়ে পায়ে শোষণ

ধর্মীয় বিধি-নিষেধের আড়ালে উপন্যাসটিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে 'ছোটলোকের চাইতে ছোটলোকের' নানা শোষণের কথা। আহমদ ছফা উপন্যাসটির শুরু করেছেন তপ্ত প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে। এই তপ্ত প্রকৃতি যেন তপ্ত মানুষের প্রতিচ্ছবি। যে মানুষেরা প্রতিনিয়ত শোষণের শিকার হচ্ছে। একসময় তারা মুক্তির পথ খোঁজে, শোষণ থেকে বাঁচতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা চালায়। বিরূপ প্রকৃতির বর্ণনার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক কাহিনীর বিরূপতার দিকে প্রবেশ করেছেন ধীরে ধীরে। প্রকৃতির রুদ্রমূর্তির মধ্যে মানুষের আসন্ন বিদ্রোহী চেতনার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

আহমদ ছফা হয়ত একটি অসাধ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন উপন্যাসের মৌলবস্তু উপস্থাপন করে। তিনি প্রয়োজন অনুধাবন করেছিলেন এভাবে চলতে পারে না। তিনি বাঙালি মুসলমানের জীবনযাপন পদ্ধতির পরিবর্তন চেয়েছিলেন। আহমদ ছফা এই সাধনার পথেই এগিয়েছেন।

আহমদ ছফার বিশ্বাস, দুবছরে কিংবা চারবছরে হয়তো এ অবস্থার অবসান ঘটানো যাবে না, কিন্তু বাঙ্গালি মুসলমানের মনের ধরন-ধারণ এবং প্রবণতাগুলো নির্মোহভাবে জানার চেষ্টা করলে এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ হয়তো পাওয়া যেতে পারে। (ছফা ২০০৬ : ৩৬)

বৈশাখের শেষ। আধা বছর জুড়ে বিশাল নীলাকাশে সূর্যের রুপোলি আক্রোশ-সহস্র শিখায় শ্যামল পৃথিবীতে আগুন ঢেলেছে। অগ্রহায়ণের শেষাশেষি একদিন আসমানের চার কোণে জমাট বাঁধা কালো মেঘ কালো গাইয়ের ওলানের বরণ ধরেছিল। বজ্রেরা চিৎকার করে ফেটে পড়েছিল। মেঘের বুক চিরে চিরে বিজুলির শাণিত ছুরি ঝিকঝিকিয়ে জেগেছিল।...আসমানের বিশাল ভয়ঙ্কর শুভ্র শিখার কুণ্ড কুণ্ড লক্ষ লক্ষ আগুন রসনার তাপে পলকে পলকে ধরিত্রীর রূপরস শুষে নিচ্ছে, গোলাকার প্রসারিত খোলের তলায় গলানো রুপোর মতন শিখারা ঝিলিমিলি খেলা করে। ডাইনে-বাঁয়ে-সামনে-পিছে যতদূর যায় চোখ আগুন, আগুনের হলুদ শিখা। মাঠে আগুন, গাছে আগুন, ফসলে আগুন। (সূর্য: ১৭)

আহমদ ছফা বোধ করি ইঙ্গিত দিলেন পরিবর্তনের। প্রকৃতির এই বর্ণনা নিছক বর্ণনা নয়, প্রকৃতির আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে বিস্তীর্ণ এক সমাজের আখ্যান। যে আখ্যান ছোটলোকের চেয়ে ছোটলোকদের। এরপর লেখক ইঙ্গিত দিলেন আগুনের। সবদিকে আগুনের বিস্তার, মাঠে আগুন,

ফসলে আগুন। মানে হলো শোষণের নাগপাশ ছিন্ন তখনই সম্ভব যখন প্রতিশোধের আগুন, অধিকারের আগুন জ্বলজ্বল করে ওঠে, অধিকার আদায়ের আগুন ছড়িয়ে পড়ে পারিপার্শ্বিক মণ্ডলে।

প্রকৃতির এই বর্ণনার পর নায়কচরিত্র হাসিমের আগমন। হাসেম চরিত্র উপস্থাপনের বেলায়ও আগুনের বর্ণনা। মানে এই হাসিম চরিত্রের মধ্যেই লেখক তার 'বিপ্লবের' স্বপ্ন দেখার ইঙ্গিত দিচ্ছেন। পাঠককে আস্তে আস্তে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন শোষিত মানুষের প্রতিনিধি এক চরিত্রের সঙ্গে যে কি না মুক্তির স্বপ্নে গ্রাম ছাড়বে, গন্তব্য যার অজানা কোনো পথে।

> আগুনের জোয়ার ফোলা সাগর সাঁতরে যেন এল হাসিম। তার বুকে-পেটে, চোখে-মুখে আগুন। ধুঁকে ধুঁকে বান্যা পুকুরের বটতলায় এসে কাঁধের লাকড়ির ভারখানা নামাল। বটগাছ যেখানে শীতল ছায়া মেলে দিয়েছে সেখানেই ছায়ার কোলে আধাসেদ্ধ শরীরখানা এলিয়ে দিল। লাকরির ভারের ওপর পা আর মাটির ভাপে শুকিয়ে যাওয়া ঘাসের ওপর বাদবাকি শরীরখানা রেখে চোখ বুজে রইল। ... চোখ বুজে থাকতে পারে না আগুনে পোড়া অর্ধদগ্ধ শরীরের চেতনায় কী এক অনুভূতি জেগে উঠতে চায়। সূর্যের ধারালো নখের বুকের ভেতর যেখানে কলজে, সেখানে তপ্ত গরম ছ্যাঁকা দিয়েছে। (সূর্য : ১৮)

হাসিম যে সমাজে বসবাস করে নিচু শ্রেণির হিন্দু থেকে তার পূর্বপুরুষ মুসলমান হলেও যথাযথ মর্যাদা পায়নি হাসিম। কী মুসলমান, কী হিন্দু কোথাও হাসিমের জন্য সহানুভূতি নেই। তাকে পথে পথে লাঞ্ছিত হয় বেনের জাত বলে। বান্যার পুকুরে মাছ ধরার সময় অধরবাবুর কাছে হাসিম অপমানিত হয়।

সম্প্রদায়গত আচরণ ও অন্তরঙ্গতাগত দূরত্বই নয়, গ্রামীণ উচ্চবিত্ত জমিদার-মাতব্বর শ্রেণির সঙ্গে সাধারণ মানুষ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অতলান্ত ব্যবধানও এ উপন্যাসে চিত্রিত। হাসিম, তেজেন, হরিমোহন, ছতুর মা, কবীরের বাপ দারিদ্র্যসীমার প্রান্তরেখায় বসবাস করলেও তাদের প্রতি ধনীরা সাহায্যের হাত প্রসারিত করে না। এদের অভাব, নির্যাতন, উপন্যাস লেখকের অন্তরকে ব্যথিত করে। তাই তেলিপাড়া তেজেনের মৃত্যুতে লেখক পাপ হিসেবে দেখেন না, বরং তেজেনের বিষণ্ন দুই চোখের জিজ্ঞাসার মাধ্যমে যেন সমগ্র বাংলাদেশের নির্যাতন আর নিপীড়নকেই তুলে ধরেন। (মোমেনুর ২০১১ : ১৭৪)

হাসিমের দিকে চোখ পড়তেই অধরবাবুর হাসি-হাসি মুখখানা গম্ভীর হয়ে যায়। কপালে স্পষ্ট ঘৃণার কুঞ্চিত রেখা জাগে। থু করে একদলা থু থু হাসিমের পানে ছুড়ে দেয়। তারপর জালের সঙ্গে মাছটা

জড়িয়ে চোখের কোনো তাকে বিদ্ধ কওে বিলে নেমে হাঁক দিল : 'আয় গনেশ্যা চলি আয়' (আয়, গনেশ চলে আয়)'

কেবল অধরবাবু নয়, মুসল্লি ছতুর বাপও হাসিমকে ছাড়েনি। গ্রামীণ এক দোকানে হাসিমকে দেখে ছতুর বাপ তার জাত তুলে কথা বলে

> বান্যিয়ার পুত, তুই এডে ক্যা? নামাজ-কালাম কিচ্ছু নাই, শুক্কুরবারেও জুমাত ন আইয়স ক্যা (বেনের ছেলে তুমি এখানে কেন? নামাজ-কালাম কিছু নেই, শুক্রবারের মসজিদে আস না কেন?)
>
> হাসিম জবাব দেয় না। জবাব না পেয়ে ছতুর বাপের শান্ত শীল কণ্ঠস্বরে একটু উত্তাপ জাগে। অধিকতর দৃঢ়কণ্ঠে বলল :
>
> 'কাইলথুন মসজিত ন দেখিতে পাড়াত থাকিতে ন পারিবি। সম থাকতে কই দিলাম। মুসলমানের পাড়া (কাল থেকে মসজিদে না দেখলে পাড়ায় তাকতে পারবে না, আগে বলে দিলাম। মুসলমানের পাড়া) সূর্য : ২৩

কে এই হাসিম, কেন এই নির্যাতন। হাসিমের দৃষ্টিকোণ থেকেই বাবার পরিচয় উঠে এসেছে। গোকুল ধরের কনিষ্ঠ সন্তান হরিমোহন কাজী বাড়ির মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন। কাজী রহমত আর কানা আফজালের প্ররোচনায় দীর্ঘদিনের ধর্মীয় সংস্কার বিসর্জন দিয়ে মুসলমান হয়েছিল। হরিমোহনের নতুন নামকরণ হয় মুহম্মদ ইসমাইল খান। কথা ছিল কাজীর মেয়ে জরিনার সঙ্গে বিয়ে হবে। কিন্তু না কাজী রহমত নিজ মেয়ে জরিনাকে বিয়ে দিলেন অন্য জায়গায়। জরিনার জায়গায় বিয়ে হলো এক দাসীর সঙ্গে। সেই দাসীর গর্ভেই হাসিমের জন্ম। হাসিমের মনেব্যক্তি প্রকাশ পায় এভাবে :

> তার মা দাসী, বাপ বেনে। জন্মসূত্রে কপালে যে সিলমোহর পড়েছে তার থেকে এ জন্মে আর নিষ্কৃতি নেই। তাকে লোকে ঘৃণা করবে, বিদ্রূপ করবে, অবজ্ঞা করবে। মানুষের মর্যাদা তার ভাগ্যে নেই। কোনোদিন উদার চোখে পাড়ার মানুষ তার দিকে চাইবে না। তেমন বিরাট প্রসারিত মন এদের কই। (সূর্য : ২৫)

প্রসারিত মন না থাকা মানুষের তালিকায় থাকা একজন হলেন কানা আফজাল। ধুরন্ধর চিন্তা, ক্ষমতার অপব্যবহার আর শোষণপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের তথাকথিত মান্যগণ্য ব্যক্তিতে আসনে চেপে বসেন। কাজী রহমতের 'ঘাড়ে পা দিয়েই' কানা আফজালের মতো পরগাছা একসময় মহীরূহে পরিণত হয়।

কানা আফজালেরা মাথা তুলছে। কানা আফজল এখন আলহাজ্ব আফজল আহমদ চৌধুরী। মান্যগণ্য ব্যক্তি, ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। 'চেহারাতে চেকনাই লেগেছে। পোশাকে রুচি ফিরেছে। কিন্তু স্বভাবটা ঠিক আগের মতো আছে।' ধর্মীয় শোষণ, সামাজিক শোষণ, অর্থনৈতিক শোষণ সব শোষণের নাগপাশের মধ্যেই হাসিম বেড়ে উঠেছে। হাসিম এই নাগপাশ ছিন্ন করতে চায়। ভেতর থেকে এক ধরনের বিদ্রোহ জেগে ওঠে তার। কেননা এই হাসিম সমগ্র নির্যাতিত মানুষের প্রতীক মনে করে নিজেকে।

'সূর্য তুমি সাথী' উপন্যাসের চরিত্রগুলোর ধরন, গতিপ্রকৃতিতে আমরা তিন প্রকারে বিন্যস্ত করতে পারি। এক শ্রেণী কেবল ধর্মের নামে শোষণ করে চলেছে, এরা কৃষককে ঠকিয়েছে জবরদস্তি করে, মুখে এরা শান্তির কথা বললেও এদের পরতে পরতে লুকিয়ে রয়েছে স্বার্থবাদিতা। কাজী রহমত, কানা আফজাল, জাহেদ বকস, খলু মাতব্বর, অধরবাবু, কাদির মিয়া এরা শোষণের যন্ত্র। এরা ক্ষমতার প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে নিম্নবিত্তের মানুষের মাঝে চালায় শোষণের হাতিয়ার।

দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্রের মধ্যে রয়েছে হাসিম, হাসিমের বউ সুফিয়া, খলু মাতব্বরের ভাতিজি জোহরা এবং হাসিমের বৃদ্ধা দাদী শৈলবালা। এরা শোষক শ্রেণির কাছ থেকে নানাভাবে নির্যাতন-শোষণের শিকার হয়েছে। হাসিম জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে অর্থনৈতিক শোষণ, জাতিগত শোষণের শিকার হয়েছে, মাতব্বরের বাড়িতে চাল ধার করতে গেলে সুফিয়া লাঞ্ছিত হয়েছে, তাকে অপমান করা হয়েছে।

মাতব্বর বলে, এই বান্যিয়ার পুতের বউ, আর তোর ঘরের কাছে পিছে দেহিলে ঝুড়া কাডি লইয়াম। (এই বেনের বউ, আবার তোকে ঘরে দেখলে খোঁপা কেটে নেব।) সূর্য : ৩৫

জোহরা নির্যাতনের শিকার হয়েছে তার চাচার হাতে। জোহরা যেন অধিকার আদায়ের সৌভাগ্য নিয়ে আসা কোনো নারী নয়, এখানে সে কেবল অত্যাচার সয়ে যাওয়া মৃত মানব সত্তা। যে কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না। সামাজিকভাবে তো বটেই তাকে ধর্মের দোহাই দিয়েও শোষণ করা হয়েছে। এমনকি মৃত স্বামীর মুখ দেখতে দেওয়া হয়নি জোহরা। সর্বশেষ মামলায় জেতার জন্য, পুলিশি ঝামেলা থেকে বাঁচতে দারোগার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। জোহরা শেষ পর্যন্ত তার পেটে দারোগার ঔরস ধারণ করে।

হাসিমের বৃদ্ধ দাদি নির্যাতনের শিকার হয়েছে সামাজিকভাবে-ধর্মীয়ভাবে। ধর্মীয় পরিচয়ে হাসিম মুসলমানের ছেলে হলে বৃদ্ধামন তাতে সায় দেয়নি। সে নিজেকে হাসিমের দাদি বলেই প্রচার করতে সান্ত্বনা লাভ করে। অপরদিকে হিন্দু সমাজের ভয়ে অশীতিপর বৃদ্ধাকে সমাজ সমঝে চলতে হয়ে। নাতি অধরবাবুকে জমের মতো ভয় পায় বৃদ্ধা শৈলবালা।

শোষক-আর শোষিতের মাঝে আরেক শ্রেণির চরিত্রকে উপস্থাপন করা হয়। এরা হলো কৃষক সমিতির কয়েকজন সদস্য, যার নেতৃত্বে রয়েছেন মনির আহমেদ। এরা শোষক গোষ্ঠীর কাছে আতঙ্ক আর নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের কাছে এরা আলোকবর্তিকা।

কেবল হাসিম নয়, হাসিমের মতো নির্যাতিত উপন্যাসের অন্যতম এক চরিত্র জোহরা। খলু মাতব্বরের ভাতিজি জোহরা। তাকে ধর্মের শোষণে বন্দি করেন খলু মাতব্বর। সাতবাড়িয়ায় তৃতীয়বার কবীর নামে এক ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয় জোহরার। খলু মাতব্বরের কূটকৌশলে জোহরার সংসার ভাঙে। খলু মাতব্বর আশ্রয়দাতার ভূমিকার পরিবর্তে জোহরার স্বপ্ন প্রতিনিয়ত ভঙ্গ করেছে। ফতোয়া দিয়ে তাকে স্বামীর মৃতমুখ দেখতে দেওয়া হয়নি।

খলু মাতব্বর বলেছে, 'আইনমতে জোহরা কবীরকে কাজীর অফিসে গিয়ে তালাক দিয়েছে। সুতরাং কবীর এখন বেগানা পুরুষ। শরীয়তমতে বেগানা পুরুষের মরা মুখ দেখাও হারাম।' এবার ঔপন্যাসিক জোহরা আদ্যোপান্ত তুলে ধরছেন :

> আরো-দু' দুবার বিয়ে হয়েছে জোহরার। মাতব্বর মামলাবাজ, দাঙ্গাবাজ মানুষ। আগের দু-খসমের মধ্যে একজনের জমি মামলা করে নিজের চাষে নিয়ে এসেছে এবং অন্যজনের নামে অলঙ্কার ও খোরপোশের নালিশ করে সবকিছু আত্মসাৎ করেছে। তৃতীয়বার সাতবাড়িয়ার কবীরের সঙ্গে জোহরার বিয়ে হয়েছিল, গেল ফাল্গুনের আগের ফাল্গুনে। জোহরা শ্বশুরের জমি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা চলছিল। জোহরা অশান্তিতে আছে এ অজুহাতে নাইয়র এনে তার শ্বশুরাড়িতে যেতে দেয়নি। কাজীর অফিসে গিয়ে জোহরাকে দিয়ে কবীরকে তালাক দিতে বাধ্য করে তিন কানি জমি দখলের ফন্দি করেছে। তালাক দেয়ার পরেও কবীরের প্রতি জোহরার টানের কথা মাতব্বর বিলক্ষণ জানত। জমি জোহরার নামে। মেয়েমানুষের মনের গতি কি বোঝা যায়! কথায় বলে বারো হাত কাপড় পরেও ন্যাংটা থাকে। এখন কবীর মরছে। আপদ বিপদ চুকেবুকে গেছে। জমি নিজের চাষে নিয়ে আসার পথ নিষ্কণ্টক। সে আনন্দে খলু মাতব্বর বগল বাজাচ্ছে। (সূর্য : ৩৪)

এ ছাড়া কৃষিভিত্তক সমাজের কূটকৌশলী চক্রের মোকদ্দমায় জেতার হাতিয়ার হয়েছে জোহরা। পুরুষতন্ত্র কেবল জোহরাকে প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে, স্বার্থবাদী গোষ্ঠী জোহরার মনের আবেগকে বুঝতে পারেনি কিংবা বোঝার চেষ্টাও করেনি। কৃষিভিত্তিক সমাজে শক্তি-দ্বন্দ্বের প্রধান উৎস জমি। জমিসংক্রান্ত দাঙ্গায় বরগুইনি পাড়ের পাশাপাশি দুটো গ্রামে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সাতবাড়িয়ার কাদের মিয়ার সঙ্গে গাছ-বাড়িয়ার খলু মাতব্বরের দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে।

> দুপক্ষে যথারীতি খবর চালাচালি হয়ে গেল। আগামী সোমবার দাঙ্গার দিন ধার্য হয়েছে। দুদিন ধরে সারা গ্রামের কারো চোখে ঘুম নেই। কিরিচ শানাচ্ছে। কামারবাড়িতে পিটিয়ে বর্শার মুখ ছুঁচালো করে আনছে। মেয়েরা রাত জেগে ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে মরিচের মিহি গুঁড়ো তৈরি করছে। বাঁশঝাড় থেকে লাঠি কেটে জুতসই করছে। খলুর মেটে দেওয়ালের বৈঠকখানায় দিনে-রাতে মিটিং চলছে। নতুন নতুন পরামর্শ হচ্ছে। কৌশলের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। রোববার দিন বিকেলবেলা খলুর বড় ছেলে হাজারীহাটে গিয়ে একটা গোটা গরুর গোশত কিনে নিয়ে এল। আগামীকাল দাঙ্গা করতে যাবার আগে লেঠেলদেরকে গোশত দিয়ে ভাত খাওয়াবে। (সূর্য : ৪৬)

ফলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। মনির আহমদ, হিমাংশু ধর, মান্নান প্রভৃতি চারজন মাতব্বরকে ডাকতে ডাকতে বৈঠক খানায় এলো। এরা কৃষক সমিতির মানুষ। এই কৃষক সমিতিই প্রথমেই উচ্চারণ করে শান্তির বাণী। তারা সামাজিক স্থিতিশীলতা আর শান্তির স্বার্থে মাতব্বরকে আহ্বান জানায়।

কৃষক সমিতির নেতা মনির আহমদ বলে :

> 'হুইনলাম খলু চাচা, তোঁয়ারা দাঙ্গা গরিবার লাই তৈয়ার অইয়ো। আঁরা আস্যিদে মীমাংসার লায়। কী লাভ চাচা মারামারি কাডাকাডি গরি? তারথুন মীমাংসা বউত ভালা। তারপরে কোর্ট কাচারিতে দৌড়ন লাগিব। তিনকানির লায় দশাকানির টেঁয়া খরচ গরন লাগিব।' (শুনলাম খলু চাচা, তোঁয়ারা দাঙ্গা করবার জন্য তৈরি হয়েছ। আমরা এখানে এসেছি মীমাংসার জন্য। মারামারি কাটাকাটি করে কী লাভ? তার চেয়ে মীমাংসা ভালো। কোর্ট-কাচারিতে দৌঁড়াতে হবে। তিন কানির জন্য দশকানির টাকা খরচ করতে হবে।) সূর্য :৪৬

কৃষক সমিতি সমাধানের উদ্যোগ নিলেও ভেস্তে যায়। খলু মাতব্বর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে 'তোঁরার সমিতি ভরি আই মুতি, দুত্তোর সমিতি। মীমাংসার কথা কইলে কইব চেয়ারম্যান' (তোদের সমিতিতে আমি প্রস্রাব করি, দুত্তোর সমিতি। মীমাংসার কথা বললে বলবে চেয়ারম্যান।)

ফলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। কাদের মিয়ার সঙ্গে খলু মাতব্বর পরাস্ত হয়। তারপক্ষের লাঠিয়ালরাই বেশি জখম হয়। দারোগা পুলিশের উপস্থিতিতে প্রকম্পিত হয় জনপদ। আইনি ঝামেলা থেকে বাঁচতে খলু মাতব্বর নিজের ভাতিজি জোহরা তুলে দেয় পুলিশের দারোগার হাতে।

> হাসিম বেরিয়ে আমগাছটার কোলভরা অন্ধকারের ভেতর আত্মগোপন করে রইল। দেখল, জোহরাকে জোরে জোরে ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে দরজার কাছ অবধি নিয়ে যাচ্ছে। কাঁদছে জোহরা। কাঁদবার পালা তার। খলু তাকে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শেকল তুলে দিল। এমনও হয়? এমনও হয়? চিন্তা করতে পারে না হাসিম। আপন চাচা নিজের ভাইয়ের মেয়েকে জোরে-জব্বরে দারোগার কাছে ঠেলে দিতে পারে? হাসিম কী দেখছে? পৃথিবীটা কাঁপছে কেন? আকাশ-বাতাস টলছে কেন? বোধশক্তি সে হারিয়েছে ফেলেছে। নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়িয়ে থাকল। তার দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই আধখানা সোনার থালার মতো সুন্দর চাঁদ ডুবে গেল। চরাচরের জীবন্ত পিচের মতো অন্ধকার। হেঁটে আসছে কে একজন। সেদিকে এগিয়ে গেল হাসিম। তাকে দেখে হেঁটে আসা মূর্তি থমকে দাঁড়ায়। হাসিম জিজ্ঞেস করে। কিন্তু ফ্যাসফ্যাসে গলায় স্বর বেরোয় না।
>
> 'হেইভা কন?' (তুমি কে?)
>
> ছায়ামূর্তি কথা কয় না। এগিয়ে আসে। কেঁপে কেঁপে হাসিমের হাত ধরে। জড়িয়ে ধরে কাঁপতে থাকে। হাসিমও কাঁপে। কেন কাঁপে? জোহরা সংজ্ঞা হারিয়ে হাসিমের গায়ে ঢলে পড়ে। অন্ধকারের নির্মম চক্রান্ত চারদিকে। এ অন্ধকারেই ঢলে পড়ল নির্মমভাবে ধর্ষিতা জোহরা।

খলু মাতব্বরের সংসারে জোহরার যেন কোনো জীবন্ত অস্তিত্ব নেই, তার স্বাধীনতা নেই। জোহরাও হাসিমের মতো নির্যাতিত। সে অধিকারের কথা বলতে পারে সে কোনো বেদনার কথা কাউকে বলতে পারে না :

> জোহরার শরীরে হাড়-মাংস নেই। আগুনও লাগে না, কালিও হয় না। কারণ তার যাওয়ার জায়গা নেই কোথাও। যাবে সে কার কাছে? চাচার বিরাট সংসারের সকলের মন যুগিয়ে চলতে হয়। সকলে ব্যথা দেয়, আঘাত করে; কাউকে ফিরিয়ে সে আঘাত দিতে পারে না। আঘাতের মাত্রাটা ইদানিং তীব্রতর হয়ে উঠেছে। আঘাত, নিরাশা আর দ্বন্দ্বের তাড়নায় তার হৃদয় ভেঙে শত টুকরো হয়ে গেছে। আর সইতে পারছে না সে। উষ্ণ নিশ্বাস বুকের ভেতরে জমে জমে উত্তপ্ত বাষ্পের সৃষ্টি হয়েছে। আগে মানিয়ে নিত সকলের সঙ্গে। সকলের খুশির অনুপাতে নিজেকে ছোট করে নেয়ার শিক্ষা তার আজন্মের। দারোগার কাছে সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়ার পর সে উৎসাহ তার মরে গেছে। কাজকর্মে প্রেরণা পায় না। চাচির খুব কষে গালাগাল দিলে ড্যাবড্যাবে কালো দুচোখ মেলে চেয়ে থাকে। কী জবাব দেবে ভেবে পায় না। (সূর্য: ৭৬)

খ. শৃঙ্খল ভাঙার সাহস

হাসিমের ইতবৃত্ত তুলে ধরে ঔপন্যাসিক সমাজসত্যের গভীরে প্রবেশ করেছেন। দিনমজুর হাসিম পিতৃপরিচয়ে গ্লানি ভুলে নিজেকে পরিচয় দেয় মুসলমান হিসেবে। কিন্তু ধর্ম-সমাজ তাকে সে পরিচয়ের স্বীকৃতি দেয়নি। তাকে গালি দেওয়া হয়ে 'বাইন্যার পুত' বলে। সমাজে ধর্মভিত্তিক পরিচয়ে বসবাসকারী মানুষের অসারতা, তাদের সংকীর্ণতা হাসিমের নির্যাতনের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন আহমদ ছফা। হাসিম কেবল একজন নির্যাতিত মানুষ নয়, হাসিম গ্রামবাংলার অগণিত নির্যাতিত মানুষের প্রতিনিধি। লোকবিশ্বাস, প্রথাগত, ধমীয় পরিচয়, লোকের গঞ্জনা সয়ে হাসিম চরিত্র সামনের দিকে অগ্রসর হয়। একসময় সে আলোকশিখায় পরিণত হতে চায়।

মনের গভীর সঙ্গোপনে ক্ষীণ স্পষ্ট একটি আলোক শিখা জেগে ওঠে। এই চেতনাই তার হাতিয়ার। এরই আলোকে পথ দেখে দেখে অত্যাচার অবিচার সয়ে সয়ে সে এত বড়টি হয়েছে। হাসিম স্পষ্ট দেখতে পায়, মানুষের নীচতা, ক্ষুদ্রতা আর ভণ্ডামির সীমা কতদূর। নিজেকে সমগ্র নির্যাতিত মানব-জাতির প্রতীক বলে মনে হয়। চেতরা শিখা আরো প্রোজ্জ্বল, সন্ধানী রশ্মি আরো তীক্ষ্ণতর হয়। আষ্টেপাষ্টে জড়ানো শৃঙ্খলকে চোখের সামনে তুলে ধরে। নিজের অস্তিত্বের চারপাশের দেয়ালটাকে আরো স্পষ্টভাবে দেখতে পায়। শরীর উত্তেজনায় আন্দোলিত হয়, মাথায় ছলাৎ ছলাৎ রক্ত ওঠে। সে চিৎকার করে ওঠে : 'এই দেয়াল আঁই ভাইঙ্গম (এই দেয়াল আমি ভাঙব)'

লেখক কেবল ব্যক্তির দুঃখ-দুর্দশা, হতাশা, জীবন সংক্রান্ত তুমুল জিজ্ঞাসা। সমাজের এ অসঙ্গতির বিরুদ্ধে লেখক হাসিমকে দাঁড় করিয়ে দেন সংঘবদ্ধ শক্তির অন্তর্ভুক্ত অপর শক্তি হিসেবে। যে হাসিম নির্যাতিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত হয়েছে সেই হাসিমই এক সময় নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের পক্ষে কাজ করে। বিদ্যমান যে সমাজ অসাম্যের রীতি নিয়ে বছরের পর বিকশিত-বিবর্তিত হচ্ছে একই ধাঁচে, হাসিম সেখানে এগিয়ে যায় সাম্যবাদী মানসিকতায়।

হঠাৎ অনেকগুলো ঘটনার আকস্মিক আলোকসম্পাতে তার দৃষ্টিশক্তিতে অনেক তীক্ষ্ণতা এসে গেছে। জীবনের একটা অর্থ ধীরে ধীরে রূপময় হয়ে তার চোখে জেগে উঠেছে। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের আচার-আচরণের অন্তরাল যে মহাসত্য সক্রিয় হাসিমের চেতনায় তা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে দিনে দিনে। হাসিম অহরহ দগ্ধ হয়। বুকের চিন্তার আগ্নেয় রশ্মি মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মতো ঝলসে ওঠে। সে

আলোকে জগৎ জীবনের সমস্ত রহস্যকে বিচার করা যায়, বিশ্লেষণ করা যায়। মানুষ তাকে অবজ্ঞা করে কেন? কেন ঘৃণা করে? হাসিমের ধারণা তার কেন্দ্রবিন্দুতে হাত দিতে পেরেছে সে। সে এক নিষ্ঠুর সর্বভুক অনল।'

গ্রামের ওলাওঠা রোগে একের পর এক মানুষ যখন মরেছে। গ্রামের মানুষের আতঙ্ক কাজ করলেও সংঘবদ্ধ শক্তির আতঙ্ককে পেছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে আর্তমানবতার সেবায়। হাজের মরা ছেলেকে দাফন করতে আসার সময় হাসিমের সঙ্গে পরিচয় হয় কৃষক নেতা মনিরের। এর আগের ঘটনা লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে-

> হাজেরার মরা ছেলেকে দাফন করতে পাড়ার কেউ আসেনি। সেই সকালবেলা মরেছে। মরা ছেলের শিয়রে বোবা হয়ে বসে আছে হাজো। তার চোখের পানির ধারা শুকিয়ে গেছ। পাতার নিচে চোখের পানির মরা খালটি এখনো জেগে আছে। শোকের চেয়ে আতঙ্কটাই এখন হাজেরার বেশি। ওলাউঠার রোগী যদি কবর দিতে না পারে? খলুর দাঙ্গায় জান দিতে মানুষের অভাব হয় না। জাহেদ বকসুর ছেলের বিয়েতে বেগার খাটতে মানুষের অভাব হয় না। অভাব কেবল হাজেরার ছেলেকে কবর দেওয়ার বেলা। একা কী করতে পারে হাসিম। (সূর্য : ৫৭)

খবর পেয়ে ছুটে আসে কৃষক সমিতির নেতারা। দেরি করে আসায় সমিতির নেতা মিনতি প্রকাশ করে করজোরে হাজেরার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। কৃষকনেতা মনির বলে-

> 'আগে খবর ন পাই। হেই কথার লায় দেরি অইয়েদে বইন। কী গইররম, পাড়ার মানুষ ন আগায় ডরে। যুগী পাড়াত একজনরে পোড়ন পড়িল। আরেকজনের কবর দিলাম। (আগে খবর পাইনি তাই দেরি হয়ে গেল বোন। কী করব পাড়ার মানুষ ভয়ে এগিয়ে আসে না। যুগী পাড়ার একজনকে পুড়তে হলো, আরেকজনকে কবর দিলাম।) সূর্য : ৫৮

সেদিনই মনির আহমেদ ও কৃষক নেতাদের অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে হাসিমের প্রথম পরিচয়। মোহিত হয়ে গেল হাসিম। হাসিমের জিজ্ঞাসা প্রবল হয় কৃষক সমিতির নেতাদের ঘিরে। মানুষের অন্তরে এত দয়ামায়া থাকতে পারে? কলেরার সময় গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছে ডরে মানুষ। এক বাড়িতে কারো কলেরা লাগলে বাড়ির মানুষ উধাও। আর এরা সারাটা ইউনিয়ন ঘুরে ঘুরে দেখছে, কোথায় মানুষ মরে আছে, কোথায় মৃতের সৎকার হচ্ছে না। তারা হিন্দু? তারা মুসলমান? তারা কোন জাত?

কৃষক সমিতির নেতা মনির আহমেদ বাস্তবের একটি চরিত্র। যা আহমদ ছফা নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে এই চরিত্র নির্মাণ করেছেন বিশেষভাবে। গাছবাড়িয়া কলেজ গেইট থেকে এশিয়ান হাইওয়ে

বেয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হলে পাওয়া যাবে কলঘর এলাকা। সেই এলাকা থেকে একটা আঁকা-বাঁকা মেঠোপথ (এশিয়ান হাইওয়ের সাথে সংযুক্ত) সোজা পূর্ব দিকে চলে গেছে। এই পথ বেয়ে কিছুদূর অগ্রসর হলেই চোখে পড়বে 'মজহার বাড়ি।' মনির আহমেদের জন্মস্থান বা নিবাসস্থল ছিল এখানেই। কৃষকদের জন্য তিনি আন্দোলনে রত ছিলেন।

ছফা গবেষক শামসুল আরেফিন উল্লেখ করেছেন, সূর্য তুমি সাথীতে মনির আহমদ চরিত্রটি অঙ্কনের পর ছফা তাঁর কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে লেখা ছিল, আপনি গরিব দুঃখীদের বিশেষ করে কৃষকদের আর্থিক উন্নতি তথা সার্বিক উন্নতির জন্য যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তাতে আমি অত্যন্ত খুশি। আমার আশা এবং বিশ্বাস আপনি ভবিষ্যতে তাদের জন্য আরো অনেক কিছু করবেন বা করতে পারবেন। আপনার মতো মানুষ সত্যিই দুর্লভ। এ ধরনের মানুষ সমাজে প্রচুর সংখ্যক প্রয়োজন। আমার সূর্য তুমি সাথী নামে একটা উপন্যাস স্টুডেন্ট ওয়েজ থেকে বেরিয়েছে। সেই উপন্যাসে আমি আপনাকে না জানিয়ে আপনার চরিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। অপরাধ নেবেন না। (শামসুল ২০০৪ : ৪৬)

মনির মুগ্ধ হয় কৃষক সমিতির নেতাদের আচরণে-কর্মকাণ্ডে। কমিউনিস্ট আন্দোলনে জড়িত আহমদ ছফার ব্যক্তিগত জীবন-অভিজ্ঞতার ছায়া পড়েছে এ উপন্যাসে। এ উপন্যাসে কমিউনিস্ট আন্দোলনের গন্ধ রয়েছে।

গ্রামের হাইস্কুলের মাঠে আয়োজিত কৃষক সমিতির সমাবেশে হাসিম প্রথমেই উচ্চারণ করে বিদ্রোহের কথা। প্রথমে হাসিমের গলাটা কেঁপে উঠল। জিহ্বায় কেমন যেন জড়তা, কিসের যেন আওয়াজ একসঙ্গে সমুদ্রের মতো ফেটে পড়েছে। কোত্থেকে হাসিমের বুকে সাহস এ। গলা ফাটিয়ে ঘোষণা করল, 'জালেম গোষ্ঠী ধ্বংস হোক, চাষি মজদূর ভাই ভাই/ অন্ন চাই বস্ত্র চাই, লাঙ্গল যার জমি তার।'

আন্দোলনকারীর লাঙ্গল যার জমি তার ঘোষণা দিয়ে বাঁচার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। হাসিম এ কৃষক সমিতিতে যোগ দিয়ে বুঝতে পারে যে, তার নিজেরও একটা পরিচয় আছে। মহামারিতে কৃষক সমিতির পাশে থেকে কাজ করতে গিয়ে হাসিম অনুধাবন করতে পারে যে, হিমাংশু, মনির আহমেদের মতো পৃথিবীতে এখনো মানুষ আছে যারা বিত্তবানদের দিকে তাকায় না, মানুষকে মানুষ বলে গ্রহণ করে। হাসিমের উপলব্ধিতে ধরা দেয় লেখকের নিজস্ব বিশ্বাস :

একসময় নাকি সমাজের সকলে সমান ছিল। সকলে সমানভাবে স্বাধীন ছিল। দাস ছিল না কেউ কারো। সকলে সমানভাবে পরিশ্রম করত, সমানভাবে ফল ভোগ করত। কেউ বড় কেউ ছোট ছিল না। মানুষ মানুষের মেহনত চুরি করে মানুষকে দাস বানিয়ে রেখে। কৃষক-শ্রমিকের বুকের খুন-ধরা মেহনত চুরি করে ধনী হয়েছে মানুষ। মেহনতি মানুষের বুকের তাজা রক্তে তাদের বাগানে লাল লাল গোলাপ হয়ে ফোটে। সহস্ররকম পদ্ধদিতে বুকের রক্ত শুষে নিচ্ছে। হাসিম যেন চোখের সামনে শোষণের নলগুলো দেখতে পেল। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এ শোষণের পথ বন্ধ করতে হবে। সে জন্য দরকার সমিতি। (সূর্য : ৬১)

হাসিমের বোধ আরো শাণিত হয়ে ওঠে। সে কৃষক সমিতির সাহচর্যে নিজের অধিকার আদায়ের পথ খুঁজে পেয়েছে। হাসিম তো শ্রমিক, হাসিম বুঝতে পারে তার শ্রম চুরি করা হয়েছে, তার অধিকার চুরি করা হয়েছে। এতক্ষণে সে ধরতে পেরেছে অধরবাবু, কানা আফজল আর খলুদের সঙ্গে তার তো মানুষদের তফাতটা কোথায়। এতদিন হাসিম কেবল নিজের দুঃখকে বড় করে দেখেছিল। এখন হাসিমের উপলব্ধির জগৎ খুলে যায়। হাসিম বুঝতে পারে কেবল সে একা নয়, তার মতো অগণিত মানুষ আছে, যারা নিপীড়িত-নির্যাতিত; তাদের জন্য এবার হাসিমের কাজ করতে হবে।

গ. আলোকবর্তিকা হাতে একদল মানুষ

কলেরা রোগে মরছে গ্রামের পর গ্রাম। প্রাচীন কুসংস্কারে বিশ্বাস থাকায় গ্রামীণ সমাজের অন্ধ মানুষেরা কলেরা রোগকে অভিশাপ মনে করে। কোনো না কোনো বাড়িতে প্রতিদিনই লাশ উদ্ধারের ঘটনা ঘটছে। এগিয়ে আসে কৃষক সমিতি। জাত-পাত বিভেদ ভুলে তারা নিরলসভাবে আর্তমানবতার সেবায় নিজেদের নিয়োগ করেন।

আহমদ ছফা আর্তমানবতার এমন সেবার বিবরণ দিয়েছেন এভাবে : দলাদলা মানুষ মরছে। মাটি দিতে হচ্ছে, পোড়াতে হচ্ছে। জাত বিচারের সময় নেই। জাত বিচার করলে যে মৃতের সৎকার হয় না। এ পর্যন্ত ছেলে-বুড়ো- জোয়ান সব মিলিয়ে মরেছে একশো পঁচিশ জন। মনির আহমদে শহওে গিয়ে ওপরে দরখাস্ত করে ডাক্তার আনিয়েছে, পুকুরের পানিতে ওষুধ ছড়িয়ে দিয়েছে।

মরছে মানুষ তবুও তারা এক ঐশ্বরিক করুণায় চেয়ে থাকে ধর্মনির্ভর গ্রামবাসী-এলাকাবাসী। একদল মানুষ আলোকবর্তিকা হাতে এগিয়ে এলেও মূর্খ মানুষেরা তাদের চিনতে পারেনি। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি কিংবা চিকিৎসাসেবার নানা পদ্ধতি আবিষ্কার হলে এ সব মানুষ তাদেও কুসংস্কারের পুরনো রীতি আঁকড়ে জীবনযাপন করতে চায়। এভাবে জীর্ণ জীবনযাপন তারা বয়ে নিতে চায় যেন অনাদিকাল।

> গ্রামের মানুষ টিকা নিতে চায় না। তাতে নাকি ঈমান চলে যায়। এ কথা শুক্কুরবারের জামাতে ফয়েজ মস্তান মুসল্লিদের বলে দিয়েছে। কাজীপাড়া এবং ফকিরপাড়ার সকলে একযোগে ফয়েজ মস্তান জহির মৌলবিকে নিয়োগ করেছে। ছাগল জবাই করে শিরনি দিয়েছে। কোরআনের আয়াত পড়ে পাড়া বন্ধ করে দিয়েছে। মাটির সরায় সুরা লিখে গাছে গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছে যাতে ওলাওঠা পাড়ায় ত্রিসীমায় ঘেঁষতে না পারে। দিনেরাতে শোনা যায় আজানের ধ্বনি। জীবনে যারা নামাজ পড়েনি ওলাউঠার ডরে তাদের মাথায়ও টুপি উঠেছে। রাতের বেলায় ফয়েজ মস্তান আর জহির মৌলবি জেগে থেকে সমস্ত পাড়াময় ঘুরে বেড়ায়। (সূর্য : ৬৩)

কেবল প্রথাগত ধর্মীয় রীতিতে এদের বিশ্বাস না, এরা পীরবাদেও বিশ্বাসী। ঔপন্যাসিক তার উপন্যাসে ধর্মীয় বিভিন্ন বিশ্বাসের শাখা-প্রশাখাকে উপস্থাপন করেছেন ঘটনা বর্ণনায় :

> মাইজভাণ্ডারের কোনো কামেল পীর নাকি স্বপ্নে দেখেছে দুনিয়ার মানুষের গুনাতে দুনিয়া ভরে গেছে। সে জন্য আল্লাহ বান্দার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে কলেরা, হাম, বসন্ত প্রভৃতি সাতবোন পাঠিয়ে গজব নাজিল করেছে। ওরা সুন্দরী মেয়েলোকের বেশ ধরে দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। যে-পাড়ায় আল্লাহর কালামের কোনো নিষেধের গণ্ডি থাকবে না, ভেতর দিয়ে হুড়হুড় করে ঢুকে পড়বে। হেটে গেলেই শুরু হবে রোগ। তারপর মৃত্যু...কান্নাকাটি ইত্যাদি। এরই নাম আসমানি মুসিবত। (সূর্য : ৬৩)

ধর্মের নাম ভাঙিয়ে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকামী ভণ্ড মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় উপন্যাসে। ওলাউঠা রোগে মানুষ মরছে, চারদিকে বিপদ আর এ সময় জহির মৌলবির মতো মানুষ নিজের প্রচার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নিজেকে কামেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানুষের কাছে মুখরোচক গল্প করে বেড়ায় :

> এই আসমানি মুসিবতেরও আসাসি আছে আল্লাহর কালামে। একবার জহির মৌলবি নাকি জোয়ারা গ্রামে রাতের অন্ধকারে এক বোনের মাথার লম্বা চুল জারুল গাছের সঙ্গে পেঁচিয়ে বেঁধে খড়ম দিয়ে ছেঁচতে ছেঁচতে মুচলেকা আদায় করেছিল। আল্লাহর হুকুম নেই, নয়তো ধরে দিত। এ কথা জহির মৌলবি যত্রতত্র বলে বেড়ায়। আর সে জন্য কলেরার সময় জহির মৌলবির এত দাম। (সূর্য : ৬৩)

গ্রামের সবাই বিশ্বাস করলেও হাসিম এসব বিশ্বাস করে না। হাসিম নিজের অন্ধবিশ্বাসের চেতনা বিসর্জন দিয়ে সে এখন আলোর পথে, যুক্তির পথে আসতে শুরু করেছে। মানবমুক্তিকে ব্রত হিসেবে নেওয়ার পর থেকে খুলে দেখে হাসিমের চোখ। হাসিম তার পারিপার্শ্বিক জগতে কেবল অন্ধকারের তীব্র ঘনত্ব দেখতে পায়। হাসিম এই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পেয়েছে। হাসিমের মনোজগতে পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা ধরা পড়ে এভাবে :

একমাস আগে হাসিম এসবে মোটেও অবিশ্বাস করত না। কিন্তু আজকে তার কেবল হাসিই আছে। এরকম সুন্দও সুন্দর গল্প বানাতে পারে বলে মোল্লারা খেতে পায়। ওসব খিছু নয়, ভাঁওতা। মুরগির রান খাওয়ার আর মেহনতকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য এ সব মোল্লারা বানিয়েছে। (সূর্য : ৬৫)

ঘ. মাতৃত্বের জয়জয়কার

আহমদ ছফা সূর্য তুমি উপন্যাসে কেবল ধর্মীয়-সামাজিক অর্থনৈতিক শোষণকে বড় প্রধান বিষয় হিসেবে তুলে ধরেননি তিনি মাতৃত্বের জয়জয়কার দীপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন। ধর্মীয় ভেদবুদ্ধির নিগড় ছিন্ন কওে উকি দেয় মাতৃত্বের অঙ্কুরিত চারা। এই কারণে হাসিমের দাদি বৃদ্ধ শৈলবালার কাছে ধর্ম বড় নয়, তার কাছে সন্তানের প্রতি স্নেহ, হাসিমের পরিবারের প্রতি মায়া, দায়িত্ব পালন করা প্রভৃতি বড় হয়েছে। যে হাসিম ধর্মের শৃঙ্খলকে ভাঙতে পারেনি, শোষণের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেনি এতদিন হাসিমের দাদি সেখানে প্রতিবাদ করেছে। সে ধর্মীয় রীতিনীতি, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অনাস্থার দুঃসাহস দেখিয়ে মানুষের অচলায়তন ধর্মীয় বিশ্বাস আর গোড়ামির মর্মমূলে আঘাত হেনেছে।

সন্তান প্রসব করার সময় হাসিমের স্ত্রী সুফিয়া মারা গেলে বৃদ্ধা শৈলবালা হাসিমের পাশে এসে দাঁড়ায়। প্রথমে লোকলজ্জা আর সামাজিকতার ভয় থাকলে বৃদ্ধার মাতৃস্নেহ সেই ধর্মীয় সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গলি দেখিয়ে মনে করিয়ে ধর্ম নয়, মানুষের মধ্যে মানুষের আন্তঃসর্ম্পকই শ্রেষ্ঠ।

ছেলে হরিমোহন কাজী বাড়ির মেয়ের প্রেমে ধর্ম বিসর্জন দিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে বুড়ি শৈলবালার সঙ্গে সামাজিকভাবে বিচ্ছেদ ঘটে। হয়ত মায়ে-সন্তানের জন্য সেই বিচ্ছেদ হয়। এই বিচ্ছেদ ছিল সামাজিকভাবে, এই বিচ্ছেদের সীমানা দেয়াল এঁকে দিয়েছিল মানুষে মানুষে ধর্মের বিভেদ। হারাধনের মৃত্যুকালীন ঘটনা আবহ উপস্থিত হয়েছে বুড়ির মনোজগত :

> হাসিমের বুড়ো দাদি আপন গর্ভজাত ছেলের মরামুখ দেখতে পায়নি। যে-ছেলে মেয়েমানুষের মোহে পড়ে বাপ-পিতামহ চৌদ্দ পুরুষের ধর্ম ছেড়ে যেতে পারে, আপন ছেলে হলেও তার মুখ দেখা যে পাপ। পাপবোধের বিরাট বাধা জননীর অন্তরের প্রবল শোকাবেগের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল।...বুড়ি শৈলবালা বাড়ির পেছনের পুকুরের পশ্চিমপাড়ে গিয়ে দেখল তার কনিষ্ঠ সন্তান হীরাধরের নিষ্প্রাণ দেহ শাদা চাদরে ঢেকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে কবরখানার দিকে। তারা তার ছেলের দেহ মাটিচাপা দিল। তাজা কবরের দিকে চেয়ে বুড়ির মনে কী যে ব্যথা উথলে উঠেছিল সে খবর কেউ জানে না, কেউ না। (সূর্য: ৮৭)

যত দিন যায় ছেলে হারানোর ব্যথা বুড়ির বুকে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। মুসলমান হয়ে যাওয়া ছেলে হারানোর শোকে বুড়ির হৃদয় মুচড়ে পড়ে। বেদনায় ছেয়ে যায় সমস্ত অন্তর। কারো কাছে প্রকাশ করতে পারেনি। পারবে না কোনোদিন। কেউ সমবেদনা দেখায়নি, দেখাবে না। বরং হরিমোহনের মৃত্যু যেন সমাজের মানুষের কাছে ধর্মত্যাগের দণ্ডবিশেষ।

> বুড়ির মনেও দেবতার ভয় কম নয়। কিন্তু মনের কতটুকু তার নিজের এখতিয়ারে। সমুদ্রের মতো গভীর তলদেশ থেকে নোনা ঢেউ উঠে ছেয়ে যায় মন। দেবতা, স্বর্গ, ধর্ম সবকিছুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অবেচতন মন। কখন যে হরিমোহনের ধর্মান্তরকে নিজের অজান্তে মাফ করে দেয়- নিজেও বলতে পারে না। মনে মনে হরিমোহনের পক্ষ সমর্থন করে অদৃশ্য দেবতাদের সঙ্গে লড়তে লেগে যায়। (সূর্য : ৮৮)

ছেলে হরিমোহনের মৃতদেহ দেখতে পারেনি তাই বলে হাসিমের স্ত্রীর মৃতদেহ একবার হলেও চোখে দেখতে পারবে না তিনি? কোনো আগাপিছু না ভেবে বুড়ি সুফিয়াকে দেখতে যায়। জোহরা যখন সুফিয়ার নবজাত ছেলেকে বুড়ির কোলে তুলে দেয়। বুড়ি তখন স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ে। বুড়ি আঁচলের খুঁটে দুচোখ মুখ মুছে নবজাতকের দিকে তাকায়। বুড়ি নবজাতকের মুখের আদলে ছেলে হরিমোহনের প্রতিছাপ খুঁজে পায়।

বুড়ির দৃষ্টিকোণ থেকে ঔপন্যাসিক উল্লেখ করেন :

সেই চোখ, সেই মুখ, সেই নাক অবিকল তেমনি। হরিমোহন যেন আবার শিশু হয়ে ফিরে এসেছে। বুড়ি চেয়ে থাকে। চেয়ে চেয়ে আশা মেটে না। এ কি হরিমোহন নয়? তার কনিষ্ঠ ছেলে হরিমোহন কী আবার ফিরে এলো?... বুড়ির মনে হচ্ছে হরিমোহন যেন বলছে, 'মা হিন্দু হই, মুসলমান হই আমি তো তোরই সন্তান, কোলে তুলে নে।' শিশু কাদছে ওয়াঁ ওঁয়া। কিছুতেই কান্না থামে না।

বুড়ি একটা দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলে তিনি হাসিমের ঘরে এসে ফিরে যাননি। এ নিয়ে হিন্দু-মুসলমান পাড়ায় নানা কথা হলেও বুড়ি তাতে কর্ণপাত করেনি। হাসিমের নবজাতক ছেলেকে দেখে বুড়ি ফিওে যেতে চায় সোনালি এক অতীতে। হাসিম কে ডেকে বুড়ি বলে :

> 'অ সোনা নজর মেলি চা। একেবারে তোর বাপের নাহান। তোর বাপও কাইনতো। ভালা গরি চা, হেই মুখ, হেই কান, হেই নাক।' (সোনা, একবারে তোর বাপের মতন। তোর বাবাও এমনি করে কাঁদত। ভালো করে দেখ। সেই চোখ, সেই মুখ, সেই নাক, সেই কান।) সূর্য : ৯৫)

হাসিমের ছেলেকে কাছে পেয়ে জোহরার ভেতরের মাতৃরূপ সজাগ হয়ে ওঠে। মাতৃরূপ প্রবল বলেই তো পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের চাপ থাকার পরও জোহরা সন্তানকে গর্ভপাত করেনি। খলু মাতব্বর জোহরার মাতৃত্বের কাছে পরাজিত হয়। এবার হাসিমের ছেলেকে দেখে জোহরা মাতৃত্বেও স্বরূপ উন্মোচন করে। জোহরা হাসিমের ছেলের মুখ নিজের স্তনে লাগিয়ে দেয়।

হাসিমের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ পেয়েছে জোহরার মাতৃরূপ। সেইসঙ্গে হাসিম অনুভব করে জোহরার প্রতি এক ধরনের সম্পর্কেও প্রয়োজনীয়তা।

> হাসিম সন্ধ্যাবেলা বাজার থেকে ফিলে এসে দেখে ভেতরে জোহরা। কোলে শিশু। ব্লাউজের বোতাম খুলে স্তনের বোটাটি শিশুর মুখে পুড়ে দিচ্ছে। আপনাআপনি হাসিমের পথচলা থেমে যায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। ডান স্তন টেনে নিয়ে বাম স্তন মুখে পুরে দেয়। আশ্চর্য দুটি স্তন জোহরার। বাতির আলোকে দেখা যায় ঈষৎ রক্তিম, শিরাল, শেষ রেখাটি পর্যন্ত ভরে উঠেছে মাংসে। কালো জামের মতো কালো দুটি কলি। হঠাৎ হাসিমের বুকের রক্তধারা নেচে ওঠে। (সূর্য : ১০০)

ঙ. নতুন যাত্রা

যে কৃষক সমিতির সদস্যরা কোম্পানির জবরদখলের প্রতিবাদে জনমত গড়ে তোলে, গ্রামের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলেই তারা একসময় ষড়যন্ত্রের স্বীকার হয়। কৃষক সমিতির সদস্যরা ওপরে দরখাস্ত পাঠিয়েছে। পত্রিকার কাগজে লেখালেখি করেছে কীসব। কোম্পানির সার্ভেয়ার জমি পরিমাপ করতে এলে সংঘবদ্ধ কৃষকশক্তি কোম্পানির লোকগুলোকে তাড়িয়ে দেয়। কোম্পানি আইনের আশ্রয় নেয়। কৃষক সমিতির সদস্য, গ্রামের প্রতিবাদী বেশ কয়েকজন কৃষকের বিরুদ্ধে মামলা ঢুকে দেয় কোম্পানি। কানা আফজল, অধরবাবু জাহেদ বকসু এরা কোম্পানির পক্ষের সাক্ষী হয়। পুরের দিন পুলিশ এসে মনির আহমদ, হিমাংশুবাবু আর মান্নাকেসহ কয়েকজনকে পুলিশ পিঠমোড়া করে বেঁধে থানায় চালান দিল।

উপন্যাসে উল্লেখ আছে :

> অন্যান্য আসামিরা আগে খবর পেয়ে পালিয়েছে। তাদের ধরার জন্য পুলিশ আস্তানা গাড়ল। বরগুইনিপাড়ার একশটি ঘরে একজন পুরুষমানুষও নেই। যারা আসামি নয়, তারাও ভয়ে দূরের আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে চলে গেছে। পুলিশ চৌকিদার সারা গাঁয়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। এর মুরগি ওর খাসি জবাই করে দুবেলা ভক্ষণ করছে। (সূর্য : ৯৯)

সমিতির নেতাদের গ্রেফতারের খবর জানতে পেরে হতাশ হয় হাসিম। হাসিমের দৃষ্টিকোণ থেকে উঠে এসেছে হাসিমের মনের ভেতরের তোলপাড়ের বাস্তবতা :

> হঠাৎ হাসিমের মনে হলো মটমট করে তার অনেক পাঁজর একসঙ্গে ভেঙে গেছে। সে যেন আর সোজা হয়ে হাঁটতে পারছে না। পৃথিবীটা তার জন্য মিথ্যা হয়ে গেল। হাসিমের মতো সমাজহারা পরিচয়হারা একজন মানুষকে সমিতির কর্মীরা ভাই বলে গ্রহণ করেছিল। তারা জেলে গেল। হাসিম এখন কার কাছে যাবে? (সূর্য : ১০০)

এদিকে বৃদ্ধ দাদিকে নিয়ে গেছে অধরবাবু। কথা শুনে হাসিম বসে পড়ে। দু হাতে মাথাটা চেপে ধরে। সুফিয়া মারা গেছে। মনির আহমদ, হিমাংশুবাবু, মান্নান জেলে চলে গেছে। স্নেহ-মমতার ভিত্তিতে হাসিমের যে একখানা জগৎ গড়ে উঠেছিল সে আবেগের মূল্য পেতে সবকিছু যেন চোখের সামনে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। সমিতির সদস্যদের জামিন চেষ্টা করেও ব্যর্থতা এসেছে। হাসিমের সহযোদ্ধা কেরামত জানান, এই তো অত্যাচারের সবেমাত্র শুরু। জালেমরা বনের বাঘের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে, আর মজলুমেরা সকলে একজোট হয়ে যতদিন না রুখে দাঁড়াচ্ছে কোনো প্রতিকার নেই। মনির আহমেদ হিমাংশুবাবু তো শুধু নয়, এমনি হাজার হাজার মানুষ বিনা অপরাধে জেল খাটছে।

এমন অবস্থায় হাসিম কী করবে। হাসিম তো স্বীকার করেই নিয়েছে তার পাঁজর যেন ভেঙে গেছে, উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। হাসিম পালিয়ে যেতে চায়। এই পালিয়ে যাওয়া একা নয়, জোহরাকে নিয়ে যেতে চায়। রাতের অন্ধকারে জোহরা আত্মহননের পথ বেছে নিতে চাইলে বাধা হয়ে দাঁড়ায় হাসিম। কথা হয় সোমবার তারা পাড়ি দেবে। হাসিম কালুরঘাটের মিলে কাজ করবে।

হাসিমের প্রস্তাবে রাজি হয়। লেখকের বর্ণনা : 'অল্প জোসনায় তাকে রহস্যময়ীর মতো লাগে। জোছনার তন্তুতে গড়া যেন সমস্ত শরীর। শাড়ির কাধের থেকে এলিয়ে পড়েছে। আধখোলা ব্লাউজের ফাঁকে এক ফালি জোসনা এসে লেগেছে। বাম স্তনের অর্ধাংশ চকচক করছে। হাসিম দুহাতে জোহরাকে জড়িয়ে ধরে। জোহরা গভীর আশ্রয়ের নিশ্চিত খুঁটিটিকে আঁকড়ে থাকে। অনেকক্ষণ, অনেক্ষণ।'

সোমবার সূর্য ওঠার অনেক আগেই রওয়ানা দেয় দুজন। হাসিম আর জোহরা সামনের পথে পা ফেলাচ্ছে আর অতীত হয়ে আসছে বরগুইনি পাড়া। স্মৃতিপটে খণ্ডাংশ স্মৃতি হাসিমকে কাতর করে তোলে :

‘হে বাপ, ঘুমিয়ে থাকো, হে মা ঘুমিয়ে থাকো, প্রিয়তমা সুফিয়া, তুমি একটিবার পাশ ফেরো ঘুমের ঘোরে; বিদায় তোমাদের বিদায়। কুয়াশা-ঢাকা সবুজ মাঠ, তোমাকে বিদায়। কাজী বাড়ির দাসত্ব তোমাদের বিদায়। বাপের মা দাদি তোমাকেও বিদায়।’ (সূর্য : ১০৫)

একসময় তারা ট্রেন স্টেশনে এসে পৌছায়। কিছুক্ষণ পর ট্রেন চলতে আরম্ভ করে। জানালা দিয়ে পূবদিকে তাকায়। রাঙিয়ে যাচ্ছে পূবদিক। রাঙিয়ে যাচ্ছে হাসিমের সমস্ত চেতনা। শেষ পর্যন্ত নতুন দিনের নতুন একটি সূর্য চলে হাসিম-জোহরার সঙ্গে। সূর্যটাই তাদের চিরসাথী।

হাসিম এখন কৃষি সমাজ ছেড়ে কলকারখানার শ্রমিক হয়েছে। শহরে এসে তার পেশার বদল ঘটেছে। কিন্তু পেছনে যে বরগুইনি-সাতবাড়িয়া-গাছবাড়িয়া রেখে এসেছে, রেখে এসেছে অগণিত মানুষ তাদের ভাগ্যের কতটুকু পরিবর্তন হলো, ঘুণেধরা সমাজটির পরিবর্তন কতটুকু হলো? হাসিম তো সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিল, বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিল; কোথায় গেল সে বিপ্লব। হাসিম কি তাহলে পরাজিত এক সৈনিক। পালিয়ে আসায় ছিল কি তার একমাত্র নিয়তি!

কোনো কোনো সমালোচক হাসিমের নিরুদ্দেশ গন্তব্যে পাড়ি জমানোকে বাংলাদেশের নতুন গন্তব্যের ইঙ্গিত বলে মনে করেন। কিন্তু আমাদের মতে আপাতত একটি ব্যর্থ বিপ্লবের করুণ ইতিহাস রেখে গেল হাসিম। হয়ত ভেতরে তার পরিবর্তনের আকাঙক্ষা এখনো বিরাজমান। এই আকাঙক্ষার পথ ধরেই একদিন সমাজের কোনো না কোনো পরিবর্তন আবশ্যিক হয়ে ধরা পড়ে। সেই কাঙ্ক্ষিত বিপ্লবের জন্য হয়ত আরো কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে হাসিমের কিংবা বরগুইনিবাসীর কিংবা সমগ্র দেশবাসীকে।

তথ্যসূত্র

রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা ১৯৯৭

নূরুল আনোয়ার, *ছফামৃত*, খান ব্রাদাস অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১০

নাসির আলী মামুন, *আহমদ ছফার সময়*, শ্রাবণ প্রকাশনী, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০১৩

শামসুল আরেফিন, *আহমদ ছফার অন্দরমহল*, বলাকা প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ২০০৪

আহমদ ছফা, *বাঙালি মুসলমানের মন*, ঢাকা ২০০৬

মোমেনুর রসুল, *আহমদ ছফার উপন্যাসে সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ ৪৯, সংখ্যা : ১, ২০১১।

সলিমুল্লাহ খান, *আহমদ ছফার উপন্যাসসমগ্র*, ভূমিকা, মাওলা ব্রাদার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, ২০১২

চতুর্থ অধ্যায়

আহমদ ছফার উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সমাজ ও জীবন

আহমদ ছফার উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সমাজ ও জীবন

ক. জাগরণের দিনকাল (ওঙ্কার)

আহমদ ছফার মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে 'ওঙ্কার' 'অলাতচক্র' 'গাভী বৃত্তান্ত' 'একজন আলি কেনানের উত্থান-পতন' 'মরণ বিলাস' 'অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী' 'পৃষ্প বৃক্ষ ও বিহঙ্গ পুরান।'

ওঙ্কার উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত হলেও এর কাহিনিতে প্রকাশ পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী দুইবছর আগের উত্তাল ইতিহাস। জাতির বিক্ষুব্ধমুখর সময়ে বর্ণনা ও জাগরণের দিনকাল হয়ে উঠেছে 'ওঙ্কার' এর আখ্যানবস্তু। তা হলো ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ও তার বাস্তবতা। একটি পারিবারিক গণ্ডির সমান্তরালে ঔপন্যাসিক উত্তাল রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা করেছেন, সেই সঙ্গে বাঙালি জাতির আত্ম-পরিচয়উন্মুখ ব্যাকুলতাকে ব্যক্ত করা হয়েছে। বোবা বউয়ের আবেগ, বোবা বউয়ের বিদ্রোহের মাধ্যমে সে সময়ের বাংলাদেশ, সে সময়ে জাগরণপ্রবণ বাঙালি জাতির স্বরূপকে উন্মোচন করা হয়েছে উপন্যাসের পরতে পরতে।

উপন্যাসটি ১৯৭২ সালে লেখা, প্রকাশ ১৯৯৭ সালে। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত এ উপন্যাসে একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে বিশ শতকের পঞ্চাশ-ষাটের দশকের উন্মাতাল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাঙালি জাগরণের কথা আছে। কয়েকটি মাত্র প্রতীক চরিত্রের মাধ্যমে লেখক গণঅভ্যুত্থান, স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষাকে জীবন্ত করে তুলেছেন। (ফারহানা ২০১৪ : ২০)

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে 'ওঙ্কার' উপন্যাস রচনার আইডিয়া কীভাবে এলো তা আলোচনা করা যায়। উপন্যাসের কাহিনি সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত আছে।

হুমায়ূন আহমেদ লিখেছেন, আনিস সাবেতের বোনের বিয়ে হবে কুমিল্লায়। ছফা ভাইকে নিয়ে আমি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেলাম। রাত ৮টার মতো বাজে। আমি, আনিস এবং ছফা ভাই গল্প করছি। গল্পের বিষয়বস্তু সাহিত্য। আনিস সাবেত ছফা ভাইয়ের উপন্যাস 'সূর্য তুমি সাথী'র কোনো

একটি বিষয়ের সমালোচনা করে কী যেন বললেন। ছফা ভাই গেলেন রেগে। ছফা ভাই বললেন, আনিস, আপনি কথা উইথড্র করুন। উইথড্র না করলে আমি ঢাকা চলে যাব।

আনিস ভাই বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে ঢাকা যেতে পারবেন না। সন্ধ্যা ছ'টার পর কুমিল্লা থেকে ঢাকায় কোনো বাস যায় না।

আপনি কথা উইথড্র করবেন না।

না।

আমি ঢাকায় রওনা হলাম।

ছফা ভাই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং হাঁটা শুরু করলেন।

আনিস ভাই আমাকে বললেন, হুমায়ূন তুমি দুশ্চিন্তা করো না। ছফা ভাই যাবে কোথায়, বাস নেই কিচ্ছু নেই। ছফা ভাইয়ের হাতে টাকাও নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসবেন। তখন না হয় আমি কথা উইথড্র করব।

ছফা ভাই কিন্তু আর ফিরলেন না। সারারাত হাঁটলেন। পরদিন দুপুরের কিছু পরে হেঁটেই ঢাকায় পৌঁছলেন। তাঁর পা ফুলে গেল। গায়ে জ্বর এসে গেল।

এই ঘটনায় আনিস ভাইয়ের মন খারাপ হয়ে গেল। ছফা ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চাইতে গেলেন। ছফা ভাই বললেন, আমি আপনাকে আগেই ক্ষমা করেছি। আপনাকে আমার কিছু ধন্যবাদ দেওয়া দরকার। সারা রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে এসেছি তো, মাথার মধ্যে একটা উপন্যাসের আইডিয়া এসেছে। রাগ করে কুমিল্লা থেকে হেঁটে না এলে এই আইডিয়া আসত না। আনিস, আপনি আমার বিরাট উপকার করেছেন।

আমার যতদূর মনে আছে যে উপন্যাসের গল্প ছফা ভাইয়ের মাথায় এসেছিল তার নাম ওঙ্কার। (হুমায়ূন ২০০৩ : ৬২)

এখন প্রশ্ন হচ্ছে 'ওঙ্কার' কী? 'ওঙ্কার' উপন্যাস না অন্য কিছু? হুমায়ূন আহমেদ জানাচ্ছেন 'ওঙ্কার' একটি উপন্যাস। আহমদ ছফাও তা স্বীকার করেছেন। আবার কোনো কোনো সমালোচক 'ওঙ্কার'কে

উপন্যাসের কাতারে ফেলতে নারাজ। কেননা ওঙ্কারের বেলায় উপন্যাসের প্রচলিত সংজ্ঞা কাজে লাগে না।

লেখক কেন ওঙ্কারকে উপন্যাস বলছেন তা নিয়ে প্রশ্নও তুলেছেন সলিমুল্লাহ খান। তার ভাষ্যমতে : ওঙ্কার তাহার পহিলা নায়ক লেখা। এই লেখাটিকে তিনি কেন যে 'উপন্যাস' বলিয়াছেন তাহা আমার তেলাপোকা বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। উপন্যাস কী বস্তু তাহা এয়ুরোপের মনীষারাও একবাক্যে একমত হইয়া বলিতে পারেন নাই। তাঁহারা শুদ্ধ কবুল করিয়াছেন সকল গল্পই উপন্যাস নহে। উপন্যাস যদিও এক প্রকারের গল্প। অন্তত বটিলেও বটিতে পারে। জনৈক অভিধানবেত্তা উপন্যাসের সীমানার খুঁটি পুঁতিয়াছেন ৬০,০০০ বা ৭০,০০০ হইতে ২,০০,০০০ শব্দ বরাবর। তাহাদের মাপ কায়ার মাপ। উপন্যাস অতিকায় হস্তি না হইলে নিতান্ত মধ্যকার পদার্থ হইবে না। এই বিচারে আহমদ ছফার 'ওঙ্কার' পদার্থ হিসেবে ওঙ্কার হইতেছে না। (সলিমুল্লাহ ২০১৩ : ১৯৬-১৯৭)

ওঙ্কার সম্পর্কে সলিমুল্লাহ খান মত দিয়েছেন প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা রূপকথা। রূপকথা মানে পরের কথা, পরির কথা। ইংরেজিতে না বলিলে ভারমুক্ত হইতে পারিব না- ইংরেজিতে ইহাকেই বলিতেছি এলেগরি বা অপরের কাহিনী। আমার প্রস্তাব বাংলাদেশ রাষ্ট্র যেই জাতির নামে কায়েম হইয়াছে তাহার রূপকথা 'ওঙ্কার।' (খান ২০১৩ : ১৯৭-১৯৮)

উপন্যাস একটি কাহিনি এ কথা যে কেউ নির্দ্বিধায় স্বীকার করবেন। ওঙ্কারও একটি কাহিনি। মাত্র ২৩ পৃষ্ঠার কাহিনি হলেও এতে বিস্তৃতে সম্ভাব্য রাষ্ট্রের এক গভীরতর অসুখের কথা। যে অসুখের শুরু অনেক আগ থেকেই। অসুখের বিস্তারও পরবর্তীতে অনেক সময়ব্যাপী। ওঙ্কারে কাহিনিকার এই গভীরতর অসুখ থেকে মুক্তির আগামবার্তা দিয়েছেন বোবা বউয়ের মাধ্যমে। কাহিনির গভীরতা, সময়কাল, ইতিহাসের পূর্বাপর ইঙ্গিতের দিকে বিচার করলে সিদ্ধান্তে আসা যায় 'ওঙ্কার' একটি উপন্যাসই বটে। তবে তা স্বল্পকারের উপন্যাস, ছোট আকারের উপন্যাস যার বিস্তৃতি গভীর; সময়-রাজনীতি, সময়কে ধারণ করে উপন্যাসের বিস্তার ঘটেছে। তবে এই উপন্যাস প্রতীকধর্মী উপন্যাস। উপন্যাস আকৃতিতে না হলেও প্রকৃতিতে। কাহিনির বিস্তার এতে নেই, কিন্তু আছে প্রতীকের ব্যঞ্জনা ও বক্তব্যের গভীরগামিতা।

স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে লেখা এই আত্মজৈবনিক-ধরনের রচনাটিতে তিনি কয়েকটি প্রতীক চরিত্রের মাধ্যমে সমাজ-যুগ বিবর্তনকে ভাষা দিয়েছেন, সমকালীন জীবনের পটভূমিকায় রাজনৈতিক জাগরণের আল্লেখ্য ফুটিয়ে তুলেছেন। ঊনসত্তরের স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষাকে দিয়েছেন

প্রতীকরূপে। পারিবারিক কাহিনী হলেও নিছক পারিবারিক জীবনের ছবি এবং ভাঙা-গড়ার রূপ, দাম্পত্য জীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতি ফুটিয়ে তোলাই মূল লক্ষ্য নয়। প্রতীকের আশ্রয়ে বৃহত্তর ও গভীরতর ব্যঞ্জনা দিতে চেয়েছেন বলেই লেখক-সামাজিক রাজনৈতিক পটভূমি বিধৃত করেছেন অনেকটা পরোক্ষ রীতিতে। (মাহফুজ ২০০৩ : ৩৪১)

৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে বলা যায়- ১৯৯৬ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল সচেতন বাঙালি মুক্তি আকাঙ্ক্ষার সুতীব্র প্রকাশ। দ্বি-জাতিতত্ত্বের সমস্যার সমাধান সে সময় সম্ভব হয়নি। জনগণের মুক্তির পথ প্রসারিত হয়নি এমনকি সাম্প্রদায়িকতার অবসান হয়নি দীর্ঘকাল ধরে। পূর্ব বাংলার মানুষ সহজেই বুঝতে পেরেছিল যে বাঙালিরা সম্পূর্ণ একটি আলাদা জাতিসত্তা অন্তত অবাঙালি পাকিস্তানিদের কাছ থেকে। (সিরাজুল ১৯৯৭ : ১১-১২)

উপন্যাসের কথক শ্বশুরের দয়ায় নিজের ভাগ্য বদল করেছেন। তিনি গ্রাম থেকে উঠে এসে শহরের চাকচিক্যময় জীবনে প্রবেশ করেছেন। সবকিছুই হয়েছে বোবা মেয়েকে বিয়ে করার বদৌলতে। কথকের বাহ্যিক জীবনে বিলাসিতার অভাব নেই কিন্তু মনের দিক থেকে কথক রিক্ত, মনের ভেতর তার ভাঙনের ভয়। এই ভয় সংসার ভাঙনের, সমাজ ভাঙনের, জীবন ভাঙনের এমনকি রাষ্ট্র ভাঙনের। কথক ভয় এ কারণে যে, উত্তাল সময়ের প্রবাহ চলছে তার রেশ কথকের জীবনেও পড়বে। শ্বশুরের করুণায় ঢাকার বুকে যে বিলাসী জীবনে প্রবেশ করেছে রাষ্ট্রের ভাঙন তৈরি হলে বিলাসী জীবনের পতন অনিবার্য। কথক বুঝতে পারে সে দাঁড়িয়ে আছে ফাঁপা একটি ভিত্তির ওপর। প্রচলিত জীবনযাপনের মধ্যে কথক অবিচল আস্থা থাকলেও এ ভয় তাকে নাড়া দেয়। কিছুতেই সে ভয় থেকে মুক্ত হতে পারেনি। বোবা বউয়ের আচরণ কথকের এই ভয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, পাশাপাশি ঢাকার অলিগলিতে রাজপথে আন্দোলন আর মিছিলের উচ্চস্বর কথককে আরো ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে।

উপন্যাসের শুরু হয়েছে কথকের পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড উল্লেখ করে। কথকের বর্ণণামতে যে পরিবারের পরিচয় পাওয়া যায় তা ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম পরিবারের বর্ণনা। ধর্মীয় পরিমণ্ডলে পরিবারটির পদচারণা থাকলেও অন্যায়ে পরিবারটি কখনো পিছিয়ে ছিল না। ধর্মের আড়ালে অন্যায়ের এই প্রচার-প্রসার স্মরণ করিয়ে দেয় দ্বি-জাতিতত্ত্বের আড়ালে রাষ্ট্রীয় শোষণের বাস্তবতা।

উপন্যাসের কথকের পিতা একজন আভিজাত্যগর্বী, অহঙ্কারী ও প্রাচীনপন্থী ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। উত্তরাধিকার সূত্রেই তিনি অর্জন করেছিলেন সম্পত্তি। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনে শেষ তালুক হারিয়েও তিনি মামলা-মোকদ্দমা লড়ে যেতে পেছপা হন না। তিনি

বিরুদ্ধবাদী প্রজাদের দেখে নিতে চান। তার কূটকৌশলী আবুনসর মোক্তারের ষড়যন্ত্রে অবশেষে ভিটেমাটি হারিয়ে এক করুণ অবস্থায় মারা যান। মামলায় জিতে উঠতি বুর্জোয়া আবুনসর তার ভিটেমাটি নিলাম করিয়ে নেন। এই আবুনসর পশ্চিম পাকিস্তানের অনুগ্রহে বেড়ে ওঠা তৎকালীন বিত্তবান মুসলমান সমাজের মানুষের প্রতিনিধি। নিলামের হাত থেকে সম্পত্তি বাঁচাতে গিয়ে উপন্যাসের বিএ পাশ কথকের সঙ্গে বোবা মেয়েকে বিয়ে দিতে বাধ্য হন তালুক হারানো জমিদার। মোক্তারের জামাই হিসেবে সে পায় ভালো চাকরি, শহরে মেলে ঠাঁই। শ্বশুরের দখল করা ব্রাহ্মণের বাড়িটি হয় কথকের বাড়ি।

নিজ পরিবার সম্পর্কে কথক বলছেন, 'আমাদের কিছু জমিজমা ছিল। আমার বাবা নিজে করেননি। তিনি তার বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। সম্পত্তির সঙ্গে একখানা মেজাজও তাকে পূর্বপুরুষেরা দিয়ে গিয়েছিল। তাঁর তেজ তেমন ছিল না, তবে ঝাঁজটা ছিল খুব কড়া রকমের।'

> সময়টা বাবার জন্য যথেষ্ট ভালো ছিল না। শহর বন্দর অফিস আদালত কলেকারখানায় ব্যক্তির আত্মসত্তা গরিমায় নিজের শোণিত উষ্ণ রাখতে চেষ্টা করতেন। ঈষদুষ্ণ নয়, কিছুদিন রীতিমতো উষ্ণই রাখতে পেরেছিলেন। তার কারণ, বাবা পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে রক্তের মতো বিত্তও উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। সে জন্যে পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত বিত্তে আত্মশোণিতের হিমোগ্লোবিন কণা উজ্জ্বল রাখতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু হায়রে কবেই যে কেটে গেছে কালিদাসের কাল। (ওঙ্কার : ১০৯)

কেবল প্রবল তেজ নয় বংশপরম্পরায় পরহেজগার জীবনযাপন করেছে কথকের পরিবারে। শরীয়তের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন কথকের বাবা। 'চূড়ান্ত বিপদের দিনেও আল্লাহর ওপর ভরসা করে নির্বিকার থাকতে পারতেন।' কথক বলছে :

> অতি ছোট বয়সে তাকে হাতির দাঁতে খোদাই করা ব্যক্তিত্বের অনুপম স্তম্ভ মনে করতাম। এখন বুদ্ধি বিবেচনা পেকেছে। দুনিয়াদারির যাবতীয় বস্তু বিবসনা করে ভেতরের ব্যাপার জানার মতো দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে চেতনা। জনবের কাঠিন্যমণ্ডিত বয়েসী ছবিটি স্মরণে এলেই কেন বলতে পারব না, শরীরের আঁকেবাঁকে ঢেউ খেলে একটা ধ্বনি চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রাণময় হয়ে ওঠে। পশু-পবিত্র পশু। হ্যাঁ তিনি পবিত্র পশুই ছিলেন। আর তার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন যথার্থ পশু। (ওঙ্কার : ১১০)

কাহিনিকারের বাবা যে যথার্থ বা প্রকৃত পশু না হইয়া পবিত্র পশু হইলেন তাহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে। কারণ ধর্ম। (সলিমুল্লাহ ২০১৩ : ২১৫)

সমাজ পাল্টাছে ধীরে ধীরে, পাল্টাছে শাসন প্রণালী। পূর্বপুরুষের একটা তালুকের সাড়ে তিন আনা অংশের মালিক ছিলেন কথকের বাবা। 'যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে জমিদারি প্রথা উঠিয়ে নিল। পেছন পেছন তালুকদারি প্রথাও আপনা থেকেই উঠে গেল।' তালুকদারি হারালেন কথকের বাবা। তালুকদারি হারানোর সংবাদটি কথকের বাবার বুকে বজ্রশেলের মতো বাজে। এ ছাড়া রয়েছে মোকদ্দমার ঝামেলা। হাইকোর্টের মামলায় পরাজিত হলেন কথকের বাবা। পারিবারিক আইনজীবী আবুনসর মোক্তার সাহেব মামলার খরচ ডিক্রি পেলেন। মোক্তার সাহেব আদালতে জীর্ণ বাড়ি, হাজা পুকুর, জমা দিঘী সব নিজের নামে নিলাম করিয়ে নিয়েছেন। উপায় বাতলে দিলেন মোক্তার সাহেব। তিনি আশ্বাস দিলেন কোনোকিছুই হারাতে হবে না। ঘরবাড়ি সব আগের মতোই থাকবেন। কথকের বাবা বিলাতের ডাক্তারের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবার সুযোগ পাবেন। কিন্তু আবুনসর মোক্তার সাহেবের বোবা মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। শ্রাবণের এক সন্ধ্যায় কথকের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলো আবুনসর মোক্তার সাহেবের বোবা মেয়ের। বোবা মেয়েটি উপন্যাসে নামহীন। কথক জানাচ্ছে :

> আবুনসর মোক্তার সাহেব আমাকে শুধু মেয়ে দিলেন না। হতাশালাঞ্ছিত পূর্ব-পুরুষের অট্টালিকা থেকে টেনে আলো ঝলমল করা শহরে এনে বসালেন। রাজধানী শহরে আমার চাকরি হল। চাকরির সঙ্গে সঙ্গে আস্ত একখানা বাড়িও শ্বশুর সাজেব মোক্তারি বুদ্ধি খরচ করে জুটিয়ে দিলেন। আগে থাকত এক নিরীহ ব্রাহ্মণ। যে প্যাঁচে শ্বশুর সাহেব তার তাঁর বেয়াইকে অন্তত দশবছর আগে স্বর্গে পাঠিয়েছিলেন, একই প্যাচে নিরীহ ব্রাহ্মণকে গ্রাম এবং শহরের মূল থেকে উপড়ে তুলে নিয়ে সীমান্তের ওধারে ছুড়ে দিয়েছিলেন। (ওঙ্কার : ১১৭)

শ্বশুরের ক্ষমতার বদৌলতে ভাগ্যবদল হয়েছে কথকের। 'আইয়ুবশাহী শাসনের খুঁটি না হলেও আবুনসর মোক্তার মোক্তার সাহেব ঠেকনাজাতীয় কিছু।' সময় পরিবর্তনের সঙ্গে আইয়ুবশাহী শাসনের খুঁটি যখন নড়বড়ে অবস্থা। কথকের মনেও নিজের আভিজাত্য হারানোর ভয় কাজ করে।

> দেশে তড়িৎগতিতে সময় পালটাচ্ছিল। পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখের খবর সংবাদপত্রের পাতায় কালো ফুলের মতো ফুটে থাকে। দেশে আইয়ুব সাহেবের সৈন্য-সামন্ত নিয়ে গেড়ে বসেছেন। সংবাদপত্রের ব্যানারে খান সাহেবের এক জোড়া গোঁফ হুঙ্কার দিয়ে জেগে থাকে। দেখতে না দেখতেই দেশের জীবনপ্রবাহের মধ্যে খান সাহেবদের অপ্রতিহত প্রভাব প্রবল সামুদ্রিক তিমির মতো ছুটাছুটি করছিল। এই সুযোগে আমার শ্বশুরের মতো মানুষেরা অন্ধকার থেকে সূর্যালোকে ফাঁকি দিয়ে শহরের ফ্ল্যাশ ক্যামেরা সামনে উঠে আসতে লেগেছেন। আগেই তিনি মোক্তারি ছেড়ে দিয়েছিলেন। মরা গুরুর খালের নাহান আদালতের ময়লা বেঢপ শামলা গা থেকে গাছের পুরনো বাকলের মতো ঝরে পড়েছে সে

কবে। এখন তিনি আদ্দির গিলে করা ফিনফিনে পাঞ্জাবি পরেন। সোনার বোতাম ঝিলিক দেয়। হাতে হীরার আংটি ঝকমক করে। তিনি আইয়ুব রাজত্বের শক্ত একটা খুঁটি না হলেও ঠেবনা জাতীয় কিছু একটা তো বটেই। বসনে–ভূষণে অনেক সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠেছেন। এক ব্যক্তিত্ব না জানি কোত্থেকে উড়ে এসে শরীরে আশ্রয় করেছে। (ওঙ্কার : ১১৭)

কেবল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন আবুনসর মোক্তার সাহেবের মতো লোকেরা। পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে তারাও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে বিচরণ করতে থাকেন। সাধারণ আইনজীবী থেকে আবুনসর মোক্তার সাহেব এখন ক্ষমতাবান একজন রাজনীবিদ। কথক বলছে :

আমার শ্বশুরের চারদিকে জয়জয়কার। শালা-সম্বন্ধীরা ব্যবসায়ে রীতিমতো লাল হয়ে যেতে থাকল। লোকে বলাবলি করত আমার শ্বশুর ভাগ্যবান। নিজেকেও আমি কম ভাগ্যবান মনে করতাম না। এমন লোকের মেয়ে বিয়ে করেছি, সেকি চাট্টিখানি কথা। নাইবা রইল একখানা হাত কিংবা পা। শ্বশুরের সৌভাগ্যের ছিটেফোঁটা আমিও পেতে থাকলাম। (ওঙ্কার : ১১৭)

মোক্তারি বুদ্ধিতে ব্রাহ্মণের যে ঘর আবুনসর মোক্তার সাহেব দখল করেছেন জামাইয়ের জন্য সেটি নতুনভাবে বানিয়েছেন কথক। পুরনো ঘাট ঝালাই করেছেন। শ্বশুরসাহেব চাকরির ব্যবস্থা করেছেন, শহরের চাকচিক্যময় জীবনের মাঝে জামাইকে গায়ে মানানো পোশাকের মতো মানিয়ে চলার ব্যবস্থা করেছেন। যা কিছু করেছেন বোবা মেয়ের সুখের জন্য, জামাইয়ের সুখের জন্য। কিন্তু কোথাও যেন একদলা দুঃখ জমা রয়েছে কথকের :

বাড়িতে খাইদাই এবং ঘুমোই। নিয়মিত অফিসে যাই, অফিস থেকে আসি। দিন কেটে যাচ্ছে একরকম দিনের মতো। আনন্দে নেই-নিরানন্দ তাও নেই। বন্ধুরা সকলে তাদের বউয়ের গল্প করে। তাদের নিয়ে বাজারে যায়, সিনেমা দেখে, অবসর মূহূর্তগুলো মৌচাকের মধুর মতো কথাবার্তার রসে ভরিয়ে রাখে। কোনো কোনো বন্ধুর বাড়িতে যেয়ে তাদের বউদের সঙ্গে গল্প করেছি, গান শুনেছি। মনের মধ্যে একটা কাঁটার তীক্ষ্ণ দংশন অনুভব করেছি। আমার বুকের ভেতরে একটা দুঃখ পাশ ফিরে ঘুমিয়েছে। জীবনে কি সব পাওয়া যায়! সকলে কি সমান ভাগ্যবান! মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করতাম। কখনো প্রবোধ মানত, কখনো মানত না। বাতাসের মতো চঞ্চল মন। (ওঙ্কার : ১১৮)

আরো আছে :

> আগেই তো বলেছি ইচ্ছেশক্তি বলতে আমার কোনোকিছু নেই। তাই বলে আমি যে কিছু চাই না একথা সত্যি নয়। নানা জায়গায় আমার যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু চরণ সামনে চলতে রাজি হয় না। অনেক কিছু করার সাধ জাগে, কিন্তু অবশ হাত উঠতে চায় না। নানা আনন্দ বেদনার ধ্বনি আমার জিভের ডগায় পুঁটিমাছের মতো নাচলেও একটুকুর জন্য ঝরে পড়তে পারে না। এম নিষ্ক্রিয় পুরুষ মানুষ আমি। (ওঙ্কার : ১১৯)

আবুনসর মোক্তার সাহেবের জামাইয়ের চারিত্রিক ধরনকে সলিমুল্লাহ খান তুলনা করেছেন 'অপদার্থ বাঙালি মুসলমান সমাজের সঙ্গে। যারা অন্তরঙ্গ স্বাধীনতার দামে কিনেছে বাইরের স্বাধীনতা। কিন্তু অন্তরঙ্গ স্বাধীনতাকে ভুলে থাকতে পারে না।' বোবা বৌ কথা বলতে পারে না, সেই কষ্ট তাহাকেও মাঝে মাঝে পীড়া দেয়। বিশেষ যখন অন্য কারো বউয়ের গল্প হয়। অপদার্থ জামাইও কবুল করেন, মাঝে মাঝে তার মনে পাকা জুয়াড়ির মনোভাব জাগে।

> 'ইচ্ছা হয় শ্বশুর সাহেবের কাছে গিয়া বলি, আপনি যাহা দিয়াছেন-ঘরবাড়ি, চাকুরি-সবই লইয়া যান। বিনিময়ে কেবল আমাকে আপনার বোবা মেয়েরত্নটির দায় হইতে রক্ষা করুন। আমি সমগ্র জীবনের সমস্ত কিছুর বিনিময়ে এমন একজন মেয়ে মানুষকে কাছে পেতে চাই- যে কালো হোক, কুৎসিক হোক, না থাকুক তার গুণপনা, সে শুধু কথা বলবে, অনবরত কথা বলবে। তার মুখ থেখে নানারকমের শব্দমালা শরতের বিবাগী বাতাসে শিউলি ফুলের মতো ঝরে পড়বে। (ওঙ্কার : ১১৯)।

কিন্তু কথক তা পারেন না। কারণ এক অজানা ভয় তার পিছু পিছু তাড়িয়ে নিয়ে বেড়া। কথক বলছে :

> আমার এইদিকে বুকটা ঢিপঢিপ করে। কি জানি শ্বশুর সাহেব যদি ঠাহর করিয়া ফেলেন তাঁহার মেয়েটিকে অবহেলা করিয়াছি। চাকুরিখানা খাইয়া মেয়েটা ফিরাইয়া লইয়া যদি বলেন এখন বোনটির হাত ধরিয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাও, তখন কোথায়, কোন বৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইব। (ওঙ্কার : ১২০)

বোবা বউয়ের সঙ্গে ঘর করলেও সাংসারির জীবনে সুখি নন কাহিনির কথক। ব্যক্তিমনের কাছে কথক যেমন পরাজিত, তেমনি পরাজিত আবুনসর মোক্তার সাহেবের মতো মানুষের ক্ষমতার কাছে। একজন পরাজিত মানুষ কথক। বোবা বউয়ের সঙ্গে কথা না অপূর্ণতা শহুরে কথকের মনে জাগায় বেদনাবোধ :

> একটি সবাক সজাগ নারীর সঙ্গে কথা বলার কামনা বুকের তলায় রক্তবর্ণ বুদবুদের মতো জাগে আর ভাঙে। অফিস থেকে আসা-যাওয়ার পথে রিকশা, বাস, পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা পাকানো তরুণীদের দিকে বাক্যের ক্ষুধা নিয়ে হা করে দাঁড়িয়ে থাকি। নারীকণ্ঠনিঃসৃত কলকাকলি শোনার জন্য

সন্তর্পণে কানজোড়া পেতে রাখি। দমকা বাতাসে চারাগাছ যেমন কাঁপে তেমনি নারীর সুন্দর হাসির লহরি আমার বুকের স্তরে স্তরে কী আবেগেই না সমীরিত হয়। সে কথা কেমন করে বোঝাই। (ওঙ্কার : ১১৯)

অভ্যস্ত এ জীবনযাপন কথকের মিথ্যা মনে হয়। এই ফাঁপা জীবন, ফাঁকা জীবন ভালো লাগে না তার। একদলা বেদনা জমে থাকা জীবন থেকে কথক নিস্তার পেতে চাইছেন। কথক বলছেন :

আমার দরকার অন্যকিছুর। আমি মনের সাধ মিটিয়ে কথা বলতে চাই। তাজা উষ্ণ, রূপরাঙা, রসরাঙা কথা আমার মনের বৃন্তে বৃন্তে বসন্তের পল্লবের মতো মুকুলিত হয়। মুকুলিত হয় আর ঝরে যায়। সমস্ত হৃদয় মনের আকুতি দুখানি কালো চোখের তারায় থরো থরো নাচে। বিশাল কালো চোখে চোখ পড়ে কখনো বা মনটা আপনা থেকেই ধক করে কেঁপে যাই। (ওঙ্কার : ১২০)

একরকম ব্যর্থ জীবনযাপনের মধ্যে কথক দেখতে পায় বোবা বউয়ের ভেতরে একধরনের পরিবর্তনের ডালপালা উঁকিঝুঁকি মেলে অস্তিত্ব জানান দিতে চাইছে। কথকের বোনের গান প্র্যাকটিসের সঙ্গে তাল মেলাতে চায় বোবা বউয়ের অকেজো কণ্ঠ। অকেজো বাকযন্ত্রেও বৃথা প্রয়াসকে কথক বর্ণনা করেছেন এভাবে :

আমার বোন তার থাকার ঘরটিতে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গানের প্র্যাকটিস করছে। গলার স্বর উঁচু পরদা থেকে নিচু পরদায় নামছে। নিচু থেকে উঁচুতে চড়ছে। স্বরতরঙ্গের এই লাস্যময় উত্তরণ অবতরণধারায় প্রাণের যে মাধুরী রক্ত-সন্ধেয় ব্যক্ত হচ্ছে তা ঘরের বাতাস পর্যন্ত মধুময় করে তুলেছে। আমার বোন নিজের মনে গান-বাজনা করছে। আর আমার বোবা স্ত্রী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। তার গলা দিয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ নামছে। বাতির আলোতে একফালি কপাল দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয়বার চাঁদের মতো সুন্দর। চোখ থেকে ফোটায় ফোটায় জল গড়িয়ে পড়ছে। সারা শরীর থরথর কাঁপছে। (ওঙ্কার : ১২২)

কথকের বোবা বউয়ের আচরণে পরিবর্তনের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক পাঠককে উপন্যাসের মূল বিষয়ের দিকে নিয়ে গেলেন। বোবা বউ কথা বলতে চাইছে, তার শরীর আলোড়ন তুলছে, সে কিছু বলতে চায়। বোবা বউ এই বাংলাদেশের প্রতীক। দীর্ঘদিনের পাকিস্তানি শাসনের নাগপাশ থেকে বের হওয়ার চেষ্টা বাংলাদেশের। বোবা বউয়ের কথা বলার চেষ্টার মাধ্যমে বাঙালি জাগরণের ইঙ্গিত পাওয়া গেল। যে বাঙালি জাতি নতুন একটি দেশ চায়, নতুন একটি সমাজ চায়। এ জন্য অধিকার আদায় দরকার; যেমন করে কথা বলার অধিকার চায় বোবা বউ।

আমার বোন গান গাইছে আর বোবা স্ত্রী সকলের অলক্ষ্যে প্রাণপণ প্রচেষ্টায় বোনের সুরেলা কণ্ঠের সঙ্গে নিজের নির্বাক কণ্ঠটি মেলাবার চেষ্টা করছে। চমৎকার অনুসরণ প্রক্রিয়া। কিছু পারছে না। সে তো

বোবা। তার বাকযন্ত্রটি কাজ করছে না। কিন্তু শরীরে অনুপরমাণু এই অক্ষমতা মেনে নিতে রাজি নয়। তাতে করে হিস্টিরিয়া রোগীর মতো খিল ধরেছে। সমস্ত শরীর থেকে প্রচণ্ড প্রয়াস স্ফুরিত হচ্ছে তারই তোড়ে গলা দিয়ে গোল গোল নুড়িপাথরের খণ্ডখণ্ড শব্দাংশ ঝরে পড়েছে। সেটা ভাষা নয়। গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার পূর্বে যে ধরনের আওয়াজ দেয় তেমনি ধরনের একটা কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যায়। (ওঙ্কার : ১২২)

আহমদ ছফা এই রাজনৈতিক সমান্তরালে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের যে ছবি চিত্রিত করেছেন তাতে দেখা যায়, আইয়ুব শাসনামলে সুস্পষ্ট দুই শ্রেণী বিদ্যমাণ-সুবিধাভোগী ও দেশপ্রেমী। একটি পরিবারের ভেতরে রয়েছে এই সুস্পষ্ট বিভাজন- উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বোবা মেয়েটির বাবা আইয়ুব খানের অনুসারী, স্বামী দেশের অবস্থায় রিক্ত। কিন্তু বোবা মেয়েটিকেই কেবল দেশের জন-মানুষের চৈতন্যের প্রতিরোধের সক্রিয় আবেশ স্পর্শ করেছিল। (ফারহানা ২০১৪ : ২০৯)

কথকের বোবা স্ত্রী এখানে নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। এতদিন যে জাতি মুখ বুঝে শাসন সহ্য করে গেছে সেই জাতি বিদ্রোহ প্রকাশ করছে। এর স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে বোবা বউয়ের মাধ্যমে।

সেদিন থেকে স্ত্রীর প্রতি আমার মনোভাব সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। বুঝতে বাকি থাকল না, তার মনের ভেতর কথা বলার আকাঙ্ক্ষা কী রকম জলপ্রপাতের ধারার মতো ফুলে ফুলে উঠছে। তার কণ্ঠও সুন্দর ধ্বনির প্রসূতি হতে তীক্ষ্ণভাবে আগ্রহী। একজন মানুষ কথা বলতে পারে না, এটা কত দুঃখের!

যেটা আমাকে সবচে বেশি নাড়া দিয়েছে আমার স্ত্রী বাকশক্তিহীন দশাটিকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়নি। তার শরীরের প্রতিটি কণা, প্রতিটি অনুপরমাণু এই বোবাত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিক্ষোভে ফেটে পড়তে চায়। আমি নিজের চোখে তো দেখলাম। তারও মনের গভীরে ফুলের স্তবকের মতো কথা স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। তার মনের ভেতর সুখ-দুঃখের আঁকড়ে যা ঘটছে এবং বাইরের পৃথিবীতে সুন্দর কুৎসিত যা বিরাজমান রয়েছে, প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হচ্ছে-সবকিছুরই একটি নাম আছে। এই নামটিকেই সে প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু পারে না। বাকযন্ত্রটি খারাপ এবং অকেজো বলে। (ওঙ্কার : ১২২)

ভারতীয় পুরাণ মতে, ওঙ্কার হলো হলো আদ্যধ্বনি-সকল ধ্বনির মূল। বাহ্য জগে সেই ধ্বনি শ্রুত হোক বা না হোক; চেতনে ও মননে তা সর্বদা বিরাজ করে। বোবা মেয়েটিও কথা বলতে পারে না কিন্তু সময়ের প্রবাহে যে মুক্তিস্পৃহা তার প্রভাব পড়ে মেয়েটির মনের গহিনে- এ যেন পশ্চিম পাকিস্তানিদের শাসনে বিরুদ্ধে অবরুদ্ধ বাঙালিদের প্রতিবাদ।

মিছিলটা একেবারে আমাদের বাড়ির সামনে এসে পড়েছে। গোটা বাংলাদেশের-শিরায়-উপশিরায় এর প্রসব বেদনা ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষের বুক ফাটা চিৎকারে ধ্বনিত হচ্ছে নবজন্মের আকুতি। আমার বুকের তরঙ্গ ভাঙছে। কেঁপে কেঁপে উঠছি আমি। চারপাশের সবকিছু প্রবল প্রাণাবেগে থরথর কাঁপছে। বাংলাদেশের আকাশ কাঁপছে, বাতাস কাঁপছে, নদী সমুদ্র পর্বত কাঁপছে। নর নারীর হৃদয় কাঁপছে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। আচানক বোবা বউ জানালা সমান লাঠিয়ে 'বাঙলা' অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করল। তার মুখ দিয়ে গলগল রক্ত বেরিয়ে আসে। (ওঙ্কার : ১৩০)

ওঙ্কার উপন্যাসে আহমদ ছফা ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ইতিহাসের আলোকে আগরতলা মামলা সম্পর্কে বলা যায়-আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের দায়ের করা একটি রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ আসামির বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করেছিল। (সেলিনা ও নুরুল ২০০৩ : ১৭২)

১৯৬৮ সালের প্রথম ভাগে দায়ের করা এই মামলায় অভিযোগ করা হয় যে, শেখ মুজিব ও অন্যান্যরা ভারতের সাথে মিলে পাকিস্তানের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। মামলা নিষ্পত্তির চার যুগ পর মামলার আসামি ক্যাপ্টেন এ. শওকত আলী ২০১১ সালে প্রকাশিত একটি স্বরচিত গ্রন্থে এ মামলাকে সত্য মামলা' বলে দাবি করেন।

৬ জানুয়ারি ১৯৬৮ সালে ২ জন সিএসপি অফিসারসহ ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের গ্রেফতার সম্পর্কে সরকারি প্রেস নোটে উল্লেখ করা হয়, 'গত মাসে (ডিসেম্বর ১৯৬৭) পূর্ব পাকিস্তানে উদঘাটিত জাতীয় স্বার্থবিরোধী এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে এদের গ্রেফতার করা হয়েছে।'

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্য আসামিদের গ্রেফতার করা হলেও প্রথমে আসামিদের দেশরক্ষা আইনে মুক্তি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে আর্মি, নেভি অ্যান্ড এয়ারফোর্স অ্যাক্টে শেখ মুজিবুর রহমান, সার্জেন্ট জহুরুল হকসহ অন্যান্য আসামিকে পুনরায় গ্রেফতার করে সেন্ট্রাল জেল তেকে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন মামলাটির শুনানি কার্যক্রম শুরু জয় (সেলিনা ও নূরুল ২০০৩ : ১৭২) মামলাটির শেষ তারিখ ছিল ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সাল।

আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি কর্নেল শওকত আলী লিখেছেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আমরা যাঁরা মামলাটিতে অভিযুক্ত ছিলাম, 'ষড়যন্ত্র' শব্দটি তাঁদের জন্য খুবই পীড়াদায়ক। কারণ আমরা ষড়যন্ত্রকারী ছিলাম না। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে

স্বাধীন করার লক্ষ্যে আমরা বঙ্গবন্ধুর সম্মতি নিয়ে একটি বিপ্লবী সংস্থা গঠন করেছিলাম। আমাদের পরিকল্পনা ছিল একটি নির্দিষ্ট রাতে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে আমরা বাঙালিরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সবকটি ক্যান্টনমেন্টে কমান্ডো স্টাইলে হামলা চালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অস্ত্র কেড়ে নেব, তাদের বন্দি করব এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করব।' (শওকত : ২০১১)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে সাধারণ জনতা। দেশের পরিস্থিতি পাল্টানো শুরু করেছে। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে বাঙালি জনতা। অন্যায়ের দুর্বার প্রতিরোধ করে সম্ভাব্য স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেতনা বাঙালি মন-মানসে জেঁকে বসেছে। উত্তাল রাজনৈতিক এ চিত্রের বর্ণনা পাওয়া যায় 'ওঙ্কার' উপন্যাসে।

> দেশের পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল। যেখানে দেশের গভীর ব্যথা, মার্শাল সাহেবের গোমড়ামুখো সৈন্যরা সেখানেই কাটা বসানো বুটজুতোর লাথি মারে। প্রথম প্রথম গোটা দেশ আঘাতের ব্যথায় গুঙিয়ে উঠত। ক্ষত থেকে রক্ত বের হতো। আওয়াজে যন্ত্রণা ফুটে থাকত। প্রায় এক যুগ ধরে লাথি খেয়ে ব্যথাজর্জর অংশ ডাঁটো হয়ে উঠেছে। এখন প্রতিবাদ করার জন্য মুখিয়ে উঠেছে। যন্ত্রণা বেদনা এবং দুঃখের কারখানা থেকেই প্রতিরোধের শানানো আওয়াজ ফেটে পড়েছে। তার ধার যেমন তীক্ষ্ণ, তারও তেমনি প্রচণ্ড। সারাদেশের স্লোগানোর ঢল নেমেছে। পথেঘাটে মানুষ-কেবল মানুষ। চন্দ্রকোটালের জোয়ারের জলের মতো বইছে মানুষ। বাংলাদেশের রাস্তাগুলো নদী হয়ে গেছে। তাদেও চোখে আগুন, বুকে জ্বালা, কণ্ঠে আওয়াজ, হাতে লাঠি। রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুরে স্লোগানের ধ্বনি বাংলাদেশের আকাশমণ্ডলের কোটি কোটি বর্শাফলার মতো ঝিকিমিকি খেলা করে। (ওঙ্কার : ১২৫)

কথকের বয়ানে ঔপন্যাসিক লিখেছেন :

> শেখ মুজিব জেলে। আগরতলা মামলার বিচার চলছে। এখানে ওখানে বোমা ফুটছে, মিটিং চলছে। ঝাঁকে ঝাঁকে মিছিল বেরিয়ে আসে। গুলি চলে। লাল তাজা খুনে শহরের রাজপথ রঞ্জিত হয়। সরকারি পত্রিকার অফিসগুলোতে হুতাশনের মতো প্রলয়কারী অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে। প্রতিটি সকালেই খবরের কাগজের পাতা উলটোলেই টের পাওয়া যায় ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। গতিকটি সুবিধের নয় মনে হলো। আইয়ুবখানের সিংহাসন ঝড়ে পাওয়া নায়ের মতো টলছে। (ওঙ্কার : ১২৬)

আগরতলা মামলায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সাধারণ জনতা। প্রবল গণআন্দোলনের তথা উত্তাল ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের মুখে আইয়ুব খানের সরকার পিছু হটতে শুরু করে এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে

তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবুর রহমান-সহ অন্যান্যদের মুক্তির দাবি করেছিল। ফলশ্রুতিতে, সরকার প্রধান হিসেবে আইয়ুব খান সমগ্র পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে গোলটেবিল আয়োজন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। (সেলিনা ও নূরুল ২০০৩ : ১৭২)

রাজনৈতিক ঘটনাবলির ধারাবাহিকতায় আসে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান। বাংলাদেশের সচেতন ও সংগ্রামী ছাত্রসমাজ তাদের ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে ১৯৬৯ সালের ১৭ জানুয়ারি 'দাবি-দিবস' পালন করে। সমাবেশের পর ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল অগ্রসর হলে ছাত্রদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস ছোড়া হয়। পুলিশের এই নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৮ জানুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পুনরায় মিছিল বের করলে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি পাল্টে যায়; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় খণ্ডযুদ্ধ দেখা দেয়। ২০ জানুয়ারি ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান শহীদ হন। (হাসান ১৯৮২ : ৪৩৮)

ওঙ্কার উপন্যাসে উল্লেখ আছে :

> হঠাৎ করে শহরে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল। কোথায় পুলিশ নাকি আসাদ নামে কোনো এক ছাত্রকে মেরেছে। তার পরদিন থেকে গোটা শহরে অলক্ষুণে ব্যাপার একের পর এক ঘটে যেতে থাকে। সেদিকে যাই, যেদিকে তাকাই, দেখি মানুষের মিছিল। পুলিশ আছে, ক্ষিপ্ত মানুষের ওপর লাঠিচার্জ করে, কাঁদুনে গ্যাস ছুড়ে মারে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসা মানুষ আর ঘরে ফিরে যায় না। (ওঙ্কার : ১২৮)

ছাত্রনেতা আসাদের মৃত্যুতে আন্দোলন আর গতি লাভ করে। ২৪ জানুয়ারি ঢাকা শহরে ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান সূচিত হয়। সচিবালয়ে বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ গুলি করলে পাঁচজন নিহত হন। বিক্ষোভকারী জনতা লাশ নিয়ে মিছিল বের করে। এ সময় সরকার সমর্থিত পত্রিকা অফিস, জাতীয় পরিষদ সদস্যের বাড়ি ও নবাবপুর রোডে আগরতলা মামলার রাজসাক্ষীর হোটেল অগ্নিসংযোগ করে।

কথক ওঙ্কার উপন্যাসে বলছে :

> শেষ পর্যন্ত ঘরের মানুষদের জোর করে ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য রাস্তায় গোমড়ামুখো বাঘমার্কা মিলিটারি নামে। রাস্তার ধারে ধারে উদ্যত সঙ্গিনের ফলা চকচক করে। ক্ষিপ্ত মানুষ আচমকা বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়ায়। মিলিটারির রাস্তাঘাটে টহল দেয়। বুটজোতার একটানা আওয়াজ পিচের রাস্তায় বুকের গেঁথে থাকে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসা মানুষ আর ঘরে ফেরে না। তারা সেনাবাহিনীর বেষ্টনী ভেদ করে রাজপথ দখল করে। সৈন্যেরা রাইফেলের বেল্ট টান দেয়, ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বেরিয়ে আসে। মানুষের বুকে গুলি লাগে। রাজপথে লাল টাটকা খুনের প্লাবন ছোটে। রাজপথে আবার মেঘনা পদ্মার স্রোতের

মতো মিছিল নামে। গর্জনে আকাশ বাতাস কাপে। মিলিটারি উঠে যেতে বাধ্য হয়। এই ছিল সত্যিকারের অবস্থা (ওঙ্কার : ১২৮)

কথকের জবানে ঔপন্যাসিক উল্লেখ করছেন :

আসাদের মৃত্যুর দশবারো দিন পরেই শুরু হল ঘেরাও- পোড়াও জ্বালাও অভিযান। মিছিলকারীরা আর নিরামিষ চিৎকার করে সন্তুষ্ট থাকতে পারছিল না। তারা ভয়ানক সহিংস একটা কিছু করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। যা হোক সেদিন দেখলাম মানুষে মানুষখচিত মোটা দুটো অজগরের মতো প্রায় স্রোতের বেড়ে আমাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। তীব্র তীব্র গতিবেগ! সামনের বাধা বন্ধন চূর্ণ করে ফেলার জন্য রেলগাড়ির মতো বেগে ছুটে আসছে। দরোজা জানালা বন্ধ করে নিশ্চিন্তে হই কেমন করে। এই ধারালো ভরালো আওয়াজ মাতৃজঠরে প্রবেশ করে গর্ভস্থ সন্তানকেও সচকিত করে তোলে। (ওঙ্কার : ১২৯)

এমন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কথক দেখেন তার বোবা বউ কথা বলতে চাইছে। 'বোবা বউটি নিষ্ক্রিয় বাকযন্ত্রটি কাজে লাগানোর বৃথা চেষ্টা করছে। মাথার চুল ফেসো হয়ে বাতাসে উড়ছে। মাঝে মাঝে জানালার শিক ধরে হ্যাচকা টান লাগাচ্ছে। এই বুঝি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল সব।'

কথক বলছে :

গলা দিয়ে আগে যে নুড়িপাথরের মতো গোলগোল শব্দাংশ নির্গত হতো : সেগুলো একেবারে অন্যরকম শোনাল। স্পষ্টত লক্ষ করলাম গোঁ গোঁ আওয়াজের ধাঁচটা খুব দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। গোল গোল ধ্বনিগুলো এঁকেবেঁকে তেরছা তির্যক আকার নিচ্ছে। উচ্চারণ-প্রক্রিয়ার মধ্যে মাত্রার পর মাত্রা সংযোজিত হচ্ছে।...আওয়াজটা গোঁ গোঁ এর স্থলে বা...র মতো শোনাচ্ছে পরিষ্কার। প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু বাকযন্ত্রটি কাজ করছে না। (ওঙ্কার : ১৩০)

এক সময় কথকের বউ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অকার্যকর বাকযন্ত্র ছিড়ে বের হয় গলগল রক্ত।

গোটা বাংলাদেশের শিরা-উপশিরায় এক প্রসববেদনা ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষের বুকফাটচা চিৎকার ধ্বনিত হচ্ছে নবজন্মের আকুতি। আমার বুকেও তরঙ্গ ভাঙছে। কেঁপে কেঁপে উঠছি আমি। চারপাশের সবকিছু প্রবল প্রাণাবেগে থরথর কাঁপছে। বাংলাদেশের আকাশ কাঁপছে, বাতাস কাঁপছে, নদী সমুদ্র পর্বত কাপছে। নরনারীর হৃদয় কাঁপছে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। আচানক বেকাবা বউ জানালাসমান লাফিয়ে বাঙলা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করল। তার মুখ দিয়ে গলগল রক্ত বেরিয়ে আসে। তারপর মেঝেয় সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে থাকে। ভেতরে কী একটা বোধ হয় ছিঁড়ে গেছে। আমি মেঝেয় ছোপ ছোট

> টাটকা লালরক্তের দিকে তাকাই, অচেতন বউটির দিকে তাকাই। মন ফুঁড়েই একটা প্রশ্ন জাগে- কোন রক্ত বেশি লাল। শহীদ আসাদের- না আমার বোবা বউয়ের (ওঙ্কার : ১৩০)

বোবা বৌ সত্যি সত্যি পরিষ্কারভাবে বাংলা উচ্চারণ করে। কিন্তু তার জন্য দিতে হয়েছে রক্ত। এই 'বাংলা' উচ্চারণকে যদি বাংলাদেশ ধরা হয়, এই বোবা বৌ- এর রক্তকে পূর্ব-বাংলার জনগণের রক্ত ধরা তাহলে কঠিন এক ঐতিহাসিক বাস্তবতার দিকে ধাবিত হতে হয় আমাদের। এভাবেই আখ্যানের শেষ হলো। দেশের অবস্থা যেভাবে পরিবর্তিত হচ্ছিল তার পরিণতি সম্পর্কে ঔপন্যাসিক সরাসরি আর কিছু বললেন না। তার দায়ভার ছেড়ে দিলেন ইতিহাসের ওপর, সময়ের ওপর।

উপন্যাসের পরিণতি সম্পর্কে সলিমুল্লাহ খান বলেন, আহমদ ছফার ওঙ্কার উপাখ্যানেও পরিণতির এই দ্বিধা আছে। বোবা বৌ যে মুহূর্তেও আবর্তনে জানালা সমান লাফাইয়া 'বাংলা' শব্দ উচ্চারণ করিল সেই মুহূর্তেও পরিণতি একটা। এই পরিণতির নাম ধরা যাউক, বেহাত বিপ্লব। (সলিমুল্লাহ ২০১৩ : ২১২)

ওঙ্কার- এ দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন ও গণজাগরণের চিত্র শুধু সমাজ-আলেখ্য হিসেবেই আসেনি। এই কাহিনি সময়ের তাৎপর্যকে গুরুত্ববহ করেছে। এই বোবা বৌ বাংলাদেশেরই বোবা- বেদনা এবং স্বাধীন সত্তার আত্মপ্রকাশের প্রতীক। পারিবারিক কাহিনি হলেও এভাবে আহমদ ছফা সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্যকে এই রচনায় ব্যঞ্জিত করে তুলেছেন। নিছক অতীত-বর্ণনা, সামাজিক-রাজনৈতিক জাগরণের বহিরাঙ্গিক চিত্রায়ন লেখকের উদ্দেশ্য নয়। প্রতীকী ও রূপকী তাৎপর্যে অনেকটা সংহত ও দৃঢ়বদ্ধভাবে লেখক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং গণমানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকেই রূপায়িত করেছেন।

তথ্যসূত্র

ফারহানা শাহরিন, *ইতিহাসের বাঁকচিহ্ন ও আহমদ ছফার উপন্যাস*, সাহিত্য গবেষণাপত্র, বর্ষ ১, সংখ্যা ১, অগ্রহায়ণ ১৪২১, ডিসেম্বর ২০১৪, বাংলা বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

হুমায়ূন আহমেদ, *পড়বে না তার পায়ের চিহ্ন*, আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ, মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহবার হাসান সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, *আহমদ ছফার উপন্যাস ওঙ্কার : ব্যঞ্জনাময় প্রতীকে সেদিনের বাংলাদেশ*, আহমদ ছফা স্মারক গ্রন্থ

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *দ্বি-জাতি তত্ত্বের সত্য-মিথ্যা*, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৭, ঢাকা

সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান, ২য় সংস্করণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩

হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮২, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।

কর্নেল শওকত আলী, *সত্য মামলা আগরতলা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১

সলিমুল্লাহ খান, *আহমদ ছফা সঞ্জীবনী*, আগামী প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, ২০১৩

খ. জন্মের প্রসববেদনা (অলাতচক্র)

দীর্ঘ ২২ বছর পর পাকিস্তান ভেঙে যাওয়া ছিল একটি অনিবার্য ঐতিহাসিক সত্য। পাকিস্তান যে ভেঙেছিল তার কারণ বাঙালি মুসলামনের জাতীয়তাবোধ। কিন্তু শূন্য থেকে তো জাতীয়তাবোধ জন্মায় না। আহমদ ছফা বলছেন :

> এখানে পূর্ব-বাংলা যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠল তারাই প্রথম অনুভব করল রাজনীতি-অর্থনীতি, ভাষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি আধিপত্য প্রতিরোধ না করতে পারলে, বাঙালি হিসেবে তাদের বিকাশ সম্ভব নয়। মওলানা ভাসানী, সোহরওয়ার্দী, শেখ মুজিব এরা ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের নেতা। পরে পাকিস্তানকেও ভাঙতে হলো, কারণ ভাগে মিলছিল না। এটা একটা হিসাব, আর একটা হিসাব আছে। অর্থাৎ একটি জাতি কোন উপলক্ষে জেগে ওঠে, কত গভীরে তার প্রভাব পড়ে, কিন্তু তার প্রভাব অনেক সময় দীর্ঘস্থায়ী হয়। সেইদিক থেকে বাঙালি জাতির ইতিহাসে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেয়ে প্রভাব সঞ্চারী বড় কোনো ঘটনা নেই। (ছ. সা ২০১৩ : ২১৫)

এই পাকিস্তান ভাঙন প্রক্রিয়ার অন্যতম একটি প্রক্রিয়া একাত্তর। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। আহমদ ছফার অলাতচক্র (১৯৯৩) উপন্যাসটি একাত্তরের ইতিহাস। একটি দেশের জন্মের প্রসববেদনা কী রকম হতে পারে আহমদ ছফা উদ্বাস্তু মানুষের জীবনযাপন, দেশ থেকে বিতাড়িত মানুষের সংগ্রামের মাধ্যমে তা তুলে ধরেছেন। মোট কথা উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি স্বাধীনতাযুদ্ধের যুগযন্ত্রণাকে ধারণ করেছেন। যুদ্ধের আগুন কীভাবে পুড়িয়েছে প্রেমের হৃদয়, কীভাবে পুড়িছে ব্যক্তির হৃদয় এ সব হিসাব-নিকাশ পাওয়া যাবে আলোচ্য উপন্যাসে।

অভিধানের ভাষায় 'অলাতচক্র' শব্দের অর্থ আগুনের চক্র। অর্থাৎ আগুনের কুণ্ডলি ঘোরালে যেরকম চক্র তৈরি হয় সেটিই অলাতচক্র। ঔপন্যাসিক অলাতচক্র বলতে এখানে যুদ্ধের আগুনকে বুঝিয়েছেন। এই ঘূর্ণায়মান আগুনের চক্রে বাংলাদেশের পরিমণ্ডল আলোকিত হয়েছে কিন্তু তার আগে পুড়েছে মানুষ, পুড়েছে জনপদ, পুড়েছে উদ্বাস্তু মানুষের স্বপ্ন। অলাতচক্র উপন্যাস এই পুড়ে যাওয়া মানুষের কাহিনী। এই পুড়ে যাওয়া কাহিনীর মধ্যে নায়কের মধ্যে রয়েছে দানিয়েল চরিত্র।

মুক্তিযুদ্ধের সময়কার কলকাতা নগরীর চিত্র ঠাসা এ উপন্যাস। এর শুরু ও শেষ দুটোই হাসপাতাল। অতি নগন্য একটি অংশ বাদে বাংলাদেশের সকল সামাজিক শ্রেণি মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। তবে মুক্তিযুদ্ধের পথ ও পদ্ধতি নিয়ে সকলের মত একটাই ছিল এমন কথা বলা যাবে না। যুদ্ধ শেষে নতুন রাষ্ট্রখানি কোন পথে চলবে, বিশেষ করে তা নিয়ে মতভেদ গড়ে উঠেছিল সবচেয়ে বেশি। পুঁজি সঞ্চয়ন অভিলাসী বুর্জোয়াশ্রেণির মধ্যে মত ও পথের ছোট ছোট ভেদ ছাড়াও সংখ্যাগুরু চাষি মজুর ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির সাথে বুর্জোয়া অধিপতিদের মতভেদ প্রকট হয়ে উঠেছিল।

বিশেষত নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভিন্ন বাসনা একরকম সংজ্ঞাহীন সাম্যেও, কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের দাবি হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছিল। যুদ্ধ চলবার সময় কলকাতায় একদল লোকের দাপট দেখলে আঁচ করা যেত জনগণের সাথে তাদের ভেটটা কতটুকু মৌলিক। উত্তরকালে বাংলাদেশের অনেক অঘটনের আভাস যে এদের এই অনুচিত ব্যবহার, ইশারায় সেই কথাটি বলাই অলাতচক্র উপন্যাসের তাগিদ বলে মনে হয়। (সলিমুল্লাহ ২০১০ : ২৪২)

অলাতচক্রের কাহিনিতে দেখা যায়- স্বাধীনতা যুদ্ধের ভয়াবহ আগুনের মধ্যে দেশে ছেড়েছে উপন্যাসের নায়ক দানিয়েল। সে জানে না দেশে তার বাবা-মা পরিবারের অবস্থা কী। কলকাতায় থাকার সময় সে খবর পায় তার ভালোবাসার মানুষ তায়েবা কলকাতার এক হাসপাতালে ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করছে। তার মৃত্যু আসন্ন। দানিয়েল মনের টানে, বিবেকের টানে কখনো হতাশার টানে হাসপাতালে আসা-যাওয়া করে, সে চোখের সামনে দেখতে পায় একজন মানুষের ধীরে ধীরে মৃতের পথে ধাবিত হওয়ার বাস্তবতা। উপন্যাসে উঠে আসে লেখকের সঙ্গে তায়েবার পরিচয়, তায়েবার রাজনৈতিক জীবনের আলেখ্য। দানিয়েলের স্মৃতিচারণায় ঢাকার জীবন, যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের অবস্থা, সেই সময়ের দেশীয়-আন্তর্জাতিক রাজনীতির দিকটি উঠে এসেছে। এখানেই শেষ নয়, কলকাতার শরণার্থী জীবনের ভয়াবহতার নানা দিক উপন্যাসে উঠে এসেছে। উপন্যাসে সরাসরি যুদ্ধের বিবরণ নেই, কিন্তু যুদ্ধের প্রভাবে জর্জরিত মানুষের কথা, তাদের যন্ত্রণাবোধের কথা রয়েছে। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে হাসপাতালে মারা যায় তায়েবা।

আহমদ ছফার প্রেম ও যুদ্ধের উপন্যাস হিসেবে আলোচিত হয়ে থাকে 'অলাতচক্র'। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা এই উপন্যাসে তিনি যেসব কলাকুশলী বেছে নিয়েছেন, তঁদের অধিকাংশ চেনা মুখ; রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের পরিচিত মানুষ। উপন্যাসের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আমরা প্রত্যক্ষ করি, বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের গতি-প্রকৃতি, তার নানা পর্যায়, সবলতা ও

দুর্বলতাগুলো। প্রত্যক্ষ করি লাখ লাখ নিরাশ্রয় মানুষের আকুতি, বেদনা ও স্বজন হারানোর শোক। সেই সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের ক্ষুদ্রতা, স্বার্থবাদিতা এবং দ্বন্দ্বের বিষয়টিও লেখক শৈল্পিকভাবে তুলে ধরেছেন নানা ঘটনা ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে। মুক্তিযুদ্ধ সেদিন দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষকে এক জায়গায় নিয়ে এলেও একতাবদ্ধ করতে পারেনি।

আজকের বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক বৈরী অবস্থা ও বিদ্বেষ, তার বীজও রোপিত হয়েছিল একাত্তরে। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেও ছিল নানা মত ও পথ। রাজনীতির এই জটিল ও কুটিল দিকগুলোও লেখকের কুশলী বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ঘটনা পরম্পরায় এসেছে একাত্তরের নানা কলাকুশলী কেউ নায়ক, কেউ খলনায়ক। মানুষের জীবন এমনই বিস্ময়কর যে একই ব্যক্তি কোথাও নায়ক, কোথাও খলনায়ক। আহমদ ছফা এই উপন্যাসের মাধ্যমে একাত্তরে বাংলাদেশের রাজনীতির চালচিত্র অঙ্কন করতে চেয়েছেন। 'অলাতচক্র' যুদ্ধেরই উপন্যাস, একই সঙ্গে প্রেমেরও।

উপন্যাসে লেখক দানিয়েলের ছদ্মবেশে নিজের জীবনের কথাকে তুলে ধরেছেন। এ কারণে আহমদ ছফার 'অলাতচক্র' আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস।

আহমদ ছফার ভাতিজা নূরুল আনোয়ার জানাচ্ছেন, ছফা কাকার তিনটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস রয়েছে। উপন্যাসগুলো হলো- 'অলাতচক্র', 'পুল্প বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ' ও 'অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী'। এই উপন্যাসগুলোতে তিনি কল্পনার চেয়ে সত্যকে বেশি প্রাধ্যান্য দিয়েছেন। তিনি দাবি করতেন এই উপন্যাসগুলোতে একটুও মিথ্যার ছোঁয়া নেই। অলাতচক্র উপন্যাসে তরু সম্পর্কে একটি নির্ভেজাল কাহিনী বিধৃত হয়েছে। (নূরুল ২০১০ : ৮৭)

আহমদ ছফা বাস্তবের তরুকে, অনুভবের তরুকে, প্রেমের তরুকে উপন্যাসে ঠাঁই দিয়েছেন তায়েবার মাধ্যমে। লেখক তায়েবার এই গল্পটির মাধ্যমে নিজের বাসর পেতেছেন।

নূরুল আনোয়ার লিখেছেন, ছফা কাকার ডায়েরি থেকে জানা যায় পয়লা বৈশাখ অর্থাৎ এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় তিনি দেশ ছেড়ে আগরতলা গিয়েছিলেন। অর্থাৎ সময়টি এপ্রিলের মাঝামাঝি হবে। তার ইচ্ছা হয়েছিল তিনি অস্ত্র হাতে মুক্তিযুদ্ধ করবেন। কিন্তু তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা জানালেন, অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করার জন্য অনেক যুবক এক পায়ে খাড়া। তারা অস্ত্র হাতে পেলেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সুতরাং অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি একজন ক্রিয়েটিভ মানুষ। কলমই হতে

পারে তোমার যুদ্ধাস্ত্র। যুক্তিটা কাকার মনে ধরেছিল। তিনি এ কাজের জন্য ভারতকে নিরাপদ স্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এবং সেখানে চলে গিয়েছিলেন (নূরুল ২০১০ : ৮৩)

অধ্যাপক আবু জাফর লিখেছেন, এপ্রিল ১৯৭১ সালে আমি দুভাই নিয়ে প্রথমে পালিয়ে যায় প্রথমে কানুনগোপাড়া; তারপর হাটহাজারী, নাজিরহাট, হেঁয়াক, রামগড় হয়ে পৌঁছাই আগরতলা। সেখানে যুদ্ধকালীন ছিন্নমূল মানসিকতার কারণে পরিচিতজনেরা কেটে পড়ে যে যার মতো। ফলে আশ্রয় নিই রিফ্যুজি ক্যাম্পে। সেখানে লঙ্গরখানার খাদ্যে যখন প্রাণধারণ করছি তখন হঠাৎ দেখা হলো তার সঙ্গে (ছফা)। প্রবাসে তার মতো সদা-আশাবাদী বন্ধুকে পেয়ে বড়ই খুশি হলাম। প্রায়ই একসঙ্গে ঘোরাফেরা করতে থাকলাম। বিশেষ করে আগরতলার সস্তা আটার মিষ্টি পাউরুটি দিয়ে যখন সকালে বা দুপুরে খাওয়া সারতে হতো মাঝেমধ্যে, তখন তার সঙ্গ ছিল অনিবার্য আশ্রয়। ওখান শিক্ষক ও সাংবাদিকদের সঙ্গেও আমাদের নানাভাবে যোগাযোগ ঘটে। তবে আমরা সবসময় একসঙ্গে যে সময় কাটাতে পারতাম, তা কিন্তু নয়। সাফা প্রায়ই নিজের মতো করে কোথায় কোথায় যেন চলে যেতো। আবার চলে আসত হুট করেই।

ছফা বিষয়ে তিনি আরো লিখেছেন, সাফার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক হয় যে, আমরা একসঙ্গে স্থলপথে ধর্মনগর, গৌহাটি হয়ে কলকাতা যাবো। যাওয়া প্রায় ঠিকঠাক। এমন সময় মায়ের কথা মনে করে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকলো সাফা। কখনো তাকে এরকম ভেঙে পড়তে দেখিনি। তার আত্মীয়স্বজনদের কথা সে কখনও আমাদের বলতো না। কেবল মাকে যে ভালোবাসতে অপরিমেয় সেটা আমি জানতাম। সাফা বলা শুরু করলো যে, তার মাকে খানসেনার মেরে ফেলবে। অতএব, সে চট্টগ্রামে ফিরে যাবে মাকে আনার জন্যে। (জাফর ২০০৩ : ২৯-৩০)

ছফা তরু নামে এক মেয়েকে ভালোবনতেন। এই তরুকে ঘিরে ছিল তার অনেক স্বপ্ন। একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামীদের অনেক মানুষের মত তরুও ভারতে গিয়েছিলেন। ভারতের গিয়ে তরুর সঙ্গে ছফা কাকার দেখা হলেও একসময় তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে তাকে ছফা আবিষ্কার করেন কলকাতার পিজি হাসপাতালে, তখন তিনি মরণব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত। কোলকাতাতে একটা দীর্ঘ সময় ছফাকে তরুর পেছনে ব্যয় করতে হয়েছে। একটু সুযোগ পেলেই তিন তরুর কাছে ছুটে যেতেন। কাছে থেকে সেবা করেছেন রোগাক্রান্ত প্রেমিকাকে। কিন্তু মরণব্যাধি ক্যান্সার তরুকে বাঁচতে দেয়নি। একাত্তরের চার ডিসেম্বর। সেদিন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কলকাতা শহরে বিমান হামলার ভয়ে সারারাত বিদ্যুৎ বন্ধ রাখা হয়েছিল। সেই অন্ধকার রাতে

তরুকে একাকী থাকতে হয়েছিল। সেই ফাঁকে যমদূত তার প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছিল। 'অলাতচক্র' উপন্যাসটি রচিত হয় ১৯৮৪ সালে। ওই বছর নিপুণ পত্রিকায় তা ছাপা হয়। ওই সময় উপন্যাসের চরিত্রগুলো ছিল তরু, ফ্লোরা, বুলা, মা, বড়দা, সত্যেন দা, ওয়াহিদুল, সনজীদা, আহমদ (ছফা) ইত্যাদি।

নূরুল আনোয়ার উল্লেখ করেছেন, এই নামগুলো উল্লেখ করার কারণে অনেকে ছফা কাকাকে নালিশ করেছিলেন। ফলে ১৯৯৩ সালে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রাক্কালে পরিমার্জন করার সময় নামগুলো তিনি পরিবর্তন করে দেন। এতে তরুর নাম পাল্টিয়ে রাখা হয়েছিল তায়েবা এবং আহমদের নাম দানিয়েল। (নূরুল ২০১০ : ৮৭)

'অলাতচক্র' সম্পর্কে আহমদ ছফা লিখেছেন :

> তরুর এই গল্পটা আমাকে চব্বিশ তারিখের মধ্যে শেষ করতে হবে। যে বাসর আমার রচিত হয়নি এই গল্পটির মধ্যেই সে বাসর আমি পাতব। মানুষের আত্মা বলতে কিছুর অস্তিত্ব আছে কি না আমার কাছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। তবু দোষ কি বিশ্বাস করতে, মানুষের আত্মা আছে। আমি মনে মনে প্রার্থনা করছি তরুর আত্মা আমাকে সাহায্য করে, যাতে করে তার জীবনবৃত্ত আমি মেলে ধরতে পারি।
>
> এক সময় তো তাকে সব দিয়ে ভালোবেসি। সে ভালোবাসার বেদনা ঘনগাহন কাহিনীটি আমি প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছি। আমি প্রার্থনা করব সূক্ষ্ম চেতনারূপী তরুর আত্মার সকাশে আমার অনুভবে সত্য যেন প্রকাশমান হয়, যতই নিষ্ঠুর হোক আমার বিশ্বাস স্থির এবং অটল থাকতে পারি। আল্লাহর কাছে মুনযাত, তিনি যেন ক্রিয়াশীল শক্তির অপার করুণাবলে আমার চেতনাকে রাগ-দ্বেষ ঈর্ষা থেকে মুক্ত করে একটি সমুন্নত দিগন্তের দিকে চালিত করেন। আমার পূর্বসূরী মহান লেখকদের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে এই দীন প্রয়াসকে সফলতার দ্বারদেশে পৌঁছে দেন। (ছফা, ৮ : পরিশিষ্ট)

উপন্যাসটির শুরু হয়েছে হাসপাতাল দিয়ে, শেষও হাসপাতালে। মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকা একজন প্রত্যয়ী নারীকে দেখতে যাওয়ার ঘটনা দিয়ে উপন্যাস শুরু হয়েছে দানিয়েলের দৃষ্টিকোণ থেকে :

> আমি যখন হাসপাতালে এসে পৌঁছলাম, সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে। মনুমেন্টের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে নামছে। রবীন্দ্রসদনের এইদিকটাতে মানুষজন গাড়িঘোড়ার উৎপাত অধিক নয়। মহানগর কলকাতার এই বিশেষ স্থানটি অপেক্ষাকৃত শান্ত নিরিবিলি। বিশেষ করে এই ক্ষণটিতে, যখন গোধূলির সঙ্গে বিদ্যুতের আলোর দৃষ্টি বিনিময় হয়। (অলাত ২০০৪ : ২৩৯)

উপন্যাসটি কী বিষয়ে সেটি প্রকাশ করতে বিলম্ব করেননি আহমদ ছফা। উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠাতে একটি রোগীর হাসপাতাল জীবনযাপনের ইঙ্গিত দিলেও আহমদ ছফা পরের পৃষ্ঠাতেই জানিয়ে দিয়েছেন এটি উদ্বাস্তু মানুষের কাহিনি। ভিটেমাটি ছেড়ে আসা মানুষের কাহিনি নিয়ে এই উপন্যাসের যাত্রা। হাসপাতালের লোক গোবিন্দ উপন্যাসের নায়ক দানিয়েলেকে জানায়, হাসপাতালে এক রোগী ভর্তি হওয়ার কথা :

জানেন দাদা, আমাদের ওয়ার্ডে আপনাদের জয়বাংলার একটি ফিমেল পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে। লোকটা এ পর্যন্ত দু'বার জয়বাংলা শব্দটি উচ্চারণ করল।

এ তথ্যের প্রেক্ষিতে দানিয়েলের মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে উপন্যাসে। বাংলাদেশের দুর্ভোগ, জনপদের বাসিন্দাদেও অসহায়ত্বের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসা মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক। এক্ষেত্রে লেখকের গভীর জীবনসন্ধানী দৃষ্টির প্রমাণ মেলে :

> কলকাতা শহরের লোকদের মুখে ইদানীং জয়বাংলা শব্দটি শুনলে আমার অস্তিত্বটা যেন কুঁকড়ে আসতে চায়। শেয়ালদার মোড়ে মোড়ে সবচেয়ে সস্তা, সবচেয়ে ঠুনকো স্পঞ্জের স্যান্ডেলের নাম জয়বাংলা স্যান্ডেল। এক হপ্তার মধ্যে যে গেঞ্জি শহরের মায়া ত্যাগ করে তার নাম জয়বাংলা গেঞ্জি জয়বাংলা সাবান, জয়বাংলা ছাতা কতকিছু জিনিস বাজারে ছেড়েছে কলকাতার ব্যবসায়ীরা। দামে সস্তা টেকার বেলায়ও তেমন। বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের ট্যাঁকের দিকে নজর রেখে এ সব পণ্য বাজারে ছাড়া হয়েছে। কিছুদিন আগে যে চোখওঠা রোগটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, কলকাতার মানুষ মমতাবশত তারও নামকরণ করেছিল জয়বাংলা। এই সকল কারণে খুব ভদ্র অর্থে কেউ যখন আমাদের জয়বাংলার মানুষ বলে চিহ্নিত করে তখন বিব্রত না হয়ে উপায় থাকে না। (অলাত : ২৪০)

যুদ্ধের মধ্যে বিপন্ন অবস্থায় পড়ে যারা দেশে ছেড়েছিলেন, আশ্রয় নিয়েছিলেন সীমান্তের ওপারে তাদের জীবনের বাস্তব-করুণ সত্য ধরা পড়েছে অলাতচক্রে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, নির্যাতন ও বিতাড়নের শিকার হাজার হাজার পরিবার ২৫ মার্চের পর থেকেই সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। এ সব শরণার্থীর প্রতি নীতিগতভাবে সহানুভূতিশীল থাকলেও তাদের সবার জন্য উপযুক্ত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা সঙ্গত কারণেই সম্ভব হয়ে ওঠেনি। দীর্ঘ সীমান্ত এলাকায় অস্থায়ী শরণার্থী শিবির খোলা হলেও সেখানে খাদ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসার ঘাটতি ছিল প্রকট। এ কারণে সবচেয়ে দুর্ভোগে পড়ে নারী ও শিশুরা। শরণার্থী শিবিরের বাইরে কলকাতা, আগরতলাসহ সীমান্তবর্তী নগরগুলোতেও ফুটপাতে, খোলা স্থানে সাময়িক আশ্রয় নেওয়া শত শত শরণার্থী পরিবারের অবস্থা ছিল আরও করুণ।

৬ অক্টোবর, মুজিবনগর ডেটলাইনের এই খবরে বলা হয়, 'ভারতের সর্বশেষ সরকারি হিসাবে জানা গেছে যে, বাংলাদেশ থেকে এ পর্যন্ত ৯০ লাখ ৯১ হাজার শরণার্থী সীমান্ত পার হয়ে ভারতে গিয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩,৮৮,৫৩২ জন শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় শিবিরে দিন কাটাচ্ছেন। এখন প্রায় ৬ লাখ ৫২ হাজার শরণার্থী এসব রাজ্যের সরকার পরিচালিত ৯৩৪টি শিবিরে বাস করছেন এবং ২৪ লাখ ৫০ হাজার রয়েছেন শিবিরগুলোর বাইরে। শরণার্থীদের মধ্যে প্রচুর শিশু ও প্রসূতি রয়েছে। তাদের সংখ্যা হলো যথাক্রমে ১৬ লাখ ৬০ হাজার এবং ৫ লাখ ৩১ হাজার। পশ্চিমবঙ্গে ৬১৫টি, ত্রিপুরায় ২৭৩টি, মেঘালয়ে ১৭টি, আসামে ২৭টি ও বিহারে ৩টি রাজ্য সরকার পরিচালিত শিবির রয়েছে।' সীমান্তে যাওয়া এ সব মানুষের দুর্ভোগের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে 'অলাতচক্র' উপন্যাসে।

চাঁটগায়ের ছেলে দানিয়েল। তায়েবার ভাষায় দানিয়েল প্রতিভাবান। এসএসসি থেকে সবগুলো পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেছে সে। স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থাও পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল। মাঝখানে সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। দানিয়েলের স্বপ্নভঙ্গের শুরু। উপন্যাসে পর্যায়ক্রমে দেখা যাবে নায়কের স্বপ্নভঙ্গের নানা পরিচয়। ওপার সীমান্তে উদ্বাস্তু জীবন সম্পর্কে দানিয়েল বলছে :

> মুখে সাত আটদিনের না কামানো দাড়ি। পায়ে জয়বাংলার চপ্পল, জামাকামপড়ও তেমনি। অনাহার অর্ধাহার অনিদ্রার ছাপ মুখে ধারণ করে আমি জয়বাংলার মূর্তিমান শিলাস্তম্ভে পরিণত হয়েছি। এটাই আমার বর্তমান, এটাই আমার অস্তিত্ব। এই কলকাতা শহরে অনেক মানুষ আমাদেও সমাদও করেছে, আমাতীত দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়েছে, অনেকে হেলাফেলাও করেছে। ভালো লাগুক, খারাপ লাগুক সব নির্বিচারে মেনে নিয়েছি। (অলাত : ২৪২)

দানিয়েল আরো জানাচ্ছে :

> কলকাতা শহরে আমরা কচুরিপনার মতো ভেসে ভেসে দিন কাটাচ্ছি। বিশেষ করে মুসলমান ছেলেরা। আমাদের সঙ্গে মা বোন বা পরিবারের কেউ আসেনি। সে কারণে শরণার্থী শিবিরে আমাদের ঠাঁই হয়নি। আমরাও শিবিরের মানুষদের প্রাণান্তকর কষ্ট দেখে মানে মানে শহরের দিকে ছিটকে পড়েছি এবং কলকাতা শহরে গুলতানি মেলে সময়যাপন করছি। একজন আরেকজনকে ল্যাং মারছি। বাংলাদেশের ফর্সা কপড়চোপড় পরা অধিকাংশ মানুষের উদ্দেশ্যবিহীন বেকারজীবন যাপনের ক্লেদ কলকাতার হাওয়া দূষিত করে তুলেছে। আমরা সে হাওয়াতে শ্বাস টানছি। (অলাত : ২৪৫)

কিন্তু দূষিত হাওয়ার মাঝে শ্বাস টানা কতদিন। ওপারে আসা মানুষের জীবন বিষাক্ত হয়ে পড়ে নানা বঞ্চনায়, এরা প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হতে থাকেন খাবারের সুযোগ থেকে, এরা বঞ্চিত হন চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ থেকে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ চায় শরণার্থীরা। কেননা তাদের মনে হয় তাদের মাথার ওপরে কোনো ছাউনি নেই, তারা শূন্যের ওপর ভেসে বেড়ান।

দানিয়েল জানায় :

সীমান্তে একটা যুদ্ধ হচ্ছে। দেশের ভেতরেও একটা যুদ্ধ চলছে। অবস্থানগত কারণে আমরা সে ভয়ঙ্কর ব্যাপারটি ভুলে থাকতে চাই। কিন্তু পারি কই? যুদ্ধে চলে গেলে ভালো হতো। দেশের স্বাধীনতার কতটুকু করতে পারতাম জানিনে। তবে বেঁচে থাকবার একটা উদ্দেশ্য চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করতে পারতাম। আমার যুদ্ধে যাওয়া হয়নি। যুদ্ধকে ভয় করি বলে নয়। আমাদের দেশের যে সকল মানুষের হাতে যুদ্ধের দায়দায়িত্ব তারা আমাকে ট্রেনিং সেন্টারের পাঠাবার যথেষ্ট উপযুক্ত বিবেচনা করতে পারেননি। আমি তিন তিনবার চেষ্টা করেছি। প্রতিবারই মহাপুরুষদের দৃষ্টি আমার ওপর পড়েছে। অবশ্য আমাকে বুঝিয়েছেন আপনি যুদ্ধে যাবেন কেন? আপনার মতো ক্রিয়েটিভ মানুষের ইউজফুল কত কিছু করবার আছে। যান কলকাতা যান। সেই থেকে কলকতায় আছি। হাঁটতে বসতে, চলতে ফিরতে মনে হয়, আমি শূন্যের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছি। (অলাত : ২৪৫)

এভাবেই উপন্যাসে লেখকের সমাজবোধ ও রাজনীতি চেতনার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, ভারতে অবস্থানকারী বাঙালির যন্ত্রণা, সমষ্টিগত প্রত্যাশা-হতাশা- বেদনাবোধের চিত্র রূপায়িত হয়েছে। (মো. র ২০১১ : ১৮৯)

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে একদল সুবিধাবাদী লোকও দেশ ছেড়ে গিয়েছিল। তারা ছিল নামেমাত্র শরণার্থী। তারা প্রকৃত শরণার্থী জীবনের জ্বালাযন্ত্রণা উপলব্ধি করেননি বরং কলকাতার জীবনে আরাম আয়েশ করে সময় কাটিয়েছেন। আহমদ ছফা এসব মানুষের ফাঁপা আনন্দের চিত্র তুলে ধরেছেন। পরিণাম নিয়ে না ভাবা স্বপনহীন মানুষের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। তাদের সম্পর্কে দানিয়েলের শরণার্থী জীবনের সঙ্গী নরেশের ছাত্র আজহারের মনোভাব উঠে এসেছে।

একেকজন লোক ভারত সরকারের অতিথি হিসেবে এখানে জামাই আদরে দিন কাটাচ্ছে। তাদের খাওয়া-দাওয়া ফুর্তি করা, কোনোকিছুর অভাব নেই। আরেক দল বাংলাদেশের ব্যাংক থেকে সোনা লুট করে কলকাতা এসে ডেরা পেতেছে। আবার অনেকে এসেছে বিহারিদের পুঁজিপাট্টা হাতিয়ে নিয়ে। আপনি এই কলকাতা শহরের সবগুলো বার, নাইট ক্লাবে খোঁজ করে দেখুন। দেখতে পাবেন ঝাঁকে

ঝাঁকে বাংলাদেশের মানুষ দুহাতে পয়সা ওড়াচ্ছে। এদের সঙ্গে থিয়েটার রোডের কর্তা ব্যক্তিদের কোনো যোগাযোগ নেই বলতে পারেন? (অলাত : ২৪৮)

একদিকে একদল বাংলাদেশির আনন্দ-বিলাস ভোগের জীবন অপরদিকে শরণার্থী শিবিরে মানুষের অবর্ণণীয় কষ্ট। সবাই প্রাণের ভয়ে নিজের জীবন নিয়ে পালিয়ে আসে, ওপারের সীমান্তে যখন তারা এসে পড়ে তখন প্রাণ ছাড়া আর কিছুই তাদের অবশিষ্ট নেই। কিন্তু এখানে প্রাণধারণ করে টিকে থাকা মুশকিলের ব্যাপার। নরেশের কথায় উঠে আসে শরণার্থী ক্যাম্পের বির্বণ-বিবর্ণ জীবনযাপনের বাস্তবতা। এদেশের তরুণরা যখন দেশ বাঁচাতে জীবন দিচ্ছে, ট্রেনিং ক্যাম্পের দুঃসহ জীবন বেছে নিয়ে শুধু দেশ ভালোবেসে, মুদ্রার অপর পিঠেই আছে তখন প্রিন্সেস স্ট্রিটের আর থিয়েটার রোডের সাহেবদের বিলাসী জীবনযাপনের চিত্র।

শরণার্থী শিবিরগুলোতে কী অবর্ণনীয় কষ্ট এই বিজুলির আলো জ্বলা কলকাতা শহরে বসে কল্পনাও করতে পারবে না। প্রতিটি ক্যাম্পে প্রতিদিন বেশিরভাগ মারা যাচ্ছে শিশু এবং বৃদ্ধ। সৎকারের কোনো ব্যবস্থা নেই। বনগাঁ থেকে শেয়ালদা প্রতিটি স্টেশনে তুমি দেখতে পাবে বাংলাদেশের মানুষ। খোলা প্ল্যাটফর্মের তলায় কী চমৎকার সংসারই না পেতেছে তারা। পুরুষরা সব বসে আছে নির্বিকার। তাদের চোখের দৃষ্টি মরে গেছে। চিন্তা করবার, ভাবনা করবার, স্বপ্ন দেখবার কিছু নেই। সকলেরই একমাত্র চিন্তা আজকের দিনটি কেমন করে কাটে।... মেয়েগুলোকে দেখো। সকলে পরনে একেকখানি তেনা। চুলে জট বেঁধেছে। পুষ্টির অভাবে সারা শরীর কাঠি হয়ে গেছে। এদের মধ্যে এমনও অনেক আছে জীবনে রেলগাড়ি দেখেছে কি না সন্দেহ। এখন সাধ মিটিয়ে রেলগাড়ি চলাচলের পথের ধারে তাদের অচল জীবন কাটাচ্ছে। (অলাত : ২৪৮)

নিজ ছাত্র আজহারের দিকে মুখ বাড়িয়ে নরেশ বলা শুরু করে : সবাই বলছে একটা সংগ্রাম চলছে। আমিও মেনে নিই। হ্যাঁ সংগ্রাম চলছে। কিন্তু আমার কথা হলো সংগ্রাম চলছে অথচ আমি বসে আছি। আমি তো দেশকে কম ভালোবাসিনে। দেশের জন্য মরতে আমি ভয় পাইনে। কিন্ত লড়াই করে মরে যাওয়ার সুযোগটা নেই কেন? গলদা কোথায় জান আজহার, এই মানুষগুলো লড়াইর ময়দানে থাকলে সকলেরই করবার মতো কিছু না কিছু কাজ পাওয়া যেত। দেশ যুদ্ধ করছে, কিন্তু যুদ্ধের ময়দান না দেখেই এদের দেশত্যাগ করতে হয়েছে। সচল জীবন্ত মানুষ এখানে জড় পদার্থে পরিণত হচ্ছে। সেখানেই দুঃখ।

এরপর আলোচনাক্রমে আসে শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে যাওয়ার প্রসঙ্গ। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টিকারী নেতার কারাবাস প্রসঙ্গে হতাশা-ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে।

ইয়াহিয়া সরকার যে আওয়ামী লীগের কাছে পাকিস্তানের রাষ্ট্র পরিচালনার ভার কখনোই হস্তান্তর করবে না তা ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যে কোনো মুহূর্তে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও বাঙালি জনসাধারণে ওপর হামলা চালাতে পারে এই আশঙ্কা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দীন আহমদের মেয়ে শারমিন আহমদ লিখেছেন, ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খান গোপনে ঢাকা ত্যাগ করলেন। আলোচনার আবরণে অপারেশন সার্চলাইট গণহত্যার নীল নকশা তখন সম্পন্ন। দুবছর আগে ইয়াহিয়ার ক্ষমতা গ্রহণের দিনকে বেছে নেওয়া হলো বাঙালির ওপর মরণ আঘাত হানার জন্য। পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৫ মার্চের ভয়াল কালো রাতে আব্বু গেলেন মুজিব কাকুকে নিতে। মুজিব কাকু আব্বুর সঙ্গে আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করবেন সেই ব্যাপারে আব্বু মুজিব কাকুর সাথে আলোচনা করেছিলেন। মুজিব কাকু সে ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী আত্মগোপনের জন্য পুরান ঢাকার একটি বাসাও ঠিক রাখা হয়েছিল। বড় কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আব্বুর উপদেশ গ্রহণে মুজিব কাকু এর আগে দ্বিধা করেননি। আব্বুর, সে কারণে বিশ্বাস ছিল যে, ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে মুজিব কাকু কথা রাখবেন। মুজিব কাকু আব্বুর সঙ্গেই যাবেন। অথচ শেষ মুহূর্তে মুজিব কাকু অনড় রয়ে গেলেন। তিনি আব্বুকে বললেন, ‘ বাড়ি গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে থাকো, পরশুদিন (২৭) মার্চ হরতাল ডেকেছি।’ মুজিব কাকুর তাৎক্ষণিক এই উক্ততে আব্বু বিস্ময় ও বেদনায় বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। এদিকে বেগম মুজিব ঐ শোবার ঘরেই সুকেসে মুজিব কাকুর জামাকাপড় ভাঁজ করে রাখতে শুরু করলেন। ঢোলা পায়জামায় ফিতা ভরলেন। পাকিস্তানি সেনার হাতে মুজিব কাকুর স্বেচ্ছাবন্দি হওয়ার এইসব প্রস্তুতি দেখার পরও আব্বু হাল না ছেড়ে প্রায় একঘণ্টা ধরে বিভিন্ন ঐতিহাসিক উদাহরণ টেনে কাকুকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। তিনি কিংবদন্তি সমতুল্য বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উদাহরণ তুলে ধরলেন, যারা আত্মগোপন করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু মুজিব কাকু তার সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন। আব্বু বললেন যে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মূল লক্ষ্য হলো পূর্ববাংলাকে সম্পূর্ণরূপে নেতৃত্বশূন্য করে দেওয়া। এই অবস্থায় মুজিব কাকুর ধরা দেওয়ার অর্থ হলো আত্মহত্যার শামিল। তিনি বললেন, মুজিব ভাই বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা হলেন আপনি। আপনার নেতৃত্বের ওপর তারা সম্পূর্ণ ভরসা করে রয়েছে।’ মুজিব কাকু বললেন, ‘তোমরা যা করার কর। আমি কোথাও যাব না।’ আব্বু বললেন, ‘আপনার অবর্তমানে দ্বিতীয় কে নেতৃত্ব দেবে এমন ঘোষণা তো আপনি দিয়ে যাননি। নেতার অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি কে হবে, দলকে তো তা জানানো হয়নি। ফলে দ্বিতীয় কারো নেতৃত্ব প্রদান

দুরূহ হবে এবং মুক্তিযুদ্ধকে এক অনিশ্চিত ও জটিল পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেওয়া হবে।' আব্বুর সেদিকের এই উক্তি ছিল নির্মম সত্য ভবিষ্যদ্বাণী।' (শা. আ ২০১৪ : ৫৯-৬০)

ইতিহাসের চরম সত্যের পরিচয় পাওয়া যায় নরেশের বক্তব্যে। শেখ মুজিবের কারাগারে যাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> নেতা এবং তার দল মানুষের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করল। কিন্তু তাদের সংগ্রামের ক্ষেত্র রচনা করতে ব্যর্থ হলো। নেতা গেল পাকিস্তানের কারাগারে। আর আমরা পাকিস্তানি সৈন্যদের আক্রমণের মুখে দেশ ছেড়ে চলে এলাম। সেখানেই আফসোস। নানা হতাশা এবং একটা বেদনার মধ্যেও স্বীকার করি একটা যুদ্ধ হচ্ছে। একদিন না একদিন আমাদের মাটি থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের চলে যেতে হবেই। কিন্তু আমার তো বাবা এ তক্তপোশের ওপর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পিঠে বাত ধরে গেল। (অলাত : ২৪৯)

এই না দেখা যুদ্ধ সবকিছু উলট পালট করে দিল। তায়েবা, ডোরা, জাহিদুল, দানিয়েল, নরেশ যারা এখন কলকাতার বুকে ছন্নছাড়া, যারা এখন মাটি হারা মানুষ ঢাকার বুকে তাদের জীবন ছিল অন্যরকম। এখন তাদের জীবন অন্যরকম। দানিয়েলে উপলব্ধি সবার জীবন অন্যরকম হতে পারত। মাঝখানে একটি যুদ্ধ এসে সবকিছু উল্টাপাল্টা করে দিয়ে দেল। দানিয়েল ঢাকার কথা ভাবে, ৭ মার্চে রেসকোর্সের ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের কথা ভাবে : 'সবকিছু এলোমেলো ছাড়াছাড়া হয়ে যায়। এ দুই আড়াই মাস এরইমধ্যে কীরকম গেল আমাদের জীবন। সাত মার্চের শেখ মুজিবের সে প্রকাণ্ড জনসভার কথা মনে পড়ল। লক্ষ লক্ষ মানুষ, কী তাদের উৎসাহ- উদ্দীপনা! চোখে কী দীপ্তি কণ্ঠস্বরে কী প্রত্যয়! আন্দোলনের সে উত্তাল উত্তুঙ্গ জোয়ার, সব এখন এই কলকাতায় রাতে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।'

এই অলাতচক্র উপন্যাস বহুমাত্রিক বিষয়ের খণ্ডিত খণ্ডিত অনুষঙ্গ নিয়ে গঠিত-বিকশিত। এতে শরণার্থীদের মানবেতর জীবন, কলকাতায় অবস্থানরত ট্রেনিং ক্যাম্পের সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক কৌশল, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি প্রভৃতি উঠে এসেছে। সব মিলিয়ে অলাতচক্র। এর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রেম, এর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বাঙালিদের সংগ্রাম, এর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে স্বাধীন দেশ জন্মের প্রসববেদনা। দানিয়েলের চোখে ধরা পড়ে মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্ব :

> সেই বাংলাদেশের চৈত্রমাসের তারাজ্বলা, চাঁদজ্বলা আকাশ। বাংলাদেশের জনগণের বর্ধিত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আরো প্রসারিত, আরো উদার হওয়া আকাশ। মানুষের ঘ্রাণশক্তি কী তীক্ষ্ণ! কিছু

একটা ঘটবে সকলের মনের ভেতর একটি খবর রটে গেছে। দলে দলে মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে আপনাআপনি তৈরি হয়ে উঠছে ব্যারিকেড। জনগণের সৃজনীশক্তির সে কী প্রকাশ। রাত এগারোটা না বাজতেই রাস্তায় নামল ট্যাঙ্ক। কামান, বন্দুক, মেশিনগানের শব্দে ঢাকার আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠল। ভারি ট্যাঙ্কের ঘড়ঘড় ঘটাং ঘটাং ঝড়ের মুখে কুটোর মতে সরে যাচ্ছে ব্যারিকেডের বাদা। সেই চৈত্র রজনীর চাঁদের আলোতে আমি নিজের চোখে দেখছি আমাদের রাজপথের ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে পাকিস্তানি সৈন্যের ট্যাঙ্ক। সেই ট্যাঙ্কেও ওপর দাঁড়ানো দুজন সৈন্যের বাদামি উর্দির কথা আমি ভুলতে পারছিনে। ভুলতে পারছিনে তাদের ভাবলেশহীন মুখমণ্ডল, আর কটমট চোখের দীপ্তি।

তারপর কী ঘটল? তারপর? একটা ঘটনার পাশে আরেকটা ঘটনা সাজিয়ে সঙ্গতি রক্ষা করতে পারিনে। আগামীকাল কী ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে আঁচটুকুও করতে পারি না। তায়েবা যদি মারা যায়, কী করব জানিনে। যেদিক থেকে চিন্তা করিনে কেন, একটা বিরাট 'না-' এর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। (অলাত : ২৫৫-২৫৬)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ঘিরে ভারতের রাজনীতি সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রিফ্যুজি ক্যাম্পের পাশে ইন্দিরা বিরোধী সি. পি. আই (এম) নাটকের আয়োজন করে। নাটকের এক অভিনেতার জবানে উঠে আসে বাংলাদেশ ইস্যুতে ভারতের রাজনীতির কথা। দেখানো হয় ইয়াহিয়া-ইন্দিরার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

এহিয়া ইন্দিরার মধ্যে কি কোনো বেশকম আছে। এহিয়ার সৈন্যরা সরাসরি খুন করছে। শ্রীমতি বাংলাদেশ ইস্যুটাকে নিয়ে লেজে খেলাচ্ছেন। এতে তাঁরই লাভ। বিরোধী দলগুলোকে কাবু করার এমন সুযোগ তিনি জীবনে কি আর কোনোদিন পাবেন। নকশালদের তৎপরতা এখন কোথায়? এখন কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় বোমা ফাটে না কেন? বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ভারতীয় জনগণ বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার জনগণের যে জাগ্রত সহানুভূতি, ইন্দিরাজি সেটাকে নিজের এবং দলের আখের গুছাবার কাজে লাগাচ্ছেন। এতকাল সি. পি. এম বলত শাসক কংগ্রেস বাংলাদেশের মানুষকে ধাপ্পা দিচ্ছে। তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর কোনো বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করবে না। এখন সে কথা সবাই বলছে। (অলাত : ২৫৭)

শেখ মুজিব জেলে চলে গেলেন। গোটা জনপদ দিশেহারা হয়ে গেল। বাঙালি জনগণের আশা-আকাঙক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো নানামত্রিক হতাশা। মুক্তিযুদ্ধের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আহমদ ছফা সমালোচনা করেছেন :

> শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যে দুর্বার গণ আন্দোলনটি সৃজিত হয়েছিল তার লক্ষ্যের অস্পষ্টতা, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি- এ বিষয়ে কারও দ্বিমত থাকার কথা নয়। তদুপরি স্বায়ত্তশাসের আন্দোলন রাতারাতি স্বাধীনতার সংগ্রামে রূপ করে এশিয়ার একটি সেরা দুর্ধর্ষ বাহিনীর বিপক্ষে বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণকে বলির পাঠার মতো দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। শেখ মুজিব এবং তার দল আওয়ামী লীগ কারও এ প্রচণ্ড পরিস্থিতির মোকাবেলা করার ক্ষমতা ছিল না। ফল যা হওয়ার হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং মুক্তিসংগ্রাম পায়ে হেঁটে সীমান্তে পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় যাচঞা করতে গেলে আর তেজোদীপ্ত মুজিব পাকিস্তানের কারাগারে চলে গেলেন। এ হলো নিরেট সত্য (ছফা ২০০০ : ২২)

ডাক্তারের কাছ থেকে তায়েবার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খোঁজ নিতে পারে দানিয়েল। ড. মাহাতির কাছ থেকে দানিয়েল জানতে পারে আর বেশিদিন জীবনপ্রদীপ থাকছে না তায়েবার। উদ্বাস্তু জীবনে তায়েবার এ কষ্ট দানিয়েলের মনেও আঘাত সৃষ্টি। দানিয়েলের মনোভাবে উঠে আসে ঢাকার জীবনে তায়েবের সঙ্গে তার পরিচয়ের আখ্যান। ৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে তায়েবা রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ঢাকায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছিলেন। সেই তায়েবা আজ হাসপাতালের বিছানায়। তায়েবা সম্পর্কে এত চিন্তা দানিয়েলের সে কি প্রেম, সে কি প্রেমের থেকে অনেক কিছু না কিছুই না। এর মীমাংসা করতে পারেনি দানিয়েল। তায়েবা সম্পর্কে তার মনোভাব :

> মাঝে মাঝে মনে হয়েছে একটা গভীর সম্পর্ক আছে, কিন্তু পরক্ষণে মনে হয়েছে, না কিছুই নেই। সকালবেলার শিশিরলাগা মাকড়সার জাল যেমন বেলা বাড়লে অদৃশ্য হয়ে যায়, এও অনেকটা সে রকম। ...নদীতে বাঁধ দেওয়ার কথা বলা যায়, কেননা নদীতে বাঁধ দেওয়া সম্ভব। কিন্তু সমুদ্রবন্ধন করার কথা কেউ বলে না, কেননা তা অসম্ভব। আমার আর তায়েবার ব্যাপারটি তাই (অলাত : ২৭৬-৭৭)

দানিয়েল জানে তায়েবার প্রতি মনের গহিন কোনো তার সম্পর্কেও বন্ধন রয়েছে, দানিয়েল জানে তার মনের মধ্যে তায়েবার জন্য টান লাগে। কিন্তু বাংলাদেশ নামে নতুন একটি রাষ্ট্রের জন্ম হতে চলেছে, সেই নতুন সূর্যেও বাংলাদেশ তায়েবা দেখতে পাবে না এটি ভেবে দানিয়েলের ভীষণ কষ্ট লাগে। দানিয়েলের মনোভাব :

> তায়েবা আপন চোখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারবে না। স্বাধীনতা অন্তপ্রাণ ছিল তায়েবার। আলাপে আলোচনায় কথাবার্তায় দেখে থাকবেন, তার মনটি কীরকম কম্পাসের কাঁটার মতো স্বাধীনতার দিকে ঝুঁকে থাকে। উনিশশো ঊনসত্তর সালে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে তায়েবা নিজ থেকে উদ্যোগী হয়ে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করেছিল। আমার ব্যক্তিগ লাভ-ক্ষতি সেটা ধতর্ব্যের বিষয় নয়।

> বাংলাদেশের স্বাধীনতা সে দেখে যেতে পারবে না, এটাই আমার বুকে চিরদিনের জন্য আফসোসের বিষয় হয়ে থাকবে। (অলাত : ২৭৯)

তায়েবার জন্য আফসোস থাকলে নিজেই আবার সান্ত্বনা খুঁজেছেন। দানিয়েল জানে তায়েবার মৃত্যু অবধারিত। সুতরাং এই কঠোর সময়ে নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া তার সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। গতরাতে তায়েবা যদি ঘুমের মধ্যে মারা যায়, যদি হাসপাতালে গিয়ে তার মরা শরীর দেখে তবু কেদে বুক ভাসাবে। এ ছাড়া তার আর কী করার আছে?

কলকাতার যে বাসায় দানিয়েল বসবাস করেন। সেখানে মাঝে মাঝে আড্ডা হয়, সেখানে বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ আছে। তারা যুদ্ধের পরিণতি কী হতে পারে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেবে, প্রবাসী সরকারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ওই আড্ডাতেই দানিয়েলের অপরিচিত এক লোক বলে :

> বাংলাদেশের ফ্রিডম ওঅরের কথা শুনে লেখাপড়া ছেড়ে ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় এসেছি আজ পঁচিশ দিন। কিন্তু এখানে এসে কী দেখছি। দেখেছি থিয়েটার রোডে যারা বসে আছে তাদের অধিকাংশই এ বাঞ্চ অব রাস্কেলস। খাচ্ছে দাচ্ছে মজা করছে এভাবে নাকি ফ্রিডম ওঅরের নেতৃত্ব দিচ্ছে। ভয়ঙ্কর ড্রি-ইল্যাশান হয়ে গেছি। মাও সে তুঙও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আপনারা নিশ্চয় লংমার্চের জানেন? (অলাত : ২৮৬)

চীনের কিয়াংশি প্রদেশে ছিল লালফৌজের সবচেয়ে বড় ও মূল ঘাঁটি। ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত শেটির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের এই প্রদেশটিতেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তারা। এ সময় পার্টির অভ্যন্তরে অবস্থিত হটকারীদের আত্মবিধ্বংসী কার্যক্রমের কারণে প্রতিদ্বন্দ্বী কাইশেকের সরকারি বাহিনী লালফৌজের ওপর ভয়াবহ চাপ তৈরি করে। মাও সেতুঙ নিজেদের রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে কিয়াংশি ত্যাগ করেন। সরকারি বাহিনীর সঙ্গে বহু সংঘর্ষ মোকাবিলা করে ১২ হাজার ৫০০ কিলোমিটার অর্থাৎ প্রায় আট হাজার মাইল অতিক্রম করে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে উত্তর-পশ্চিমের সেনশি এলাকায় এসে পৌঁছে। যুদ্ধ ও বিপদ সঙ্কুল এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমার ইতিহাসে 'লংমার্চ' নামে বিখ্যাত হয়েছে।

মাও সেতুঙ-এর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বাধীন লালফৌজের অংশ এক বছরের মধ্যে উল্লেখিত পথ পাড়ি দিতে পেরেছিল। তার বাহিনীর হুনান, হুপে ইত্যাদি এলাকা থেকে রওনা হওয়া অন্যান্য বাহিনীর অংশ

সেনশি এসে পৌঁছায় ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে। এই হিসেবে দুই বছরকে লংমার্চের সময় ধরা হয়।

লংমার্চ লালফৌজকে শুধু ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেনি, একইসঙ্গে তাদের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বিজয়ের পর লালফৌজের শক্তি ও আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি করেছে। যদি এর জন্য তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে রক্ত ব্যয় করতে হয়েছে। এর বিপরীতে বিরোধী শক্তির মনোবল ব্যাপকভাবে ভেঙে দিতে সমর্থ হয়। এই লংমার্চে লালফৌজের অন্যতম অর্জন হলো, তাদের দলের সুবিধাবাদী অংশকে চিহ্নিত করতে পারা এবং নিবেদিতপ্রাণ অংশকে পরীক্ষার মাধ্যমে পাওয়া। এতে করে বিশ্বের বুকে স্থান করে নেওয়া লালফৌজ ত্যাগ-তিতিক্ষা ও শৃঙ্খলার এক আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

আহমদ ছফা 'অলাতচক্র' উপন্যাসে চীনার নেতৃত্বে লংমার্চের প্রসঙ্গ তুলে বাঙালি নেতাদের অন্তঃসারশূন্যতাকে তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ ইস্যুতে মাওলানা ভাসানীর প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। চীনা রাষ্ট্রের সঙ্গে ভাসানীর সম্পর্কেও রেখাপাত আছে উপন্যাসে।

'মাওলানা ভাসানী মাও সেনতু তুঙ এবং চৌ এন লাইয়ের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন, যাতে চীন পাকিস্তানের এই নির্বিচার হত্যাকাণ্ডে কোনোরকম সহায়তা না করে।'

সে সময় খুরশিদ নামে একজন বলে, আরে থোন ফালাইয়া, আপনার মাওলানা ভাসানীর টেলিগ্রাম দুইখান চৌ এন লাই আর মাও সে তুঙ যতন কইর‍্যা ওয়েস্ট পেপার বাক্সে থুইয়া রাখছে। মাওলানা এখন ইন্ডিয়া কেন আইছে হেইডা কইবার পারেন? তাবিজ দেয়ার মৌলবি আপনেরা তারা বিপ্লবী লিডার বানাইছেন। (অলাত : ২৮৬)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘিরে সরব হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক রাজনীতি। পূর্ব পাকিস্তানে চলমান সামরিক অভিযানে পশ্চিম পাকিস্তানকে সমর্থন করে যুক্তরাষ্ট্র চীন। অপরদিকে ভারত, রাশিয়া একপক্ষ, এরা পূর্ববাংলার পক্ষে। বিষয়টি নিয়ে দাবার গুটি চালতে থাকেন রাজনৈতিক শক্তিধর দেশগুলো। অলাতচক্র উপন্যাসে আন্তর্জাতিক রাজনীতির স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে সত্যব্রত বাবুর সংলাপের মাধ্যমে। অনেকটা আফসোসের ভঙ্গিতে তিনি বলেন :

> আপনাদের দেশ এবং জনগণের ভাগ্য এখন আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। দুনিয়ার সমস্ত দেশ চাইবে আপনাদের উপলক্ষ করে দাবায় নিজের চালটি দিতে। মাঝখানে আপনারা চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবেন। আমার মনে হয় কী জানেন আপনাদের ওই শেখ মুজিব মানুষটি হাড়ে হাড়ে সুবিধেবাদী অথবা আস্ত একটি বোকারাম। কী সুবর্ণ সুযোগই না আপনাদের হাতে ছিল। (অলাত : ২৯২)

অনিমেষ বলেন :

> আমার অনুমানটি সত্যি হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভারতের যুদ্ধে পরিণত হবে। বাংলাদেশ হয়তো স্বাধীনতা পাবে কিন্তু কোন স্বাধীনতা? আখেরে জনগণের কোনো লাভ হবে না। দোদুল্যমান বিপথগামী নেতৃত্ব দেশের জনগণকে সম্পূর্ণ একটা অনিশ্চিয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে।(অলাত : ২৯২)

কেবল আন্তর্জাতিক রাজনীতি কেবল নয় যুদ্ধের বিষয়ে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নানা দিক উঠে এসেছে উদ্বাস্তু মানুষদের ঘরোয়া আড্ডার ছলে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশি বামপন্থীদের রাজনৈতিক দলগুলোর সিদ্ধান্তহীনতা, জাতীয় সংগ্রামে তাদের অংশগ্রহণে বিলম্ব প্রভৃতির আলোকপাত রয়েছে। সত্যব্রতবাবু বলেন :

> বাংলাদেশ সেন্টিমেন্ট এক্সপ্লয়েট করে শাসক কংগ্রেস এখানকার পরিস্থিতি এমন ঘোলাটে করে তুলে যে সত্যিকার বিপ্লবীদের চেহারা দেখানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ঠং করে পেয়ালাটা পিরিচের ওপর রেখে অর্চনা ঝংকার দিয়ে উঠল, সত্যব্রত তুমি বিপ্লবী কাদের বলছ! যারা মূর্তি ভেঙেছে, গ্রামগঞ্জের জোতদার মহাজনের গলা কেটেছে, চীনের চেয়ারম্যানকে আমাদের চেয়ারম্যান বলেছে, তারাই কি সত্যিকারের বিপ্লবী। আজকে তোমরা বাংলাদেশের ছেলেদের দায়ী করছ। তোমাদের বন্ধুরা অবগত আছেন বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার জন্য তারা কম দায়ী নয়। পশ্চিম বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন বাংলাদেশের আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে সবচাইতে বেশি। সে জন্য বাংলাদেশের বামপন্থী দলগুলো একটা সময় পর্যন্ত জাতীয় সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেনি। তোমাদের নেতাদের মতো তারাও বলেছে চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান! যেহেতু পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের বন্ধুত্ব আছে তাই বামপন্থী কতিপয় দল এখনো পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবকে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠে আসতে তোমাদের ভ্রান্ত নীতি কি সহায়তা করেনি? আগে নিজেদের দোষগুলো দেখো তারপরে বাংলাদেশের দোষ ধরতে যেয়ো। দুঃখ এই জায়গায়ে কেউ সহজ বিষয় সহজভাবে নিচ্ছে না। (অলাত : ২৯২-৯৩)

বাংলাদেশের মানুষ যখন রণাঙ্গনে তুমুল প্রতিবাদে চালিয়ে যাচ্ছে মুক্তি সংগ্রাম, শেখ মুজিব যখন জেলে তখন মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব থিয়েটার রোডের প্রবাসী সরকারের। কিন্তু সরকারের সকল সদস্য সক্রিয় ছিলেন না। কেউ কেউ আরাম-আয়েশে ওপার বাংলার দিন কাটানো শুরু করেন, কেউ বিরোধী দেশগুলোর সঙ্গে আঁতাত করে পাকিস্তানকে সহায়তা করতেন।

১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার ভবেরপাড়া গ্রামে বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে প্রথম বাংলাদেশের সরকারের মন্ত্রিপরিষদের শপথ অনুষ্ঠান গ্রহণ হয়। দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের

উপস্থিতিতে অনাড়ম্বর পরিবেশের আত্মপ্রকাশ করে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার। সৈয়দ নজরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তাজউদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রী তার তিন সহকর্মী ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী অর্থমন্ত্রী; আবু হেনা এম. কামরুজ্জামান-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী এবং খন্দকার মোশতাক-পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

খন্দকার মোশতাক আসলে প্রধানমন্ত্রী পদের প্রত্যাশী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তা হতে না পেরে তাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হবে এই শর্তে সরকারে যোগ দেন (আমীর-উল ১৯৯১ : ৪৮-৪৯) এই খন্দকার মোশতাক প্রবাসী সরকারে থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আঁতাত করেন।

খন্দকার মোশতাক অঅহমেদ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে কৌশলে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন পাকিস্তান ও মার্কিন সরকারের স্বার্থরক্ষার কাজে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদবির প্রতি বিশেষ আগ্রহের কারণ এই কার্যকলাপ থেকেই অনুমান করা য়ায়। মুক্তিসংগ্রামকে ধ্বংস করে কনফেডারেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে পুনরায় পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত করার জন্য তিনি সুচতুর চাল চালেন। মুক্তিযুদ্ধকে দ্বিধাবিভক্ত করার জন্য তিনি একটি ভাবাবেগপূর্ণ প্রশ্ন উপস্থাপন করেন। 'স্বাধীনতা চাও, না মুজিবকে চাও?' যদি স্বাধীনতা পেতে হয় তাহলে মুজিবকে পাবে না এবং মুজিবকে পেতে হলে স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিসর্জন দিতে হবে। এই ছিল পৃষ্ঠপোষক মার্কিন সরকারের তরফ থেকে পেশ করা তার যুক্তি। এর জবাবে তাজউদ্দিন আহমদ বলেছিলেন, 'স্বাধীনতাও চাই, মুজিবকেও চাই। স্বাধীনতা এলেই মুজিবকে পেতে পারি। (তাজউদ্দীন ১৯৭২ : ২৮৬)

মোশতাক আহমদের এই দেশবিরোধী তৎপরতার কথা উল্লেখ আছে অলাতচক্রে। নরেশের জবাবে তার প্রমাণ পাওয়া যায় :

> খোন্দকার মুশতাক আহমেদ। মুশতাকের মতো তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানুষও তোমার আলোচনার বিষয় হতে পারে, এতো আমি কল্পনা করতে পারিনি। হলই বা ভারতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের বিদেশমন্ত্রী। আমি তো তোমাকে আরো ওপরের তরিকার মানুষ বলেই মনে করতাম। খুরশিদের মেজাজের কোনো পরিবর্তন হলো না। সে প্রায় ধমক দেয়ার সুরে বলল, আরে মশায় শুনবেন তো শালার ব্যাটা শালা, নেড়ি কুত্তার বাচ্চা কী কাণ্ডটা করে বসে আছে। এইখানে এই কলকাতায় বসে বসে বেটা হেনরি কিসিঞ্জারের সঙ্গে এতকাল যোগাযোগ করে আসছিল। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামী হিনেবে ভান করে মুক্তিসংগ্রামকে পেছন থেকে ছুরিকাত করাই ছিল তার প্ল্যান। তলায় তলায় আমেরিকার মাধ্যমে পাকিস্তানের সঙ্গে আপসের চেষ্টা করছিল। শালা, মেনি বিড়াল কোথাকার। ফন্দি টন্দি এঁটে জাতিসংঘে

> বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার নাম করে ভারত থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলেই ঝুলির ভেতর থেকে সবগুলো বেড়াল করবে এটাই ছিল তার ইচ্ছা। মাঝখানে ভারতের ইনটিলিচেন্স তার সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা উদঘাটন করে ফেলেছে। তাজুদ্দিন তার নিউইয়র্কে যাওয়া আটকে দিয়েছেন। (অলাত : ৩০৫)

তাজউদ্দীন আহমদের সিদ্ধান্তে খন্দকার মোশতাক নিউইয়র্কে যেতে পারেননি। তার পরিবর্তে বিচারপতি আবু সাঈদের নেতৃত্বে আট সদস্যের প্রতিনিধি দল নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশে রওয়ানা হন (ফজলুল ১৯৯৩ : ৪৩)

প্রবাসী সরকারের নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষোভ ছিল সে সময়ে দেশ থেকে কলকাতায় ঠাঁই নেওয়া মানুষদের। ক্ষোভের সঙ্গে ক্যাপ্টেন হাসান বলে :

> ক্যাম্পে থাকলে তবু ভালো থাকি। ছেলেদের সঙ্গে এককরম দিন কেটে যায়। কিন্তু কলকাতা এলে মাথায় খুন চেপে বসে। ইচ্ছে জাগে এই ফর্সা কাপড় পড়া তথাকথিত নেতাদের সবটাকে গুলি করে হত্যা করি। এ্যায়সা দিন নেহি রহেগা। একদিন আমরা দেশে ফিরে যাব। তখন এই সবকটা বানচোতকে গাছের সঙ্গে বেঁধে গুলি করে মরাব। দেখি কোন বাপ সেদিন তাদের উদ্ধার করে। কলকাতায় নরম বিছানায় ঘুমিয়ে পোলাও কোর্মা খাওয়ার মজা ভালো করে দেখিয়ে দেব। (অলাত : ৩০৫)

প্রবাসী সরকারের সদস্যরা নিষ্ক্রিয় থাকলেও একমাত্র তাজউদ্দিন আহমদ চেষ্টা করেছেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে। তিনি যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কলকাতায় থেকে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করেছিলেন।

৩ এপ্রিল ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলে তিনি মুক্তিবাহিনীর পর্যাপ্ত ট্রেনিং, শরণার্থীদের খাওয়া-দাওয়া, আবাসের ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় সুবিধা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। একইসঙ্গে দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করেছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা বাংলাদেশকে অর্জন করতে হবে। আমরা চাই ভারত এতে জড়াবে না। আমরা চাই না ভারত তার সৈন্য দিয়ে অস্ত্র দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা দিক। এই স্বাধীনতার লড়াই নিজেদের এবং আমরা এটি নিজেরা করতে চাই। (শারমিন ২০১৪ : ১১২)। এছাড়া তাজউদ্দিন আহমদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধী সংসদ সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন যাতে মার্কিন সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতি বিরোধীরা চাপ প্রয়োগ করতে পারে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাজউদ্দিন আহমদ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন উপন্যাসে তার উল্লেখ আছে।

দানিয়েলের মনোভাবে প্রকাশ পায় প্রবাসী সরকারের একমাত্র দায়িত্বশীল নেতা তাজউদ্দিন আহমদের চেষ্টার কথা :

থিয়েটার রোডর লোকদের বিরুদ্ধে এ সব নালিশ নতুন কিছু নয়। সবাই নালিশ করে। কিন্তু তাদের করবার ক্ষমতা কতদূর তা নিয়ে কেউ বিমেষ চিন্তাভাবনা করে বলে মনে হয় না। আমি মনে মনে তাজুদ্দিনের তারিফ করি। ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। আমার বিশ্বাস সবদিক চিন্তা করে দেখার ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু তিনি কতদূর কী করবেন। আওয়ামী লীগারদের মধ্যে অনেকগুলো উপদল। ভারত সরকার একটা উপদলকে হাতে রাখার চেষ্টা করছে। আবার তাদের অনেকেই তাজুদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রিত্বের আসন থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে। পাকিস্তানি এবং আমেরিকান গুপ্তচররা এখানে ওখানে ফাঁদ পেতে রেখেছে। তাদের খপ্পড়ে আওয়ামী লীগারদের একটা অংশ যে পড়ছে না, একথা সত্যি নয়। এই প্রবাসে অন্য একটি সরকারের দয়ার ওপর নির্ভর করে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত গয়েছে। ভারত সরকারের মর্জি মেজাজ যেমন মেনে চলতে হয়, তেমনি অজস্র উপদলীয় কোন্দলের মধ্যে সমঝোতাও রক্ষা করতে হয়। ভারত সরকারের বিশেষজ্ঞদের আবার একেকজনের একেক মত। কেউ কেউ মনে করেন একদলকে হাতে রাখলে ভালো হবে। আবার আরেকজন মনে করেন আখেরে, এই উপদলের টিকে থাকার ক্ষমতা নেই। সুতরাং অন্য দলকে ট্রেনিং, অস্ত্রশস্ত্র টাকা পয়সা দিলে উপকার হবে। দেশের জনগণের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত অবস্থায় সবকটি উপদলই মনে করছে তারাই প্রকৃত ক্ষমতার দাবিদার। কোনো নেতা ক্ষমতা দাবি করেছেন, কেননা তিনি শেখ মুজিবের আত্মীয়। আরেক নেতা ক্ষমতা দাবি করেছেন, কারণ তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মীয়দের দুচোখে দেখতে পারেন না। হয়তো আরেক নেতা মনে করে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরোধিতা করেন বলেই ক্ষমতা অধিকার করতে চান। ধৈর্য ধরে সবকিছু দেখে যাওয়া ছাড়া তাজুদ্দীনের করবার কী আছে? (অলাত : ৩০৬)

দেশে যুদ্ধ চলছে এদিকে সরব আন্তর্জাতিক ও ভারতীয় রাজনীতি। যেখানে যায় দানিয়েলের কানে আসে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, যুদ্ধের প্রসঙ্গ। সবদিক আলোচনা :

ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ হিন্দু মুসলমান চীন রাশিয়া আমেরিকা, বাঙালি-অবাঙালি, শেখ মুজিব ভাসানী, ইন্দিরা গান্ধী নকশাল কংগ্রেস সি.পি. এম এ সকল বিষয় বারবার ঘুরে ঘুরে আসছে। আমি যেখানেই যাই সেখানেই মাটি ফুঁড়ে একটি বিতর্ক জেগে ওঠে। আমার জন্মই যেন একটা মস্ত বড় বিতর্কের বিষয়। আমি যদি জন্ম না নিতাম, এতগুলো মানুষ দেশ ছেড়ে ভারতে আসত না, তায়েবার অসুখ হত না, যে সকল সংকট সমস্যা পৃথিবীর স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহের গতিরোধ করে দাঁড়িয়েছে তার কিছুই ঘটনা তা। দুনিয়াতে যেখানে যা কিছু ঘটছে তার জন্য যেন আমি দায়ী। (অলাত : ৩২৪)

যুদ্ধের যে বাস্তবতা দাঁড়িয়েছে তাতে বাংলাদেশকে নির্ভর করতে হবে ভারতের করুণার প্রতি। দেশের কোথাও কিছু যেন নেই, সবকিছুই ভাসছে শূন্যের ওপর। ক্যাম্প হাজার হাজার তরুণ ট্রেনিং নিচ্ছে,

মৃত্যুর জন্য সরল প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু সেখানেও প্রবাসী সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন না মুক্তিকামী যোদ্ধারা। তাদের পিছে ভয় থাকে যদি ভারতের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অন্যরকম কিছু বলে ফেলেন। উপন্যাসে এই বাস্তবতা উঠে এসেছে :

> ক্যাম্পে গেলে সকলেই থিয়েটার রোডের কর্তাব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গালাগাল করে। মক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে গণপ্রতিনিধিদের সংযোগ সমন্বয় খুবই ক্ষীণ। তাঁরা যে ক্যাম্প পরিদর্শন করতে যান না তাও ঠিক নয়। মাঝে মাঝে সরকারের তরফ থেকে কেউ না কেউ যান। সবসময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর একেকজন না একজন তাঁদের সঙ্গে থাকেন। বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিরা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে পারেন না। ইচ্ছে থাকলেও অনেক সময় পারেন না। তাঁদের অবচেতন মনে সবসময় একটা ভীতি কাজ করে। যদি বেফাঁস কিছু বলে ফেলেন, যদি ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্তাব্যক্তিরা তাঁদেরকে অন্যরকম কিছু মনে করেন। গণপ্রতিনিধিদের এই আঁটোসাঁটো দায়সারা মনোভাব মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাদের বেশির ভাগ আশা করে তারা যেভাবে প্রাণ দেয়ার জন্য একপায়ের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের যাঁরা নেতা তাঁদের মধ্যে সেরকম খাঁটি জঙ্গি মনোভাব দেখতে পাবে। তার বদলে নাদুসনুদুস নেতারা স্নো-পাউডারচর্চিত মুখমণ্ডল এবং স্নিগ্ধ তেলঢালা শরীর নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পেছন পেছন হাজির হয়ে জনসভায় বক্তৃতার ঢঙয়ে হাত উঠিয়ে শেখ মুজিবের কণ্ঠস্বও নকল করে বলতে থাকেন, ভাইসব তোমরা বাংলা মায়ের দামাল ছেলে। তোমরাই বাংলা জননীকে মুক্ত করবে। সেই দামাল ছেলেরা তখন তাঁদের অপেক্ষাকৃত নিচু স্বরে শালা বানচোত বলে গালাগাল করে। (অলাত : ৩৩৮)

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্ব সংগ্রামের একেবারে শেষ মুহূর্তে শ্রেণিগত দোদুল্যমানতা' ত্যাগ করতে পারেনি। তার অনির্বার্য পরিণতি হয় পাকিস্তানি শাসকদের হাতে আত্মসম্পর্ণ নয়, ভারতের বুকে আত্মসর্পণ করেন।

> আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসই করতে পারেননি যে তাঁরা সত্যি সত্যি পাকিস্তানি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো থেকে বাংলাদেশকে বের করে আনার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে একটি সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছেন। তাদের দৃষ্টি যদি পূর্ব থেকে স্বচ্ছ থাকত তাহলে সে সম্বন্ধে পূর্বপ্রস্তুতিও তাঁরা গ্রহণ করতেন। বাঁশের লাঠি দিয়ে ঘরে ঘরে দুর্গ তৈরির যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা ঘোষণার বদলে অন্য কোনো কার্যকর পন্থা অবলম্বন করতেন। (ছফা ১৯৭৭ : ১৬)

যুদ্ধ চলছে, তারপরও বিশৃঙ্খলা চারদিকে। প্রবাসী সরকারের সকল সদস্যের মধ্যে মিল নেই। মিল নেই মুক্তিযোদ্ধাদের মতো। বিশৃঙ্খলভাবে চলছে যুদ্ধ, যে যার মতো প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন। আহমদ ছফা উপন্যাসে উল্লেখ করছেন :

> মুক্তিযুদ্ধের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং সেক্টর কমান্ডারদের মধ্যে সবসময় ঝগড়া বিবাদ লেগেই আছে। সর্বাধিনায়ক বুড়ো জেনারেল ওসমানী সত্যিকার যুদ্ধের চাইতে মিলিটারি আদব কায়দার প্রতি অত্যধিক যত্নশীল। যুদ্ধের কাজের অগ্রগতির চাইতে তার হুকুম পালিত হলো কি না প্রায় সময়ে সেটাই তার মনোযোগের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। সর্বাধিনায়ক এবং সেক্টর কমান্ডারদের মধ্যে মতবিরোধ কোনো কোনো সময়ে এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় যে ওসমানী সাহেব তার দীর্ঘ গোঁফে তা দেয়া ছাড়া অন্যকিছু করার আছে সে কথা চিন্তা করতে পারেন না। যে যার মতো যুদ্ধের পরিকল্পনা করছেন, কারো পরিকল্পনার সঙ্গে কারো পরিকল্পনা মিলছে না। প্রায় সময়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। ভারতীয়রা বাংলাদেশ কমান্ডারের সঙ্গে কোনোরকমের যোগাযোগ না করে বাংলাদেশী যুবকদের আলাদা ট্রেনিং দিয়ে যাচ্ছেন। এ নিয়ে সমস্ত ক্যাম্পে ক্ষোভ এবং অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। ওটা কেন ঘটছে থিয়েটার রোডে তাজুদ্দীন সাহেবের কাছে সংবাদ পাঠিয়েও কোনো সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। (অলাত : ৩৩৮)

এ ছাড়া আওয়ামী লীগ দলের মধ্যে সৃষ্ট উপদল থাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হিমশিম অবস্থা দেখা দেয়। তাজউদ্দীন আহমদের প্রতি উচ্চাভিলাসী নেতারা বিরক্ত। উপন্যাসে আছে :

> থিয়েটার রোডের অস্থায়ী সরকারের কার্যালয়ে তাজুদ্দীন সাহেব যে খুব সুখে আছেন, সে কথা ঠিক নয়। আওয়ামী লীগ দলটির মধ্যে কোন্দলের অন্ত নেই। তাজুদ্দীন সাহেব অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় আওয়ামী লীগের উচ্চাভিলাসী নেতাদের অনেকেই তার ওপর বিরক্ত। সুযোগ পেলেই তাকে ল্যাং মারার তালে আছে। ভারত সরকার তাজুদ্দীন সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী মেনে নিয়েছে বটে, কিন্তু তিন যে গোটা পরিস্থিতিটা সামাল দিতে পারবেন তার ওপর এই আস্থা ইন্দিরা স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধীরও নেই। ভারত সরকার তাজুদ্দীন বিরোধীদেরও হাতে রাখার চেষ্টা করছে। (অলাত : ৩৩৮)

তাজউদ্দীন আহমদ অসহায়। তাকে প্রধানমন্ত্রীত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ভারতের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হচ্ছে। তাকে ভারতের ওপর নির্ভরশীল হতে হচ্ছে। স্বাধীনভাবে নিজে কিছু করার নেই। সবসময় ভারত যা বলছে, যা করছে, যা চাপিয়ে দিচ্ছে তাই মেনে নিতে হচ্ছে তাজউদ্দীনকে। একাত্তরের যুদ্ধের বাস্তবতায় ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক অবস্থান প্রাথমিকভাবে স্পষ্ট ছিল না সে কথার প্রমাণ পাওয়া যায় অলাতচক্রে :

> ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী কী করতে যাচ্ছেন কেউ জানে না। ভারতীয় জনমত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অনুকূলে এবং বেশিরভাগ ভারতীয় জনগণ চায় শ্রীমতি গান্ধী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে অনতিবিলম্বে স্বীকৃতি প্রদান করুক। কিন্তু যুদ্ধ করতে বললে তো যুদ্ধ করা যায় না। শ্রীমতি অত্যন্ত সন্তর্পণে অগ্রসর হচ্ছেন। বিশ্বজনমত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরতার শিউরে উঠেছে একথা সত্যি। কিন্ত শুধুমাত্র বিশ্বজনগণের সহানুভূতির ওপর নির্ভর করে শ্রীমতি গান্ধী একটা যুদ্ধ কাঁধে নিতে পারেন না। (অলাত : ৩৩৯)

কারণ পাকিস্তানের পক্ষে আমেরিকা আছে, আছে চীন। এই দুটো শক্তিশালী দেশ বারবার নালিশ করে আসছে ভারত পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলার জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের একাংশকে ডেকে নিয়ে অনর্থক গণ্ডগোল পাকিয়েছে। মুসলিম দেশগুলোর অধিকাংশ পাকিস্তানের পক্ষে আমেরিকা, আছে চীন। মুসলিম দেশসমূহের অধিকাংশ পাকিস্তানের অবস্থানকে সমর্থন করে। চীন আমেরিকা যদি পাকিস্তানের পক্ষে সমওে এগিয়ে আসে তাহলে একটা বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা রয়েছে। ভারত কি বাংলাদেশের জন্য বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি কাঁধে নিতে পারে। বোধ করি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী চাইছিলেন 'যুদ্ধ ছাড়া বাংলাদেশের সংকটের একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান হোক।'

ইন্দিরা গান্ধীর শান্তিপূর্ণ সমাধান চাওয়ার বাস্তবতার পেছনে রয়েছে শরণার্থী সমস্যা। কারণ ভারত জাতি হিসেবে নানা সমস্যায় আক্রান্ত। পাকিস্তানের আক্রমণের ফলে যে সব হিন্দু ও মুসলমান দেশ ছেড়ে এসেছে তাদেও ফেরত পাঠানোর বিষয়ে এক ধরনের অনিশ্চয়তা রয়ে যায়। ইন্দিরা গান্ধীর মনে এই চিন্তা উদয় হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, কোনোভাবে পাকিস্তানের সংকট মীমাংসা হলে পাকিস্তান যদি বিরাট সংখ্যক হিন্দুকে ফেরত না নেয় তাহলে বাড়তি জনসংখ্যার চাপ মোকাবিলা করতে গিয়ে ভারতকে হিমশিম খেতে হবে। ইন্দিরা গান্ধীর মনোভাব :

> পূর্ব-পাকিস্তান থেকে প্রায় এক কোটির বেশি মানুষ ভারতে চলে এসেছে। তার মধ্যে প্রায় আশি লক্ষ হিন্দু। যদি তাড়াতাড়ি কিছু একটা সমাধান খুঁজে বের করা না হয়, যে সকল মুসলমান ভারতে এসেছে তাদের অনেকেরই মনোবল ভেঙে যাবে। অন্যদিকে ইয়াহিয়া খান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে শরণার্থীদের ডাকছে তোমরা ফিরে এসো। কোনো ভয় নেই। একটা সময় আসতে পারে মুসলমানদের বিরাট অংশ দেশে ফিরে যেতে চাইবে। তখন ভারত অনেক নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যাবে। যা কিছু করার তাড়াতাড়ি করে ফেলতে হবে। যদি ভারত একটা যুদ্ধ মাথায় নেয় চীন আমেরিকা যে পাকিস্তানের সপক্ষে ছুটে আসবে না সে ব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এখনো নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। একটা পুরোদস্তর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পাকিস্তানিদের বন্ধুদের চাপে যদি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে হয়,

> ভারতের লোকসান হবে অনেক বেশি। তখন পাকিস্তান এই আশি লক্ষের মতো হিন্দুকে ফেরত নিতে চাইবে না। আশি লক্ষ বাড়তি মানুষের চাপ সহ্য করতে গিয়ে ভারতের দম বেরিয়ে যাবে। শ্রীমতি গান্ধী একটা বিরাট মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছেন,যদি তার আচার-আচরণে সে কথা বোঝার উপায় নেই। (অলাত : ৩৩৯)

কেবল ইন্দিরা গান্ধীর মনোভাব নয়, এখানে পাকিস্তানি শাসক ইয়াহিয়া খানের মনোভাবও উঠে এসেছে। ইয়াহিয়া খানের ধারণা পূর্ব-বাংলার মানুষদের অন্যতম সমস্যা হিন্দু সমস্যা। পূর্ব-বাংলায় প্রায় এক কোটি হিন্দু বাস করে। এদের কারণে পূর্ব-বাংলায় বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ইয়াহিয়া খান বিশ্বাস করেছেন, এই এককোটি হিন্দুদের দেশ ছাড়া করতে হবে। তারা দেশের বাইরে গেলে পূর্ব-বাংলায় ইসলামী পরিবেশ ফিরে আসবে। হিন্দুদের বাড়ি-ঘর জমিজমা দখলে নিয়ে বিচ্ছিন্নবাদীরা আন্দোলনের কথা ভুলে যাবে। তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের সংকট প্রায় সমাধান করে ফেলেছেন।

> ইয়াহিয়া খান মাতাল হলে তাঁর হিসেব খুবই পরিষ্কার। শেখ মুজিবুর রহমানকে তিনি কারাগারে পুরেছেন। থাকুক আরো কিছুদিন। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। যদি ইয়াহিয়া খানের কথা মানতে রাজি হন, ছেড়ে দেবেন। আর যদি বেঁকে বসেন দেশদ্রোহী হিসেবে ফাঁসিতে লটকে দেবেন। আওয়ামী লীগের যে অংশটা দেশে আছে, তার একটা অংশকে খুন করা হয়েছে আর একটা অংশকে জেলে পোরা হয়েছে আর একটা অংশকে সরাসরি তাবেদারিতে পরিণত করা হয়েছে। সুতরাং দল হিসেবে পূর্বপাকিস্তানে আওয়ামী লীগের মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। (অলাত : ৩৪১)

আরো আছে :

> ইয়াহিয়া খান গ্লাসের পর গ্লাস শ্যাম্পেন খালি করছেন। আর ভাবছেন তাঁর মতো সুদক্ষ জেনারেল আর প্রতিভাবান নেতা এই পৃথিবীতে বেশি নেই। তার যোগ্যতার প্রমাণ, তিনি বোতলের পর বোতল নিঃশেষ করে ফেলতে পারেন। তাঁর সমস্ত জাগতিক বিষয়ে সংজ্ঞা লোপ হওয়ার পরেও একটা জিনিস মনের মধ্যে ধ্রুবতারার মতো জ্বলতে থাকে। (অলাত : ৩৪১)

পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি পশ্চিম পাকিস্তানের নাগালের বাইরে চলে যেতে শুরু করে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা পালিয়ে যাচ্ছেন। ভারতের পত্রিকায় সে খবর প্রকাশ হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধী মনস্থির করে ফেলেছেন বোধ করি তাকে একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হবে। তার কথাবার্তা, বিবৃতি, ভাষণের মধ্যে এরকম ইঙ্গিত পরিষ্কার হতে শুরু করে।

মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের বেগও তীব্র হয়ে উঠছে। কলকাতার পত্রিকাগুলো খবর দিতে আরম্ভ করেছে, মুক্তিযোদ্ধারা ভারী অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে। পাউরুটির ভেতর ছুরির মতো পাকিস্তানি সৈন্যরা বেষ্টনী ভেদ করে তারা দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে। পাকিস্তান রেডিও এ কথা স্বীকার করে নিয়েছে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানরা ছদ্মবেশে পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ করে নাশকতামূলক কাজকর্ম করে পালিয়ে যাচ্ছে। বিবিসি এবং ভয়েস আমেরিকাও বলতে আরম্ভ করেছে মুক্তিযোদ্ধারা সত্যি সত্যি দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে এখানে সেখানে অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছে। আইয়ুব খানের সময়ের গভর্নর আবদুল মোনায়েম খানকে মুক্তিযোদ্ধারা বাড়িতে ঢুকে গ্রেনেড ছুড়ে হত্যা করেছে। ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া, রংপুর, টাঙ্গাইল, খুলনা বরিশাল এ সকল অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠেছে। টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীর ঝটিকা আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী পিছু হটে এসেছে। বিবিসির সংবাদদাদা আরো খবর দিয়েছে পাকিস্তানি সৈন্যভর্তি লরিগুলো দিনেরাতে সীমান্ত অভিমুখে ছুটছে। সৈন্যরা সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায় বাঙ্কার নির্মাণ করছে এবং ট্রেঞ্চ কাটছে। (অলাত : ৩৪৫)

এরইমধ্যে একদিন শ্রীমতি গান্ধী সোভিয়েত রাশিয়া সফরে গেলেন। ভারত এবং রাশিয়ার ঘনিষ্ঠতা অনেক বেড়ে গেছে সেটা আগে থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। রাশিয়ার কথাবার্তার মধ্যে ভিন্ন সুর লক্ষ করা যাচ্ছিল। ইন্দিরা গান্ধী রাশিয়া সফরের পর রাশিয়ান নেতাদের মন্তব্যের ধরনও পালটে গেল। ভারত এবং রাশিয়ার মধ্যে একটা বন্ধুত্ব চুক্তি হয়ে হয়েছে। দুইদেশের যে যুক্ত ইশতেহার প্রকাশিত হয়েছে তাতে প্রথমবারের পূর্ব পাকিস্তানের বদলে পূর্ব-বাংলা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী রাশিয়া সফর হয় তিনি গেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে। যুক্তরাষ্ট্র সফরে ইন্দিরা গান্ধী খুব সুবিধা করতে পারলেন না। এরপর তিনি পশ্চিম জার্মানি সফর করলেন। তারপর ফ্রান্স এবং সবশেষে ইংল্যান্ড। ওইদিকে পাকিস্তানও বসে নেই। ইয়াহিয়া খান চীন-মার্কিন পুনঃস্থাপনে দুতিয়ালি করেছেন। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে হেনরি কিসিঞ্জার গোপনে উড়ে বেইজিং-এ পৌঁছেছেন।

ইয়াহিয়া খান জুলফিকার আলী খান ভুট্রো সাহেবের নেতৃত্বে চীনে একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছেন। চীনা নেতারা ভোজসভায় অনেক ভালো ভালো কথা বলেছেন। খোদ চৌ এন লাই আশ্বাস দিয়েছেন পাকিস্তান যদি ভারত কর্তৃক আক্রান্ত হয় চীন পাশে এসে দাঁড়াবে। ভুট্টো সাহেব দেশে ফিরে এসে সাংবাদিকদের বলেছেন, তার চীন সফর শতকরা একশ ভাগ ফলপ্রসূ হয়েছে।

দানিয়েলের দৃষ্টিকোণ থেকে ঔপন্যাসিক পরিস্থিতি বর্ণনা করছেন এভাবে :

ভারত পাকিস্তানে সাজো সাজো রব চলছে। বাংলাদেশ ভারতের নৌকায় পা রেখেছে। সুতরাং ভারত যা করে বাংলাদেশকে অম্লানবদনে মেনে নিতে হবে। তারপরেও ভারতে প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। বাঙালি জাতির স্বাধীনতার জন্য, বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিক প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত একটি যুদ্ধ ঘাড়ে তুলে নিচ্ছে। ভারতের স্বার্থ থাকে থাকুক। কিন্তু আমরা আমাদের দেশে ফিরে যেতে চাই এবং মাতৃভূমিকে স্বাধীন দেখতে চাই। তারপরও একটা প্রশ্ন যখন মনফুঁড়ে জেগে ওঠে, নিজের কাছে নিজেই বেসামাল হয়ে পড়ি। বাংলাদেশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উনিশশো আটচল্লিশ থেকেই সংগ্রাম করে আসছে। আসন্ন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ কি বাঙালি বিগত বাইশ বছরের রক্তাক্ত সংগ্রামের একমাত্র ফলাফল? এই যুদ্ধে হয়ত ভারত জয়লাভ করবে এবং ভারতের সহযোগিতায় আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হব। আমাদের সংগ্রামের এই পরিণতি। এটাই কি আমরা চেয়েছিলাম। (অলাত : ৩৪৬)

এটি ঐতিহাসিক সত্য যে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে। যুদ্ধে না গিয়ে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পাকিস্তানকে কাবু করা ছিল ভারতের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু দিন গড়াচ্ছে, ভারত-পাকিস্তান আলোচনা করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ভারতকে একাধিক কারণে যুদ্ধের পথ বেছে নিতে হয়। যুদ্ধের বিস্তৃতি দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার বাস্তবতা ভারতকে যুদ্ধে নামাতে বাধ্য করে।

বংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অত্যাচারে এবং স্বাধীনতার প্রতি দুর্দমনীয় স্পৃহায় ছোট ছোট প্রতিরোধকাহিনি জন্মলাভ করেছিল। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন যথেষ্ট রকমের মুষ্টিমেয়, চরিত্রে অনেক বেশি দৃঢ় ও প্রত্যয়সমৃদ্ধ এবং সমাজদর্শনের দিক দিয়ে অনেক বেশি প্রাগ্রসর। তাঁরা নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর ছোটখাটো হামলা পরিচালনা করেছিলেন। দখলদার পাকিস্তানি সৈন্যেও বর্ণনাতীত অত্যাচারের মুখে তাদের সংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধিলাভ করার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। তারা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে যেমন, তেমন ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বিরোধিতা করতেন। অনেকগুলো স্থানে ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে তাদের সরাসরি সংঘর্ষ হয়েছে। যতই দিন যাচ্ছিল ততই তাদের সংখ্যা বাড়ছিল। এভাবে যুদ্ধটি যদি গণযুদ্ধের আকারে ভিয়েতনামের মতো ছড়িয়ে পড়ে তাহলে ভারতের সমূহ সর্বনাশ। (ছফা ১৯৭৭ : ৪১-৪২)

তায়েবা একসময় যে বাংলাদেশে সংগ্রামের উষ্ণ নিশ্বাস হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল, আজ কলকাতার হাসাপাতালে সকলের অগোচরে মারা যাচ্ছে। উপন্যাসের প্রথমে যে তায়েবার কথা এসেছিল, উপন্যাসের শেষে লেখক আবার সেই তায়েবার প্রসঙ্গে এলেন। দিন ঘনিয়ে আসছে, তায়েবার সামনে মৃত্যু এখন অনিবার্য সত্য। দানিয়েল জানাচ্ছে :

আমরা জানতাম সে মারা যাবে। মারা যাবার জন্যই তো সে কলকাতা এসেছে। যুদ্ধ দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে। আমি ধরে নিয়েছিলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী আর তায়েবাকে এখানে রেখে যেতে

হবে। তায়েবা অত্যন্ত শান্তভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিল। স্বাভাবিক মানুষ যেমন করে জীবনের কর্তব্যগুলো পালন করার জন্য নিতান্ত সহজভাবে সংকল্প গ্রহণ করে, সেও তেমন আসন্ন মৃত্যুর কাছে মনপ্রাণ সবকিছু সমর্পণ করে প্রতীক্ষা করছিল। (অলাত : ৩৫৬)

উপন্যাসের শেষে উল্লেখ আছে :

> ডিসেম্বরের চার তারিখ ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ঐদিন সন্ধে থেকে সকাল পর্যন্ত গোটা কলকাতা শহরে বিমানহামলার ভয়ে কোনো আলো জ্বলেনি। সেই ব্ল্যাক আউটের রাতে তায়েবার কাছে কোনো ডাক্তার আসতে পারেনি। কোনো আত্মীয়স্বজন পাশে ছিল না। ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের কারণে যে অন্ধকার কলকাতা শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল সেই অন্ধকারের মধ্যে তায়েবা আত্মবিসর্জন করল। (অলাত : ৩৫৬)

উপন্যাসের তায়েবা চরিত্রকে যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন বলে ধরে নেওয়া যায় তাহলে উপন্যাসের ভাববস্তু পরিষ্কার হয়। যুদ্ধের আড়ালে, যুদ্ধের মানবেতর জীবনযাপনের মধ্যে আহমদ ছফা কী বোঝাতে চাইলেন। সীমান্তের ওপারে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলে গেছে। এই দৃশ্যকে তায়েবার পায়ে হেঁটে হাসপাতালে যাওয়ার সঙ্গে লেখক মিলেছেন। ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের দিন তায়েবার মারা যাওয়া এটি কি স্বাধীনতার স্বপ্ন অন্য দেশের ওপর চলে যাওয়াকে ইঙ্গিত দেয় না। এখানে তায়েবার মৃত্যু শব্দের জায়গায় আত্মবিসর্জন কেন? তার মানে এই শব্দটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যুদ্ধে ভারত জড়িয়ে গেল, দেশ স্বাধীন হবে সত্য কথা। কিন্তু স্বাধীনতার প্রকৃত প্রচেষ্টা হাতবদল হয়ে গেল। তায়েবার মৃত্যু মানেই স্বাধীনতার প্রকৃত স্পৃহার আত্মবিসর্জন।

তথ্যসূত্র

নূরুল আনোয়ার, *ছফামৃত*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা ২০১০

নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত, *আহমদ ছফা ছফা রচনবলী*, খান ব্রাদাস অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা ২০০৮

সলিমুল্লাহ খান সম্পাদিত, *আহমদ ছফার উপন্যাসমগ্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

মোমেনূর রসুল, *আহমদ ছফার উপন্যাসে সমাজ ও রাজনীতি*, সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ ৪৯, সংখ্যা ১, কার্তিক ১৪১৮, অক্টোবর ২০১১

শারমিন আহমদ, *তাজউদ্দীন আহমদ নেতা ও পিতা*, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪

নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত, *আহমদ ছফার রাজনৈতিক অরাজনৈতিক প্রবন্ধ*, ঢাকা, ২০০০

ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি*, কাগজ প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯১

তাজউদ্দিন আহমদ, *ইতিহাসের পাতা থেকে*, দৈনিক বাংলা, ডিসেম্বর ১৩, ১৯৭২

ফজলুল বারী, *একাত্তরে কলকাতা*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী ১৯৯৩

আহমদ ছফা, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা*, দিগন্ত প্রকাশনী, ১৯৭৭, ঢাকা।

গ. ব্যক্তির উত্থান-পতন (একজন আলি কেনানের উত্থান-পতন)

'একজন আলি কেনানের উত্থান ও পতন' (১৯৮৮) উপন্যাসে লেখক ইতিহাসের সময় পরিক্রমাকে ধারণ করেছেন। ইতিহাসের এই পরিধিকাল ছয় বছর। এই উপন্যাসে সময়কে কাজে লাগিয়ে বড় হয়ে ওঠা, সকলের মাঝে পরিচিত একজন মানুষকে রূপায়িত করেছেন। যিনি কিনা প্রভাব প্রতিপত্তি আর ক্ষমতার চর্চা করলেও একসময় হয়ে পড়েন সবচেয়ে অসহায়। আহমদ ছফা আলি কেনানের এই অসহায়দশার মাধ্যমে সামগ্রিক অর্থে একজন মানুষের ব্যর্থতার স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসকে এক নায়কের পরাজয়কে উপজীব্য করেছেন।

উপন্যাসে দেখা যায় আলি কেনান ঢাকার বুকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তার চারপাশে কিছু সুবিধবাদী মানুষ জোটে। যারা আলি কেনান সাম্রাজ্যের সুবিধা ভোগ করেছে। একসময় এই সব সুবিধাবাদী লোকজন আলি কেনানের মতো দরবেশের নাগালছাড়া হয়ে যায়, সুযোগ কাজে লাগিয়ে পালিয়ে যায়। আলি কেনান যখন গভীর পরিণতির মুখোমুখি সেই সব সুবিধাবাদী লোকদের কোনো খোঁজ থাকে না। যার যার আখের গোছানো নিয়ে ব্যস্ত সবাই। আলি কেনানের এই পতনের মূলে ছিল তার সুনির্ধারিত, সুনির্দিষ্ট কোনো আদর্শ না থাকা। রূপক পরিচর্যায় লেখক দেখিয়েছেন আদর্শ না থাকার যে সাম্রাজ্য তা ক্ষণস্থায়ী, তার পতন অনিবার্য।

ক্লেদ ও গ্লানির ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলে পৃথিবীর সকল জন্মপ্রক্রিয়া। কিন্তু সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে যদি ক্লেদকে সম্পূর্ণ অপসারণ করে শুদ্ধ হয়ে উঠবার প্রয়াস না থাকে, তাহলে একটি মহৎ জন্মও যে শেষাবধি ম্রিয়মান ও অর্থহীন হয়ে পড়ে। একজন আলি কেনানের উত্থান-পতনে এসে মেলে তারই প্রতীকী ও তাৎপর্যমণ্ডিত পরিচয়। (শাওয়াল ২০০৩ : ৩৫)

আলি কেনান ভূস্বর্গের রাজা থেকে জীবনের ভুলে পথের ফকিরে পরিণত হয়। এরপর সে ঢাকার এক মেসে আশ্রয় নেয়। সেখানে এক মেস মেম্বরের সঙ্গে ঝগড়া করে আলী কেনান পালিয়ে আসে। তখন চলছিন উনিশশো ঊনসত্তর সাল। দুইদিন না খেয়ে সে জীবিকার উপায় হিসেবে ভিক্ষার পথ বেছে

নেয়। একটিমাত্র সংলাপ দিয়ে শুরু হয়েছে উপন্যাস। ঔপন্যাসিক বলছেন : 'দে তর বাপরে একটা ট্যাহা'

> ভিখিরিরা সাধারণত ভিক্ষাদাদাকে বাপ ডাকে। আলী কেনা দাবি ছেড়ে বসল সম্পূর্ণ উল্টো। অর্থাৎ সে ভিক্ষাদাতার বাবা এবং একটা টাকা তাকে এক্ষুণি দিয়ে দিতে হবে। একেবারে যাকে বলে কড়া নির্দেশ। এই চাওয়ার মতো রীতিমত একটা চমক এসেছে। (আলি : ১৩৩)

আধঘণ্টা চিৎকারের পর একখানা সিকি পাওয়া গেলে ভিখিরি মনে করত সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে। আলি কেনান নিজের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে অতীতের অবস্থার তুলনা করে। আলী কেনানের অতীত অবস্থাকে প্রকাশের জন্য লেখক আশ্রয় নিয়েছেন ইসলামি মিথের, সেটি একবাক্যের একটি মিথ।

ইসলামি মিথ অনুসারে হযরত আদম হাওয়াকে নিয়ে সুখে বাস করছিলেন। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ না মানায় আদমকে স্বর্গচ্যুৎ করা হয়। আদম কৃতকর্মের অনুতাপ নিয়ে ধরাধামে বসবাস শুরু করেন। আলি কেনানেরও হয়েছে একই পরিণতি। আলি কেনান ভাবে 'বাবা আদমের মতো তাকেও স্বর্গ থেকে এই কষ্টের দুনিয়ায় ছুড়ে দেওয়া হয়েছে। এরপরই ঔপন্যাসিক বর্ণনা করছেন আলি কেনানের অতীত :

> আলি কেনান থাকত আলিশান বাড়িতে। সে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর সাহেবের একেবারে খাস পিয়ন। নামে পিয়ন বটে, কিন্তু দাপটে ছিল ভীষণ। গোটা গভর্নর হাউজে মাননীয় গভর্নরের পরে আলি কেনান ছিল সবচাইতে শক্তিশালী মানুষ। তার কাছ থেকে ছাড়পত্র না পেলে কারো পক্ষে গভর্নর সাহেবের কাছে পৌঁছার অন্য কোনো পথ ছিল না। আলি কেনান সেই সময়ে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর বিভিন্ন মহলে রীতিমতো কল্পনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। (আলি : ১৩৫)

'অদ্ভুত পরিস্থিতির কালে' খুলে যায় আলি কেনানের ভাগ্য। ভোলায় গিয়ে গভর্নর সাহেব একবার জনরোষের মুখে পড়েন। প্রশাসনের লোকজন পালিয়ে বাঁচলেন। নৌকায় বসা গভর্নর ইট-পাটকেলে আহত হলেন। সেই সময়ে নদী থেকে মাছ ধরা ডিঙি নৌকায় ফেরার পথে ঝুঁকি নিয়ে সেই যাত্রায় গভর্নরকে বাঁচায় আলি কেনান। আলি কেনানের এই কর্মের যথাযথ প্রতিদান দিলেন গভর্নর। নদীবেষ্টিত এক অঞ্চল থেকে 'সাহসী মানুষ' আলি কেনানকে উদ্ধার করে বসিয়ে দিলেন আলিশান কার্যালয়ে। মাটি-জলের, গ্রামীণ আলি কেনান এখন ইট-পাথুরের নাগরিক। 'ঢাকায় এসে গভর্নর

ভোলার সমস্ত পুলিশ অফিসারকে বরখাস্ত এবং মহকুমা হাকিমের বদলির নির্দেশ দিয়ে বসেন। আর আলী কেনানকে খাস পিয়ন হিসেবে গভর্নর হাউজে পাকাপোক্তভাবে বহাল করেন।'

আলি কেনান গভর্নরের প্রতি কৃতজ্ঞ বটে কিন্তু তার থেকে সে বেশি সুবিধাবাদী, আত্মলোভী, ক্ষমতাপরায়ণ, প্রতিশোধমুখি, স্বার্থবাজ। গভর্নর হাউজে বসে কেবল নিজের ভাগ্য বদল করেনি, আত্মীয়-স্বজন সবার ভাগ্য বদল করিয়ে দিয়েছেন। গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেছে ক্ষমতা। এই আলি কেনান রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে ধনী হওয়ার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা মানুষের প্রতিধ্বনি। আলি কেনান মানে একটা নষ্ট সময়ের নষ্টামির চর্চা। এই আলি কেনান মানে আমাদের সময়ে বিরাজমান এখনো অগণিত নষ্ট মানুষের প্রতিচ্ছবি।

ঢাকা শহরের হাজার মস্তান ও ফকিরের মতন এক মস্তান আলি কেনান। আলি কেনানের পূর্ব জীবনের কথা প্রকাশ করা হয়েছে গল্পের ভেতরে শোনা গুজবের বরাত দিয়ে। আলি কেনান এক সময় ছিল লাঠিয়াল- পৈত্রিক পেশা চরে চরে জমিদখল। ঔপনিবেশিক স্বৈরশক্তির নায়েব পাকিস্তানি গভর্নরের বিপদে একদিন কাজে এসছিল আলি কেনান। জনতার পাটকেলে হাবুডুবু গভর্নর-ধরুন মোনায়েম খাঁ তার নাম-নদীবক্ষে রক্ষা পান আলি কেনানের সাহায্যে। সেই কৃতজ্ঞতার উত্তরে আলি কেনানের যত উত্থান যত সম্পতি। এর জোরেই কেনানদের পারিবারিক পেশাটি আইনসম্মতভাবে সম্পত্তি অর্জনের উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

সদর আইয়ুব যেমন পিণ্ডি থেকে বাংলা মুলুক তাঁবে রাখতেন, আলিও কেমনি রাখত ঢাকার গভর্নর হাউস থেকে ভোলায় তার নিজ গ্রাম তামাপুকুর। (সলিমুল্লাহ ২০১৩ : ২৪৩)। ফোনের কথোপকথন যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে আলি কেনান তার আত্মীয় স্বজনকে সরকারি চাকরিতে ঢুকিয়ে দেয়। খুলে গেল আত্মীয়স্বজনের ভাগ্য :

> আলি কেনানের চাকুরিপ্রাপ্তির সুযোগে তার আত্মীয়স্বজনের প্রতাপ গ্রামে হাজার হাজার গুণ বেড়ে গেল। কারো টুঁ শব্দটি করার জো রইল না। আলি কেনান ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রীকে ধরে বিলকে বিল সরকারি খাসজমির বন্দোবস্ত নিয়ে ফেলল। আগেও তারা জোরেজবরে এ সব জমি ভোগদখল করত। তবে কাজটি অত সোজা ছিল না। দাঙ্গা হাঙ্গামা করে দখল নিতে হত। খুন জখম এ সব ছিল অনিবার্য ব্যাপার। অপরকে খুন করতে গেলে মাঝে মাঝে নিজেরও খুন হওয়ার ঝুঁকি সইতে হয়। থানা-পুলিশ করতে হত। মাঝে মাঝে মামলা হাইকোর্ট অবধি গড়াত। (আলি : ১৩৮)

আলি কেনান পরিবারকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। ছিল না। থানা পুলিশ সবাই চোখ বুজে থাকতেন। কেনানের প্রতিপত্তির কথা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। লোকমুখে এ কথা রটে গেছে, 'তার পরিবারের বিরাগভাজন হলে আলি কেনান লাটসাহেবকে বলে ফাঁসি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। গ্রামের লোকেদের ছিল জানের ভয়, আর আমলাদের চাকরি। বাড়তে থাকে আলি কেনান পরিবারের প্রতিপত্তি।

> আলি কেনানের বাবা পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হয়ে গেল। চাচাতো জ্যাঠাতো দুভাই মৌলিক গণতন্ত্রের সদস্য হয়ে বসল। তখন তাদের আর পায় কে? গোটা ইউনিয়নের সালিশ বিচার সবকিছু করার অধিকার আলি কেনানের পরিবারের একচেটিয়া হয়ে গেল। ঢাকার গভর্নর হাউজের অনুকরণে ভোলা মহকুমার তামাপুকুর গ্রামে একটি ক্ষুদ্র ক্ষমতাকেন্দ্র তারা তৈরি করে ফেলল। (আলি : ১৩৯)

কিন্তু স্বর্গের সুখ বেশিদিন সইল না। পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট সাহেবের কল সময়মতো গভর্নরের কাছে না দেওয়ার অপরাধে চাকরি গেল কেনান আলির। কেনান যেন স্বর্গচ্যুৎ হলেন। এরপর শুরু হয় আলির আরেকজীবন।

কেনান আলীর জীবনকে চার ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমভাগে রয়েছে, তার গ্রামের জীবন; দ্বিতীয়ভাগে রয়েছে গভর্নর হাউসে আরাম-আয়েশ আর ক্ষমতার জীবন এবং সেখান থেকে পতন; তৃতীয় জীবনে রয়েছে ধর্মকে কেন্দ্র করে ব্যবসা, তা থেকে আবার প্রতিপত্তি লাভ, ঢাকার বুকে ক্ষমতা বিস্তার করা; চতুর্থ জীবনে রয়েছে আবারো পতন। নিজ হাতে গড়া বালির সাম্রাজ্যকে ভেঙে দেয় আলি কেনানের সাগরেদরা।

গভর্নর হাউজ থেকে চাকরি চলে যাওয়ার পর আলি কেনান শুরু করে তৃতীয় জীবন। আলি কেনানের মনে হয়েছে বিগত জীবন সে স্বপ্নের মধ্যে কাটিয়েছে। কিন্তু এখন সে তামাপুকুর গ্রামের অভাজন, অখ্যাত আলি কেনান। গভর্নর হাউজ থেকে বেরিয়ে আলি কেনান সংকটে পড়ে। নিজে নিজে প্রশ্ন করে এখন সে যাবে কোথায়, ভোলায় নিজ গ্রামে ফিরে যাওয়ার কথা স্বাভাবিকভাবে তার মনে হয়েছে। কিন্তু আলি কেনান গ্রামে ফিরতে পারে না। আলি কেনানের মনোভাব :

> আর যদি ফিরে যায় মানুষ কাল হোক, পরশু হোক একদিন জেনে যাবে লাটসাহেব তাকে পাছায় লাথি দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। তখন অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? তার ভাইবেরাদররা যে সকল মানুষকে বিপদে ফেলেছে, শাস্তি দিয়েছে তারা তো বসে থাকবে না। আলি কেনানের সমস্ত কীর্তি তার চোখের সামনে

খসে পড়বে। সমস্ত জমিজমার পাল্টা দখল শুরু হয়ে যাবে। দুজন মানুষের লাশ তারা চরের মধ্যে পুঁতে রেখেছে। তারা জ্যান্ত হয়ে বদলা দাবি করবে। (আলি : ১৪১)

আলি কেনান 'শহরের পার্কে বসে আত্মহত্যার কথা চিন্তা করেছে। কিন্তু আজ লঞ্চ থেকে নামা যাত্রীর কাছ থেকে টাকাটি আদায় করতে পারায় আলি কেনানের চোখে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন ভিড় করে।' আলি কেনানের মতো মানুষ ভাঙবে মচকাবে না। পৃথিবী এখনো বাঁচার যথেষ্ট উপায় আছে। আলী কেনান নিজের 'সৃজনী শক্তি' কাজে লাগিয়ে ঢাকার ফুলতলিতে একটা বাঁধানো কবরে বসবাস শুরু করে। পোশাক-আশাকে দরবেশি ভাব তার। সুতরাং এই দরবেশি আদলকে কাজে লাগিয়ে আলি কেনান ফুলতলির কবরটিতে একদিন পাকা ঠিকানা পেতে বসল।

আলি কেনানের বিচরণক্ষেত্র অনেকদূর বিস্তৃত হয়েছে। কোনোদিন সে বাংলাবাজার সদরঘাট অঞ্চলে টাকা তুলতে যায়। কোনোদিন ইসলামপুর, আবার কোনোদিন নওয়াবপুর। টিপু সুলতান রোড হয়ে নারিন্দা অবধি সমস্ত এলাকাটিকে সে তার নিজের জমিদারি বলে মনে করতে আরম্ভ করেছে। একেকটি এলাকায় সে পনেরদিন অন্তর একবার দর্শন দেয়।' (আলি : ১৪৩)

সময় গড়িয়ে যাচ্ছে, আলি কেনানের অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়ছে। কবরটিকে লালসালু দিয়ে ঢেকে দেয়। প্রতি সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালায়। আলি কেনান ধর্ম ব্যবসাকে কাজে লাগানোর জন্য কাল্পনিক দরবেশের আশ্রয় নেয়। বু আলি কলন্দরকে ধারণ করে। এই বু আলি কলন্দর আলি কেনানের ভাগ্যবদলের আরেক চাবিকাঠি। প্রথমজীবনে যে গভর্নর আলি কেনানের ভাগ্যবদল করে দিয়েছে, তৃতীয় জীবনেও সে একজন গভর্নরকে পেয়েছে। যিনি কল্পিত এক দরবেশ। গভর্নর যে সাম্রাজ্য থেকে তাকে বিতাড়িত করেছিল তার মায়া কাটিয়ে আলি কেনান আরেক সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছে। আলি কেনানও দরবেশ, তার পেছনে রয়েছে ধর্ম।

এখন সে আর কোনো সম্রাটের সঙ্গে জীবন বিনিময় করতে রাজি হবে না। স্বাধীনতা স্বাধীনতা চারদিকে অবারিত স্বাধীনতা। নিজেকে তার সবকিছুর নিয়ন্তা বলে মনে হয়। যত একাকী ততই অনুভব করে সে ঈশ্বরের মতো শক্তিমান। (আলি : ১৪৬)

আলি কেনানের আখড়ায় প্রতিদিন নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ আসতে থাকে। কাজের সুবিধার্তে স্থানীয় মসজিদের এক ঈমাম সাহেবকে নিজের দলে টাকার বিনিময়ে ভিড়িয়ে নেয়। ঈমাম সাহেব দিনরাত তাবিজ লিখে যান। ঔপন্যাসিক আলি কেনানের মনোভাবের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন রাজধানী ঢাকার

মাজারকেন্দ্রিক ব্যবসার একটি খণ্ডাংশ, যার উদ্দেশ্য মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায় করা, যার উদ্দেশ্য ব্যবসা করা। ঢাকার বুকে মাজারকেন্দ্রিক যে কর্মকাণ্ড পরিচালিত তা ব্যবসা বটে।

> এক একটি মাজার লক্ষ লক্ষ টাকার নিলাম হয়। হাট বাজার ঘাটের মতো। যে সর্বোচ্চ অর্থ প্রদান করতে পারে সে বছরের সমস্ত টাকা পয়সা আদায় করার দায়িত্ব পেতে যায়। এদিক দিয়ে দেখলে একেকটা মাজার অন্য দশটা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের চেয়ে আলাদা নয়। তফাত শুধু এটুকু যে অন্য ব্যবসায়ে মূলধন মারা যাওয়ার ঝুঁকি থাকে, মাজার ব্যবসায় তা নেই। মাজারে মানুষ আসবেই। মানুষ আসবে কারণ সে দুর্বল অসহায় এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী। (আলি : ১৫৩)

আলি কেনান বুঝতে পারে মাজারের ব্যবসা খুব সহজ নয়, এর জন্য ক্ষমতা থাকা লাগে। মাজার দখলের তীব্র প্রতিযোগিতা আছে। খুনোখুনি হয়, মামলা বছরের পর চলে। আলি কেনানের মনোভাব :

> গভনর্র হাউজে থাকার সশয় আলি কেনান খুব নিকট ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করেছে। এই লাইনে আসার পর তার মনে হতে থাকে যে এখানে এই মাজারে সেই দ্বন্দ্বটি কম নয়। তবে সূক্ষ্ম এবং ঘেরাটোপের আড়ালে ঢাকা থাকে। (আলি : ১৫৩)

আলি কেনান নিজের কর্মকাণ্ডের জন্য নিজের মনকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে। মাঝে মাঝে প্রশ্নবিদ্ধ করে নিজের বিবেককে। নিজেকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়। 'ফুলতলি মসজিদের ইমাম এবং শাহ আলি বাবার মাজারের বুড়োর কাছে সে অনেক কিছু শিখেছে। মাঝে মাঝে চোখ বুজে চিন্তা করে। আলি কেনানের মনে হয় :

> সে সোজা কিংবা বাঁকা যে পথে যাক না কেন, সর্বক্ষণ একটা ইতিহাসের ধারাকেই বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে করলেও সে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। একটা-না- একটা ধারা এসে টেনে নিয়ে যায়। সে দরবেশের অভিনয় করে, কিন্তু তার মধ্য দিয়েও সমস্ত দরবেশের সাধনার ধারা পাহাড়ি নদীর মতো ঝোঁপঝাড়ের ভেতর দিয়ে আছড়ে পড়ে তাকে গ্রাস করে ফেলতে চাইছে। দুনিয়াটা বড় আশ্চর্য জায়গা (আলি : ১৫৫)

গভর্নর হাউজ থেকে যে আলি বিতাড়িত হয়েছে সে আলি এখন ঢাকায় আবারো ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছে। মাজার ব্যবসা করে ভাগ্যের চাকা বদলেছে। এখন দরকার জীবনের ভোগ-বিলাস। টাকা-পয়সা ক্ষমতার অভাব তার নেই। আলি কেনান ভেতরে ভেতরে অভাব বোধ করে। মনে হয় তার এখন অন্যকিছুর দরকার :

> তার অভাবগুলোও যে তীব্র। একেবারে জমাটবাঁধা। কিছুতেই অন্য বস্তু দিয়ে পূরণ করা যায় না। ভোলা থেকে সেই পুরনো বউটিকে পিরিয়ে আনার কথাও তার মনে এসছে। সেটা অসম্ভব মনে করে তাকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়েছে। সাপের পুরনো খোলসের মতো সেই জীবন সে ফেলে এসেছে। কাঁচা ঘরের কড়িবরগা যেমন পাকা ঘরের কোনো কাজে আসে না, তেমনি ভোলার জীবনের কোনোকিছুই তার আর কাজে আসবে না। (আলি : ১৫৫)

একদিন বস্তি থেকে চল্লিশ বছর বয়সী এক নারী ছমিরন তার আঠারো বিশ বছর বয়সী মেয়ে নিয়ে এসে আলি কেনানের আশ্রয় চায়। কারণ স্থানীয় কিছু বখাটে মেয়েকে বিরক্ত করে আসছিল। আলি কেনান ওই দুইজনকে নিজ দরবারে আশ্রয় দেন। ওই নারীর সেবা-যত্ন পেয়ে নিজেকে সুখি মনে করতে থাকেন। এতদিন পর আলি কেনানের মনে হয়েছে 'মাটির সঙ্গে শেকড়ের যোগ যেন প্রতিষ্ঠিত' হয়েছে। গাঁজায় দম দিয়ে আলি কেনানের মনে হলো, তার জীবনে এত সুখ রাখবার কোনো জায়গা নেই। সুখের অন্তরালে আলি কেনান হয়ে ওঠে রক্ষক হয়ে ভক্ষক।

নিমতলি মাজারের খাদেম ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা একদিন জুমার নামাজের গান বাজনা করার অপরাধে আলি কেনান ও সাগরেদদের মারধর করে। সেই রাতে বস্তি থেকে ওই নারী আলি কেনানের সেবাযত্ন করে। নিজের হাতে গ্রাস পাকিয়ে আলি কেনানকে ভাত খাইয়ে দেয়। এরপর ঘুমিয়ে পড়ে। মাঝরাতে আলি কেনানের ঘুম ভেঙে যায়। দেখে আধো আলো অন্ধকারে মেয়েমানুষটি আলির পাশে বসে আছে। হঠাৎ করে তার বুকের ভেতর আকাঙ্ক্ষা দুলে ওঠে। সে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করে,

> এই তর নাম কীরে? মেয়ে মানুষটিও ফিসফিস করে জবাব দেয়,
>
> আমার নাম ছমিরন। অতিকষ্টে জখমি হাতটা বাড়িয়ে ছমিরনকে তার দিকে আকর্ষণ করে। ছমিরন যেন সে জন্যই অপেক্ষা করছিল। সে আলি কেনানের শরীরের সঙ্গে কাদার মতো লেপ্টে থাকে। সেদিন থেকে ছমিরন এবং আলি কেনানের মধ্যে একটা গোপন শারীরিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হল। (আলি : ১৫৯)

কেবল আলি কেনানের রিপুর প্রভাব ছমিরনের ওপর পড়ে না। আলি কেনানের নজর যায় ছমিরনের মেয়ের দিকে। গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচতে আশ্রয় নেওয়া ছমিরনের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে আলি কেনান সন্তুষ্ট নয়। ছমিরনের মেয়ে আনজুমনের দিকে বাসনা তাক করে থাকে আলি কেনান। আর ভাবে- 'ও তো ঘরে পোষা মুরগি, যাবে কোথায়?'

গ্রামীণ জীবনে আলি কেনানের বংশ যে লাঠিয়াল, দখলদারিত্বের পেশায় যুক্ত ছিল। এই দখলদারিত্বের প্রমাণ আলি কেনান শহরেও দিয়েছে। পরদিন সকালে উঠে আলি কেনান নিমতলি মাজার দখলের

ফন্দি আঁটে। ভক্তদের প্রলুব্ধ করতে থাকে মাজার দখলের ব্যবস্থা নিতে। ভক্তরা মুগ্ধ হয়ে আলি কেনানের কথা শোনে। আলি কেনান জানায় রাতে বু আলি কলন্দর তাকে দর্শন দিয়ে নিমতলি মাজার দখলে নিতে বলেছে। বানানো স্বপ্নের কথা বর্ণনা করে সে। বু আলি কলন্দর তাকে বলেছে :

> ওই খাদেম ব্যাটা নাপাক বজ্জাত আর হারামি। তুই অরে খেদাইয়া মাজারের দখল লইয়া ল। তিনখান কতা মনে রাখিস। কুত্তা লইয়া যাবি না। অহন আসহাবে কাফের জমানা নয়। অহন কুত্তা নাপাক। জন্তু জানোয়ারের যদি হাউস থাকে, ভেড়া লইয়া যাবি। ভেড়া পাক যন্তু। আমাগো দ্বীনের নবি ভেড়ার গোশত খাইতে পছন্দ করতেন। আর হুন এশার নামাজের আগে গানবাজনা করবি না। আমার ঘুম ভাইঙ্গ্যা গেল। (আলি : ১৬২)

কোনো এক শুক্রবার আলি কেনানের লোকজন নিমতলি মাজারটি দখলে নেয়। 'আলি কেনানের অট্টহাসি আসতে চায়। আল্লাহ যা করে ভালার লাইগ্যা করে। হেইদিন হেই কাণ্ড না ঘটলে, আইজকার ঘটনা ঘটত না।' মাজার আলি কেনানদের দখলে চলে এল।

> আলি কেনান চরের মানুষ। কোনো জিনিস দখল করলে কী করে রক্ষা করতে হয় তা সে ভালোভাবেই জানে। সে শিষ্যদের তিনজনকে সার্বক্ষণিকভাবে নিমবাগানের মাজারে মোতায়েন রাখল। সেও প্রায় প্রতিদিন বেলা দশটার সময় রিকশায় চেপে ফুলতলি থেকে এখানে এসে হাজির হয়। (আলি : ১৬৫)

আলি কেনান জানে নতুন দখল করে রাখা মাজারের দখল বহাল রাখার জন্য তার প্রয়োজন রাজনৈতিক শক্তি। কারণ আলি কেনান গভর্নর হাউজ থেকেই তো জানে রাজনীতির কি ফল, রাজনীতির কি প্রভাব? আলি কেনান নিজের আধিপত্য বিস্তারের জন্য রাজনৈতিক নেতাদের শরণাপন্ন হয়।

> আলি কেনান বসে থাকার মানুষ নয়। ইতিমধ্যে সে নিমবাগানের ওয়ার্ড কমিশনারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে ফেলেছে। এলাকার আরো কিছু প্রভাবশালী মানুষের সঙ্গে তার জানপহেচান হয়ে গেছে। কিছু বখাটে এবং বেকার যুবক কিশোররাও তার সঙ্গে জুটে গেল। আলি কেনান ছোকরাদের কানে মন্ত্র দিয়েছে আগামী পাঁচই রজব মাঘ মাসের তেইশ তারিখে খোরাসানি বাবার মাজারে ওরস করতে হবে। ছোকরারা গিয়ে কমিশনারকে ধরেছে। (আলি : ১৬৫)

আলি কেনান বুঝতে পারে এখানে থাকলে তার চলবে না। ব্যবসার স্থান পাল্টাতে হবে। আলি কেনান ফুলতলি ছেড়ে নিমতলিতে আখড়া পাতে। মাঝে মাঝে আলি কেনানের মনে হতো তার অগাধ, অসীম ক্ষমতা। শরীরে বোধ হয় তার এক জোড়া পাখা জন্মেছে। সে চাইলে পাখার সাহায্যে যেখানে খুশি

উড়ে যেতে পারবে। আলি কেনান বুঝতে পারে তার পাখা কাটা পড়েছে। এখন সে নেহাতই ধুলোর জীব সরীসৃপের মতো বুকে ভর দিয়ে তাকে ধুলোর উপর দিয়ে চলতে হবে। আলি কেনান অনুভব করে :

> এভাবে বেঁচে থাকার কোনো মানে সে খুঁজে পায় না। সে অনুভব করে হাড়ে-মাংসে অস্থি-মজ্জায় সে ভোলার লাঠিয়াল। জীবন তার কাছে একটা উৎসব বিশেষ। এভাবে সে কী করে বেঁচে থাকবে। ভেতর থেকে প্রেরণা আসছে না বলে সে এমনভাবে স্থানুর মতো বসে থাকতে পারে না। বাইরে থেকে প্রেরণার সন্ধান করতে হবে। নিজের অন্তরের শৃঙ্খলা বাইরে আরোপ করার ক্ষমতা নেই। সুতরাং তাকে বাইরের শৃঙ্খলার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। (আলি : ১৭০)

৬৯ সাল শেষে হয়েছে। সত্তরের সালের মাঝামাঝি অতীত প্রায়। আলি কেনান চোখের সামনে ঢাকার রাজনীতির উত্তাল অবস্থা দেখে। আলি কেনান এই উত্তাল রাজনীতির সঙ্গে মিশে যেতে চায় নিজের স্বার্থ আদায়ের জন্য। আলি কেনান দেখতে পায় চারদিকে জয়বাংলার রব। 'সকালে জয়বাংলা, দুপুরে জয়বাংলা, সন্ধেয় জয়বাংলা, এমনকি রাত্রির গভীর অন্ধকারে জয়বাংলা ধ্বনি, কামানের গোলার মতো ফেটে পড়ে।'

আলি কেনান প্রতিশোধ নিতে চায়। সে গভর্নরকে দেখিয়ে দিতে চায় সে ঢাকার দরবেশ নেতা, তার সামনে- পেছনে এখন অনেক মানুষ। গভর্নর হাউজ থেকে বিতাড়িত মানুষ আলি কেনান মনে করে এটাই মোক্ষম সময় গভর্নরকে শায়েস্তা করার :

> আলি কেনান চিন্তা করে দেখল এটা একটা সময় এবং সুযোগ বটে। এই তীব্র স্রোতের খরতরঙ্গে সে ভেসে পড়তে পারে। এই প্রচণ্ড খরস্রোত তাকে টেনে টেনে নিয়ে যাবে। এই জয়বাংলা ধ্বনির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার একটা ব্যক্তিগত কারণও সে নিজের মধ্যে আবিষ্কার করে। গভর্নর সাহেবকে সে একবার প্রাণে বাঁচিয়েছিল। আর সেই গভর্নর সাহেব তাকে রাস্তায় উলঙ্গ করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আলি কেনানের মনের ভেতর তাঁর প্রতি একটা ঘৃণা শক্ত হয়ে জমাট বেঁধে আছে। এতদিন সে কথা মনেই হয়নি। এখন চিন্তা করে দেখল এই জয়বাংলার মানুষদের সঙ্গে যদি নেমে পড়ে তাহলে একটা প্রতিশোধও নিতে পারবে। গভর্নর সাহেব নিজেরও এখন গভর্নর হাউজে নেই। আইয়ুব তাকে সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতা থেকে বাধ্য হয়ে নিজেও সরে গিয়েছেন। তবুও গভর্নর সাহেব গুলশানের রাজবাড়ির মতো বাড়িতে বহাল তবিয়তে আছে। আলি কেনানের একান্ত ইচ্ছে একবার গভর্নর সাহেবের মুখোমুখি দাঁড়াবে। বলবে, আমার নাম আলি কেনান। একদা আপনি যাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পেছনে আলখাল্লা পড়া যাদের দেখছেন এরা সবাই আমার শিষ্য। এখন আমি জয়বাংলার দরবেশ। আমার কথা

এরা প্রাণটি পর্যন্ত বিলিয়ে দেবে। কিন্তু আপনার কথায় এই বাংলাদেশে একটা কুত্তাও ঘেউ করবে না। (আলি : ১৭২)

আলি কেনানের মতে শেখ মুজিবুর রহমান সমাজতন্ত্র চান। শেখ মুজিবুর রহমান সমাজতন্ত্রের দরবেশ আর আলি কেনান জয়বাংলার দরবেশ হিসেবে। সে আজকাল শেখ মুজিবকে পছন্দ করা শুরু করেছে, বাঁশের মাথায় শেখ মুজিবের ছবি টানিয়ে রাখে। আলি কেনান জয়বাংলার লোক, শেখ মুজিবও তাই। সুতরাং দুইজনও সমমনা। আলি কেনানের এই ভাবনা থেকে সে শেখ মুজিবের প্রতি অনুযোগ রাখে। বর্তমান দুর্ভাগ্যের জন্য সে মনে মনে শেখ মুজিবকে দায়ী করে।

আলি কেনানের অনুযোগ সত্য। কারণ 'শেখ সাহেব গভর্নর সাহেবের সঙ্গে টক্কর দিয়ে তাকে চিত করে ফেলেছেন।' পূর্ব-বাংলার উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি না হলে পাকিস্তান থেকে প্রেসিডেন্ট সাহেব জরুরিভাবে গভর্নর সাহেবকে কল করতেন না। সেই ফোন কল ঠিক সময়ে গভর্নরকে পৌঁছে না দেওয়ার কারণেই তো বিতাড়িত হতে হয়েছে আলি কেনান। আলি কেনানের বিশ্বাস স্বর্গ থেকে বিচ্যুৎ হওয়ার জন্য শেখ মুজিবই দায়ী।

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে তার একটা সাংঘাতিক অনুযোগ আছে। শেখ সাহেব জয়বাংলা করতে চান ভালো, বিহারি, পাঞ্জাবিদের খেদিয়ে দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করতে চান আরো ভালো। সেইজন্যই তো আলি কেনান তার দলে যোগ দিয়েছে। কিন্তু তিনি ফকিরনির পোলাদের বুকে সাহস দিয়ে এমন বেয়াদব করে তুলেছেন, এটা ঠিক না। ফকিরনির পোলারা ফকিরনির পোলাই।'

এরপর আসে একাত্তরের পঁচিশে মার্চ। উপন্যাসে মাত্র দুটি প্যারার মাধ্যমে একাত্তরের পঁচিশে রাতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কারণ আহমদ ছফা এখানে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। একাত্তরের ২৫ মার্চ মনে হলেই পাকদানবদের নৃশংসতার কথা মনে পড়ে। এই ইতিহাস তো সবারই জানা। সুতরাং ইতিহাসের পাল্লা ভারি করে আহমদ ছফা অযথা সময় ব্যয় করেননি, তিনি স্থির থেকেছেন অভীষ্ট লক্ষ্যে। ২৫ মার্চের রাতেই নিদ্রিত ঢাকা নগরীর বুকে বন্দুক, কামান, ট্যাংক নিয়ে প্রচণ্ড হিংস্রতায় পাকিস্তানি সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেই ভয়াবহ দশা নিয়ে আলি কেনানের উপলব্ধি :

আলি কেনান ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সে মনে করেছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী রাস্তায় মশাল জ্বালিয়ে একটা মানুষেরই খোঁজ করছে, তার নাম আলি কেনান। এক নাগাড়ে চারদিন মিরপুর মাজারে অবস্থান করতে হলে আলি কেনানকে। পঞ্চমদিন পাকিস্তানি সৈন্যদের আক্রমণধারা একটু শিথিল হতেই

সে মনস্থ করল নিমবাগান ফিলে যাবে। ডানে-বায়ে খোজ করল কিন্তু ফুলতলির কিশোর শিষ্যটির কোথাও দেখা পেল না। সুতরাং একাই তাকে পথে বেরোতে হল। (আলি : ১৭৪)

আলি কেনান নিরুদ্দেশ হল। ঔপন্যাসিক উল্লেখ করছেন, 'আলি কেনান হুঁশিয়ার মানুষ।' এই হুঁশিয়ারি বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে আলি কেনান আত্মগোপনে গেল। যুদ্ধের নয়মাস কোথায় ছিল তা কেউ বলতে পারে না। দেশ স্বাধীন হলো, আলি কেনান আবার মাজারে ফিরে আসে। আলি কেনান উপলব্ধি করে কাল্পনিক দরবেশ বু আলি কলন্দরের চেয়ে জয়বাংলা বেশি শক্তিশালী। সুতরাং তাকে জয়বাংলার লোক হয়ে বাকি সময় কাটাতে হবে।

আলি কেনানের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন এক শ্রেণির সুবিধাবাদী নেতাদের বাস্তব অবস্থা, এরা একসময় পালিয়ে ছিলেন প্রাণভয়ে, স্বাধীনতার সময় এরা আত্মগোপনে ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার আলি কেনানের মতো তারাও নিজেদের খোলস পাল্টাতে শুরু করে। এরা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে। এদের ভাগ্যে বদলের চাবিকাঠি হয়েছে জয়বাংলা স্লোগান। এ সব খোলসধারী ব্যক্তিদের সঙ্গে আলি কেনানের মিল রয়েছে।

আমাদের বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরা আইলেন, বাবাও মাজারে আইলেন। আলি কেনান মনে করল এই তুলনা একান্তই যুক্তসঙ্গত। তারপর থেকে আলি কেনানের চিন্তাধারা একটি নতুন খাতে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করল। কাউকে বলবার সাহস তার সেই। মর্মের গভীরে ধরে নিয়েছে শেখ মুজিব জয়বাংলার নেতা এবং সে নিজে জয়বাংলার দরবেশ। এতকাল বাবা বু আলি কলন্দরের- এর সঙ্গে কাল্পনিক সম্পর্ক সে প্রতিষ্ঠা করেছিল এই সম্পর্ক তার চাইতে অনেক জোরালো। কেননা এর বাস্তব ভিত্তি আছে। শেখ সাহেব যেমন সব ব্যাপারে হুকুম দিচ্ছেন, তেমনি হুকুম দেয়ার অধিকার তারও আছে। (আলি : ১৭৬)

দেশ স্বাধীন হলেও যে স্বপ্ন নিয়ে দেশ এগিয়ে যাওয়ার কথা তা ছিল বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে মরীচিকার মতো। জনগণ কী চায় তা একাত্তরে জানিয়ে দিয়েছিল। একাত্তরের শেষে একটা চুক্তি হয়েছিল। না, পাকিস্তানিদের সঙ্গে নয়, পাকিস্তানিরা তখন বিতাড়িত। চুক্তি হয়েছিল সাধারণ মানুষদের সঙ্গে ভবিষ্যত শাসকদের। অলিখিত সেই দলিলটিই পরে রূপ নিয়েছে আদি সংবিধানের সেই চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে।

জাতির জন্য সেটা ছিল একটা ম্যাগনাকার্টা। সেই চুক্তিতে ভোগবাদিতার কোনো প্রশ্রয় ছিল না, ছিল না ভোগের স্বার্থে লুণ্ঠনের প্রতি কোনো সমর্থন। পরের দিনে দিনে আমরা সেই চুক্তি থেকে সরে এসেছি। শাসকেরা চলে গেছে ভোগের দিবে, জনগণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে দুর্ভোগে। জনগণ এটা চায়নি। পাকিস্তানি শানকেরা ছিল নিকৃষ্টতম ভোগবাদী। রাষ্ট্রকে তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করেছিল। সেই রাষ্ট্র জনগণ ভেঙে দিয়েছে, ক্ষিপ্র হয়ে। রাষ্ট্র ভেঙে দুটুকরো হলো। কথা ছিল নতুন রাষ্ট্র গড়ে তোলা হবে, সেটি অল্প মানুষের ভোগের ক্ষেত্র হবে না, হবে সব মানুষের মঙ্গলের আয়োজন। রাষ্ট্রের জন্য প্রধান সত্য হবে জনগণের প্রতি দায়িত্বজ্ঞান। কিন্তু দেখা গেল শাসনের সুযোগ যারা পেল সেই আওয়ামী লীগ নতুন রাষ্ট্র গড়ে তোলায় তেমন আগ্রজী নয়, তাদের আগ্রহ লুটপাট করায়। তাদের ভাবখানা এই ছিল যে, এতকাল আমরা কষ্ট করেছি, এখন ভোগ করব। আতঙ্কগ্রস্ত জনগণ দেলো পাকিস্তানি দস্যুরা চলে গেছে, কিন্তু নতুন যারা এসেছে তাদেরকেও আপনজন মনে হচ্ছে না। বড় নির্মম ছিল আশাভঙ্গের বেদনা। (সিরাজুল ১৯৯৩ : ৬৯)

আলি কেনানের উত্থান-পতনের গল্পে বাঙালি জাতির আশাভঙ্গের বেদনা রয়েছে :

> তখনকার সময়টা ছিল ভীষণ টালমাটাল। দশকোটি মানুষের একটা দেশের তাবৎ মানুষের সামাজিক বন্ধন আলগা হয়ে পড়েছে। সমাজরে তলা থেকে প্রচণ্ড একটা গতিশীলতা জাগ্রত হয়ে গোটা সামাজিক কাঠামোকেই কাঁপিয়ে তুলেছে। পুরোনো যা-কিছু ছিল ভেঙে তছনছ হয়ে যাচ্ছে। এ এমন একটা পরিস্থিতি উচ্চ চিৎকার করে না বললে কেউ কারো কথা পর্যন্ত কানে তোলে না। (আলি : ১৭৬)

এই অস্থির টালমাটাল সময়ে আলি কেনান নিজের মাজার ব্যবসা আরো জমিয়ে তোলে। 'তাকে মানুষ দরাজ হাতে টাকা দেয়। লোকজন তাকে চারপাশে থেকে সবসময় ঘিরে রাখে। মাঝখানে গোলাকার বেষ্টনীর মধ্যে যে নাচে, সে গায়।'

> এই সময়ের মধ্যে আলি কেনান আস্ত একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে গেল। জাতীয় সংবাদপত্রসমূহে অনেকগুলো সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো। তাতে আলি কেনানের বিষয়ে অনেকগুলো খারাপ কথাও প্রকাশিত হওয়ায় শিষ্যেরা ঠিক করল, এরপর থেকে তারাই সাংবাদিকদের সমস্ত খবরাখবর সরবরাহ করবে, যাতে বাবার নামে এ ধরনের অপপ্রচার না ঘটাতে পারে। (আলি : ১৭৭)

টের পাই, আহমদ ছফার মতলবে আলি কেনানটা একটা ছুতা মাত্র, আসল উদ্দেশ্য যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে হতাশার চিত্রটির একটি নকশা আঁকা। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির কুসংস্কার ও সুবিধাবাদকে ঘায়েল করার মোক্ষমতর ক্ষেপণাস্ত্র এর চেয়ে আর হয় না। ঔপনিবেশিক যুগের

রাসপুতিনটি স্বাধীন দেশের নব্য সন্ত। রূপান্তরের এই মহাকাব্য সামাজিক বন্ধনের গভীর অনড়তা ও পরিবর্তনের প্রয়াসে দৃষ্ট সীমাবদ্ধতার দ্বন্দ্বকে খুলে ধরে। (সলিমুল্লাহ ২০১৩ : ২৪৬)

আলি কেনান নিজ মাজারে আসা এক বিলাত ফেরত নারীর প্রেমে পড়ে। আলি কেনান ওই নারীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়। আলি কেনানের মনে হয়, 'গঙ্গা-যমুনার পাড়ে খাড়াইয়া য্যান দেখলাম সুরুজ অস্ত যাইতেছে। দেইখলাম আন্দাররাইতে জঙ্গলের মাঝখান দিয়া চান উঠবার লাগছে।'

ওই মহিলা রূপবান, সকালে যাকে বুকে টানেন বিকেলে তার গালে দুই চড় দিতে কসুর করেন না। কেনানের দরজায় ইনি নিজের মানসিক রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এসেছিলেন। কিন্তু তিনি সৃষ্টি করে গেলেন কেনানের মনের অসুখ।

আলি কেনান ওই নারীতে স্থির হতে চায়। মিথ্যা দিয়ে গড়া ক্ষমতার এই সাম্রাজ্য ভেঙেচুরে আশ্রয় নিতে চায় ওই নারীর কাছে। আলির মনে হয় বু আলি কলন্দর মিথ্যা, ওই মাজার মিথ্যা, এ জীবন মিথ্যা, এ ছদ্মবেশ মিথ্যা। একমাত্র ওই নারীই সত্য

> আলি কেনানের নানারকম ইচ্ছে জাগে। কখনো মনে করে সেই মহিলাকে সবলে দুহাতে তুলে নিয়ে যেদিকে দুচোখ যায় ছুটে যাবে। কখনো ভাবে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে মিনতি জানাবে। যে ভক্তি যে আবেগ সে বাবা বু আলি কলন্দরকে দিতে পারেনি সব মহিলাকে উজাড় করে দেবে। কিন্তু প্রতিদিন বাস্তবে ঘটে তার উলটো। (আলি : ১৭৯)

এক প্রকৌশলী বন্ধুর সঙ্গে ওই নারীর মানবিক সম্পর্কের কথা জানতে পারে আলি কেনান। আলি কেনান যে কোনো মূল্যে ই নারীকে জয় করতে চায়। সে ভাবে তার জীবনে সে যত টাকা উপার্জন করেছে সব টাকা সে নারীকে দিয়ে তাকে পেতে চায়। 'ঘরে ঢুকে সে তোশকটা উলটায়। তোশকের নিচে ভাঁজে ভাঁজে রাখা টাকার তোড়া। অনেক টাকা, অনেকগুলো বাণ্ডিল।' সব একসঙ্গে জড়ো করে আলি কেনান আবার চিৎকার আরম্ভ করে।

> আমার ভেস্তের হুর, আমার আসমানের চান, আমার হইলদ্যা পাখি। তুই আমার কাছে আয়। এই ট্যাহা বেবাক তোর। অনেক ট্যাহা। শেখ মুজিবের ব্যাংকেও অত ট্যাহা নাই। সব তর লাইগ্যা। তুই আয়, গতরের চামড়া দিয়া তর জুতা বানাইয়া দিমু। শরীরের লউ দিয় তর পায়ে আলতা কইরা দিমু। তুই আয়, তুই আয়। একসময় ক্ষিপ্তের মতো টাকার বান্ডিলগুলো একর পর এক বাইরে ছুড়ে মারতে থাকে। (আলি : ১৮১)

আলি কেনানের ভক্তরা এই টাকা রাতের আঁধারে নিয়ে যে যার মতো পালিয়ে যায়। আলি কেনানের সেবা কাউকে নিরাশ করেনি। আলি কেনান ঘুম থেকে উঠে দেখে তার আশেপাশে কেউ নেই। এতদিন মিথ্যা দিয়ে যে বালুর যে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল তার অস্তিত্ব নেই। আলী কেনানের অনুভব : জীবনের সমস্ত সাধ, সমস্ত স্বপ্ন মিটে গেছে। তবু জীবন- এ পোড়া জীবন তাকে বয়ে বেড়াতে হবে। হায়রে জীবনের বিড়ম্বনা, হায়রে জীবনের মায়া! কাউকে না পেয়ে আলি কেনান রাস্তায় চলে এল। মোড়ের রেডিওতে শুনতে পায় শেখ মুজিবের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। আলি কেনানের চোখের সামনে গোটা জগৎটায় দুলে উঠল। সে বিড়বিড় করে বলতে থাকল :

> শেখ মুজিব বাইচ্যা নাই, আমি ঢাকায় থাকুম কেরে? হের সমাজতন্ত্র অইল না, আমি হইলদ্যা পাখিটারে হারাইলাম। ভোলাই চইল্যা যামু। অই তরা আমারে একটা লঞ্চের টিকেট কাইট্যা দে।
>
> কিন্তু তার চিৎকার হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে থাকল। ...আজ কিচ্ছু নেই। সব হাওয়া। মাজারে ঢুকে গলা চড়িয়ে বলতে থাকল, হাতে একটা পয়সাও নাই। আমি ভোলায় মা-বাপর কাছে ফেরত যামু কেমনে? কেমনে যামু? মাজারের ভেতর তার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হতে থাকল- কেমনে যামু? কেমনে যামু?... (আলি : ১৮২)

স্বাধীনতার যুদ্ধ ও স্বাধীন দেশের প্রথম কয়েক বছর যে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের নকশা শাসকশ্রেণি প্রচার এবং জনগণ ফলিত কল্পনাযোগে যে সমাজতন্ত্রের আশায় দিন গুজরান করে তার অন্তর্নিহিত ভঙ্গুরতা ও বাতুলতার আবরণটি খোলার উদ্দেশ্য আহমদ ছফার। বাংলাদেশের জাতীয় আন্দোন পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শোষণের তথ্যখানি যতখানি জোর দিয়ে প্রচার করেছে এই শোষণের গোড়ার কারণ সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের তাগিদ ততটা অনুভব করেনি। আন্দোলন ছিল বড়লোকের চালাকি- এই চালাকির ফাঁদে কৃষক-শ্রমিক-জনতা একাত্ম হলে বড়লোকি চালের কোনো পরিবর্তন আসেনি। এর ফলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বুলি ফাঁকা বুলিতে পরিণত হয়।

উপন্যাসের প্রধানচরিত্র আলি কেনান, আর বাস্তবের নায়ক শেখ মুজিবুর রহমান। আলি কেনানের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে শেখ মুজিবের কায়া ও ছায়া। কিংবা শেখ মুজিবের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে আলি কেনানের কায়া ছায়া। একজন সমাজতন্ত্রের দরবেশ, অপরজন কলন্দরি তরিকার দরবেশ। দুজনের বিকাশ, প্রতিষ্ঠা অস্থির সময়ের মধ্যদিয়ে। আলি কেনান ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষার কারণে নিজের প্রতিষ্ঠা করেছেন ঢাকার বুকে অপরদিকে শেখ মুজিব জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে কাজে লাগিয়ে জনগণের নেতায় পরিণত হন। দুজনই পরিণতিতে এক, পতনে এক।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান আততায়ীদের হাতে খুন হন, আর আলি কেনানের গলে তোলা সাম্রাজ্যের পতনও ওই একদিনেই। আলি কেনানেরও পতন এক নামপরিচয়হীন এক নারীর কারণে। তবে একটা কথা সত্য তিনি বিলাত ফেরত নারী, তিনি সকালে যাবে বুকে টানের বিকেলে তাকে চড় কষতে কসুর করেন না। এই বিলাত ফেরত নারী মধ্যবিত্তের প্রতীক। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ গজিয়ে ওঠা মধ্যবিত্তের চরিত্র এই নামপরিচয়হীন নারী। শেখ মুজিবুর রহমানের পতনও উচ্চাকাঙ্ক্ষামুখি মধ্যবিত্তশ্রেণির হাতে।

শেখ সাহেবের সঙ্গে আলি কেনানের দ্রবণ তবুও আহমদ ছফার মূল উদ্দেশ্য-বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের ভেতরকার অসঙ্গতি, কথা ও কাজের ফাঁকিটি ধরার চেষ্টা-অনেকখানি সফল করেছে। প্রশ্ন জাগে : আলি কেনানের স্বভাববৈশিষ্ট্যগুলি কি শেখ সাহেবেরও নয়? শেখ মুজিবও তাহলে অবস্থার চাপেই নিজেকে জয়বাংলার দরবেশ ঘোষণা করেছিলেন? অধিক দূর যেতে চাইছিলেন না জয়বাংলার মানুষদের সঙ্গে? আরো প্রশ্ন : কেবল আলি কেনানের মাজার নয়, লক্ষ লক্ষ প্রাণের দামে কেনা বাংলাদেশ রাষ্ট্রখানি নিলামে কেনাবেচার জিনিশ? (সলিমুল্লাহ ২০১০ : ২৫২)

আলি কেনানের গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার টাকা নেই। যা ছিল সবকিছু লুটেপুটে নিয়ে গেছে। তেমনি তো হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানের পরিণতি। নারীর প্রেমে বিনাশ হলো বু আলি কলন্দর দরবেশে, কিন্তু কার প্রেমে বিনাশ ঘটে সমাজতন্ত্রের দরবেশের। যে বিষে রোগ সারে সে বিষেই আবার পতন।

পারের কাড়ি অর্থাৎ কাফনের কাপড় শেখেরও কি ছিল ১৫ আগস্ট ভোরে? আলি কেনানের শিষ্যরা এ সব লুটেপুটে দে চম্পট। ওদের কেউ দাগি আসামি, কেউ সমকামী, কেউ সংসার বিরাগী, কেউ ঈশ্বর সন্ধানী, কেউ দুমুঠো খাদ্যের আশেক, কেউ বা নিছক শরণার্থী? শেখ সাহেবের ভক্তরাও তো এরকম কেউ তোষামুদে, কেউ সুবিধাবাদী, কেউ চক্রান্তকারী, কেউ খুনি। ১৫ আগস্ট ভোরেও আলি কেনানের শিষ্যের মতো কোথায় পালিয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানের ভক্তরা?

প্রশ্ন হচ্ছে : শেখ মুজিবের মৃত্যু বা আলি কেনানের পতন কি মাজার ব্যবসার ইতিবাচক পরিবর্তনে কোনো সাহায্য করেছে? মানুষের ভক্তিতে কোনো নড়চড় হয়েছে? বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তির আন্দোলন এখনো শেষ হয়নি। তার সামনে উপস্থিতি এই সব গুরুতর প্রশ্ন আহমদ ছফার উপন্যাসে তোলা হয়নি। অথচ তার মতন এদের চেয়ে জরুরি অন্য কোনো প্রশ্ন আজ আর নেই। (সলিমুল্লাহ ২০১০ : ২৫৫)

তথ্যসূত্র

শাওয়াল খান, *'কালের কলকাকলি একটি মরণবিলাস : আহমদ ছফার আবিষ্কার'*, আহমদ ছফা স্মারক গ্রন্থ মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩।

সলিমুল্লাহ খান, আহমদ ছফা সঞ্জীবনী, আগামী প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, দ্বি-জাতি তত্ত্বের সত্য-মিথ্যা, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা ১৯৯৩।

ঘ. নষ্ট রাজনীতি, নষ্ট সময় (মরণ বিলাস)

একাত্তরে বাংলাদেশে অত্যন্ত গভীর দুর্দশা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ দেশের ওপর দিয়ে অনেক গেছে, অনেকবার; মানবিক দুর্যোগও গেছে। বহুবার দুর্ভিক্ষ হয়েছে, মারা গেছে শত শত মানুষ। একাত্তর ওইরকম একটি বড় দুর্যোগ হতে পারত বাংলাদেশিরে জন্য কিন্তু হয়নি। কারণ সেটি যুদ্ধ ছিল, সেটি বাঙালি জাতির প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধ ছিল অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে, এই প্রতিরোধ ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। বাংলার মানুষ আক্রমণকারীকে মেনে নেয়নি। লড়াই করেছে। এই ভূমি অতীতে বহুবার বিজিত হয়েছে। বিদেশিরা এসে দখল করে নিয়েছে। সে সব যুদ্ধ ছিল রাজায় রাজায়। জনগণ তাতে অংশ নেয়নি। একাত্তর নিয়েছে। ওই যুদ্ধ জনগণের যুদ্ধ। সব মানুষের। এবং এতে হানাদারদেও হটিয়ে দিয়েছে। হানাদার হটানোর পেছনে জনগণই ছিল সক্রিয়। এরপর একটা রাষ্ট্র গঠন হলো বাংলাদেশ নামে। যে রাজনৈতিক অভ্যুদয় ও রাজনৈতিক দুর্দশার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের জন্ম সেই দুর্দশা থেকে যায় পরবর্তীতে। পাক-হানাদার চলে গেছে রাষ্ট্রের বুকে পরবর্তীতে জেকে বসে সুবিধাবাদ শ্রেণি, এদের আদর্শ পুজিবাদ, এদের আদর্শ জনগণের সম্পদ লুটেপুটে খাওয়া।

এরপর কষ্টে অর্জিত বাংলাদেশের গৌরব ক্রমাগত ম্লান হতে শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধের নায়কেরা একে একে নিহত হয়েছেন, নয়তো ব্যর্থ হয়েছেন।

সবচেয়ে মর্মান্তিক হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড। এ কাণ্ড কারা ঘটালো? ঘটালো যারা রাষ্ট্রক্ষমতাকে দখল করতে চাইল। কেবল দখল করতে চায়নি, দখল যাতে কায়েমি হয় রাষ্ট্রকে চালাতে হয়েছে। স্বাধীনতার কয়েকবছর পর রাষ্ট্র আবার পেছন দিকে হাঁটা শুরু করল। পাকিস্তান ছিল একটি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদি রাষ্ট্র। এরাও চাইলো রাষ্ট্র চলুক সেই পথে।

সেই পথেই চলেছে রাষ্ট্র। বলা বাহুল্য ওটি কোনো পথ, ওটি একটি অন্ধ গলি। ওই দিকে গিয়ে দারিদ্রের সমস্যা সমাধান হবার নয়, হয়ওনি। দারিদ্র্য বেড়েই চলেছে। মূল কথা হলো, একাত্তরের জয়কে ঠেলে দেওয়া হয়েছে আত্মসমর্পণের পথে। একাত্তরে যা অকল্পনীয় ছিল, তাই ঘটেছে পরবর্তী বছরগুলোতে। প্রথমে ধীরে ধীরে, পরে দ্রুতগতিতে। (সিরাজুল **১৯৯৩ : ৯৪**)

উপরিবিচারে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার পেছনে সমাজতন্ত্রেও আদর্শ সক্রিয় ছিল, জনগণের পক্ষ থেকে এই দাবিটি থাকলেও শাসকগোষ্ঠীর প্রকাশ্য ইশতেহার এটি ছিল না। স্বাধীনতার কয়েকবছরে বাংলাদেশ তার আদর্শ ঠিক করতে পারেনি। ফলে ব্যর্থতার দিকে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে হয়েছে।

স্থূল সত্য হলো এটা যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব সমাজতন্ত্রীরা দেয়নি, পুঁজিবাদে বিশ্বাসীরাই দিয়েছে। সমাজতন্ত্রীদের এক এক ঐতিহাসিক ব্যর্থতা। আওয়ামী লীগের চেতনায় সমাজতন্ত্র ছিল না কখনো, তবু তাকে সমাজতন্ত্রকে মেনে নিতে হয়েছিল, স্বেচ্ছায় নয়, জনগণের চাপে। নেতৃত্বের কেউ কেউ সমাজতন্ত্রেও পক্ষে ছিলেন অবশ্য, আগাগোড়াই; যেমন তাজউদ্দীন আহমদ। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে এ ঘটনা যে, তিনি পরিত্যক্ত হয়েছেন, স্বাধীনতার পরে। শক্তিশালী হয়েছে দলের সমাজতন্ত্রবিরোধী অংশ, যার প্রধান নট ছিলেন খন্দকার মোস্তাক আহমদ, মুজিব হত্যার পর যিনি রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেয়েছিলেন এবং রাষ্ট্রকে বাম থেকে ঘুরিয়ে দক্ষিণ দিকে চালিয়ে দিলেন। জিয়াউর রহমানও ছিলেন পুরোপুরি দক্ষিণপন্থী। (সিরাজুল ১৯৯৩ : ১০০)

এরপর রাষ্ট্রক্ষমতায় বসলেন জিয়াউর রহমান। তার মৃত্যুর পর বসলেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। স্বাধীনতার পর শাসকগোষ্ঠীর আড়ালে বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে স্বৈরাচার। রাষ্ট্র চলে গেছে পুঁজিবাদী পথে। চলে গেছে সাম্রাজ্যবাদের গহ্বরে। রাষ্ট্র এখন অন্ধকারের পথে।

এই রাজনৈতিক জনগণের অন্ধকার নিয়েই রচিত আহমদ ছফার 'মরণ বিলাস' (১৯৮৯) উপন্যাস। এ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে রাষ্ট্র-সমাজ-রাজনীতির 'বারোটা বেজে তেরো মিনিটের' কাহিনি। নষ্ট সময়ের নষ্ট রাজনীতির পরিচয় পাওয়া যায় উপন্যাসে।

মরণ বিলাসের সময় আমাদের অতি নিকট অতীত। তাই মরণ বিলাসের চিত্রিত চরিত্রগুলো এখনও ঝাঁক বেঁধে বেঁধে উড়ে বেড়াচ্ছে আমাদের চারিদিকে। হয়তো এ সব চরিত্র সুদূর অতীতে ছিল, নিকট অতীতে তো ছিলই, বর্তমানেও আছে, এটা বোধ হয় কালের অবদান। হারাবে কোথায়। মরণ বিলাসে দেখতে পাই ঘরের গল্প...সমাজজীবনের গল্প...সমাজনীতির গল্প...রাজনীতির গল্প...নিষ্ঠুরতার গল্প...মানবিকতার গল্প...সংস্কৃতির গল্প...দলনীতির গল্প...শাসনের গল্প... শোষণের গল্প। (শাওয়াল ২০০৩ : ৩৪৫)

আহমদ ছফার ৮০ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসে প্রকাশ করা হয়েছে একটা ভঙ্গ সময়ের ধারাবাহিক কথামালা। উপন্যাসে বিদ্যমান চরিত্রগুলো তাদের কর্মকাণ্ড, তাদের নীতি-আদর্শ, নীতিবর্জন, তাদের চাওয়া-পাওয়া, তাদের উত্থান-পতন সর্বোপরী পরিণতি সবগুলোই আমাদের চেনা। এই উপন্যাসে রোগাক্রান্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফজলে ইলাহী তার জীবন আলেখ্য তুলে ধরেছেন হাসপাতালে থাকা ব্যক্তিগত সহকারীর কাছে। ব্যক্তিগত সহকারীর কাছ থেকে সেই তথ্য ফাঁস করে আহমদ ছফা যেন সেই তথ্য পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেছেন। আহমদ ছফা তুলে ধরলেন নষ্ট সময়ের, নষ্ট মানুষদের কথা, যাদের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ক্ষমতা।

স্বৈরশাসনের নৈতিকতাবর্জিত শাসক সম্প্রদায়ের সার্বিক চিত্র একজন মন্ত্রীর জীবনভাষ্যে লেখক স্পষ্ট করেছেন। কোন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে সমাজের ভেতর দিয়ে সমাজের নিকৃষ্ট এক লোক রাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ পরিষদে পরিষদে স্থান করে নেয় সেটি আহমদ ছফা এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন। মন্ত্রী ফজলে ইলাহী নষ্ট মানুষের প্রতিকৃতি হিসেবে চিত্রিত। তিনি নানা রকমের খারাপ কাজের জীবনধারায় জীবনধারায় মন্ত্রীত্ব অর্জন করেছেন। ওই নষ্ট জীবনই যেন তাকে মন্ত্রীর আসন বন্দোবস্ত করার যোগ্য করে তুলেছে। (হান্নান ২০১৪ : ৩২)

ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত ফজলে এলাহী দেশের কোনো এক সামরিক স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু রোগের কারণে পর্যুদস্ত হয়ে 'ডাকসাইটে' এই মন্ত্রীর ঠাঁই এখন হাসপাতালে। এক রাতে হঠাৎ করে তিনি উপলব্ধি করেন মৃত্যু তার দুয়ারে হানা দিয়েছে, আজ রাতই মন্ত্রীর শেষ রাত। মন্ত্রী পূর্ব-ইতিহাস, যে ইতিহান মন্ত্রীর জীবনের কলুষিত অধ্যায় তা প্রকাশ করেন খেদমদগার মাওলা বক্সের কাছে। পূর্ব জীবনের স্মৃতিচারণ করেছেন আর পরক্ষণে ওই কৃতকর্মের পক্ষে নিজের যুক্তি উপস্থাপন করে সেটিকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। মন্ত্রীর মতে সে কোনোদিন, কোনো অন্যায় করেনি।

আহমদ ছফা বাঙালি মুসলমান শাসকশ্রেণির সামাজিক ও আত্মিক সংকটের চুম্বকচিত্র আঁকার জন্যই এই উপন্যাসিকাকে নিয়ে গেছেন হাসপাতালে। এই হাসপাতালকে মাওলা বক্সের মনে হয় বর্ধিত কবর। অলাতচক্র উপন্যাসের সিংহভাগ ঘটনাও হাসপাতালে অথবা হাসপাতালকে ঘিরে। মরণ বিলাসে সংকটের ঘনত্ব অনেক বেশি। এই উপন্যাসিকার প্রায় পৌনে ছয় ঘণ্টা বয়ানকালের সাথেও সংকটের তীব্রতার একটা যোগ আছে। ফজলে ইলাহীর সামাজিক ভবিষ্যৎ নাই, আত্মিক ভবিষ্যতের জন্য তার লড়াই চলে। (সলিমুল্লাহ ২০১৩ : ২৬৩)

১৮ বছরের বিশ্বস্ত তোষামুদি সহকারীর কাছে মন্ত্রী বলেছেন তিনি কোনো অন্যায় করেননি। তারপরও মানুষ হয়ত তার বিরুদ্ধে অপ্রচার বিশ্বাস করে মন্ত্রীর ভালো কাজের কথা ভুলে যাবে। মন্ত্রী বলে:

> আগে যে দলটিতে ছিলাম, সরকারি দলে যোগ না দিলেও তারা আমাকে দল থেকে তাড়িয়ে দিত। ওই দলে কোনো ভালো মানুষের ঠাঁই হতে পারে এ কথা তুমি বিশ্বাস করতে পার। আমি বেরিয়ে এসে সরকারের সঙ্গে যোগ দিয়েছি বলে সামান্যতম অপরোধও নেই। আমি যোগ না দিলে সরকারে মন্ত্রিত্বের আসন কি খালি থাকত? কখনো কোনো মন্ত্রিত্বেও আসন খালি থাকতে দেখেছ? সিরাজদ্দৌলা, মীরজাফরের আমল থেকে শুরু কওে গোটা বাংলার ইতিহাসটা খুঁজে দেখো। ক্ষমতার আসন কি কখনো খালি পড়ে থাকে? (মরণ : ১৯২-১৯৩)

আহমদ ছফা ইঙ্গিত দিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক অসুস্থ প্রতিযোগিতার কথা। এরা ক্ষমতার জন্য, নিজের জন্য যে কোনো অসুস্থ প্রতিযোগিতা করতে রাজি। এরা জনগণের স্বার্থের চেয়ে নিজের অসুস্থ স্বার্থকে বেশি বড় করে দেখে। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ক্ষমতায় আসার চর্চা প্রকাশ করে অসুস্থ রাজনীতির এক গভীর পালাবদল।

মন্ত্রী বলেন ডাকু আলিম নামে এক নেতাকে টেক্কা দিয়ে মন্ত্রীর আসন বাগিয়ে নিয়েছেন। মন্ত্রিত্ব বাগিয়ে নিয়ে সে কোনো অন্যায় কাজ করেনি। মন্ত্রীর বিশ্বাস এ দেশে ভালো কাজের প্রশংসা খুব কম হয়। সরকারি খরচে টাকা খরচ করে নিজের বাবা-মায়ের নামে করেছে তাতেও কোনো অন্যায় দেখে না মন্ত্রী। তিনবারের মন্ত্রী তিনি কোনো অন্যায় করতে পারেন না। মন্ত্রী বলেন :

> এত রাস্তা তৈরি করেছি, এত খাল কেটেছি, এত স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছি, এত বেকার যুবকদের চাকরির ব্যবস্থা করেছি, দুস্থ অসহায়দের সেবা করেছি এবং এত সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক কর্মীর মুক্তি দিয়েছি সমস্ত কাহিনী লিখলে হাজার পাতার একখানি কেতাব হয়ে যাবে। কিন্তু আমার জীবনী লিখবে কে? (মরণ : ১৯৩)

আহমদ ছফা পুঁজিকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা আর অর্থবিত্তের মোহে অধপতিত মানবিক বোধ সংকটের কথা প্রকাশ করেছেন মরণ বিলাসে। মন্ত্রীর পরিবারে সবাই আছেন, বড় বউ আছেন, ছোট বউ আছে, ছেলে আছে, মেয়ে আছে। জীবনের অতলান্তে মন্ত্রীর পাশে থাকার কেউ নেই। সবাই যার যাকে নিয়ে ব্যস্ত, সবাই নিজেদের ভোগ-বিলাস নিয়ে ব্যস্ত। হাসপাতালে ছোট বউ এলেও লায়ন্স ক্লাবে পার্টি থাকায় তিনি অসুস্থ স্বামীকে হাসপাতালে রেখেই চলে গেছেন। মন্ত্রীর তাই ক্ষোভ :

আমার পুত্র দুটো হারামজাদা। শকুনের মতো ওতপেতে অপেক্ষা করে আছে কখন আমার মৃত্যু হয়। কবরে মাটিচাপা দেওয়ার আগে বাড়ি-গাড়ি ব্যাংকে জমানো টাকার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে। মেয়েরা ভাইদের সঙ্গে সম্পত্তি অধিকার আদায়ের চন্য হাইকোর্টে মামলা জুড়ে দেবে। ছোট বিবি, যাকে আমি এত ভালবাসি, মনের মতো মানুষ পেলে চুটিয়ে প্রেম করবে। বিশ বছর বুড়ো মানুষের সঙ্গে সংসার করে যে গ্লানি, যে ক্লান্তি তার জমেছে আর বিশ বছর একটা ছোকরার সঙ্গে কাটিয়ে সে-ক্ষতি পুষিয়ে নেবে। (মরণ : ১৯৩)

কোনো বিশেষ ব্যক্তির মৃত্যুর পর রাষ্ট্র তার তথাকথিত সম্মান দেখানোর নামে যে আদিখ্যেতা প্রকাশ করে মরণ বিলাসে সেই আদিখ্যেতার পরিচয় পাওয়া যায়। মন্ত্রী জানেন তার মারা যাওয়ার পর নানা প্রশংসাবাচক বাণী লেখা হবে, সংবাদপত্রের পাতায় লেখা হবে রাজনীতি অঙ্গনের শূন্যতার কথা। এ সব ফাঁপা তোষাদের পরিচয় পাওয়া যায় মন্ত্রীর বয়ানে।

আমি মারা গেলে কাল প্রেসিডেন্ট সাহেব সংবাদপত্রে সুদীর্ঘ শোকবার্তা দেবেন। আমার পত্নী পুত্রের সঙ্গে দেখা করে মধুর সান্ত্বনার বাক্য উচ্চারণ করবেন। জাতীয় পতাকা কম করে হলেও তিনদিন অর্ধনমিত থাকবে। টিভি রেডিয়োতে আমার দেশপ্রেম, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং নানাবিধ গুণের বিষয়ে আলোচনা হবে। সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদকীয় কলামে আমার মৃত্যুতে জাতির কী পরিমাণ ক্ষতি হলে সে বিষয়ে বিস্তর লেখালেখি হবে। এমনি কবি শফি আহসান একটা কবিতাও লিখে ফেলতে পারে, তবে এ বিষয়ে তোমাকে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছিনে। কারণ শফি আসান অস্থিমজ্জায় একটা তিলে খচ্চরের বাচ্চা। মুনাফেকি ও বেঈমানি হল তার চরিত্রের ভূষণ। (মরণ : ১৮৯)

ফজলে ইলাহী মুন্সী-মোল্লা অধ্যুষিত কোনো এক জেলার আলেম পরিবারের সন্তান। তার বাবা ছিলেন দেওবন্দ পাশ করা কজন মশহুর আলেম। সে তল্লাটে তার মতো বুজুর্গ ব্যক্তি দ্বিতীয়টি দেখা যায়নি। বাবা সম্পর্কে মন্ত্রী জানায় :

তিনি বিবি তালাকের ফতোয়া দিতেন। কোনো ধনশালী ব্যক্তি ইন্তেকাল করলে তাঁর সম্পত্তি ওয়ারিশানদের মধ্যে যাতে ঠিকমতো ভাগবাটোয়ারা হয় সে জন্য নিখুঁত ফরাজনামা তৈরি করতেন। অবশ্য বিনিময়ে তিনি যৎসামান্য অর্থগ্রহণ করতেন। শরা শরিয়তের খেলাপ বরখেলাপের ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল অটল। (মরণ : ২০৩)

কেবল বিবি তালাক আর ফরাজের প্রথার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না ফজলে ইলাহীর বাবা। তিনি ছিলেন পীরফকির, মাজারপ্রথা ঘোরতর বিরোধী। এক সময় আপন ভক্তদের কল্যাণে পিরের আসনে

বসেন এই আলেম। ব্রিটিশ আমলে মাজার প্রথার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন করে জেল খেটেছেন। বাবার এই জেল খাটার সময়ে বখাটে হয়ে ওঠেন ফজলে ইলাহী

> এই তিন বছর সময়ের মধ্যে গ্রামের যতসব বখাটে ছেরের সঙ্গে এত অধিক মেলামেলা করেছি, বাবার শেখানো আদব লেহাজ আচার তবিবরতে শেষ ছাপটুকু মুছে যেতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়নি। আমি মনে করতে থাকলাম চারপাশের পাথুরে দেয়াল উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। আমি খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিচ্ছি। নিয়মিত পাঁচ বেলা নামাজ, তার সঙ্গে দোয়াদরুদ পাঠ, একটার পাশে একটা এমনি করে প্রতিবছর তিরিশটা রোজা রাখতে রাখতে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। এই হঠাৎ-লব্ধ স্বাধীনতার মজা আমি প্রাণভরে উপভোগ করেছিলাম। মাথার ওপর কেউ ছিল না। (মরণ : ২০৫)

ছেলের এই অধপতন দেখে ফজলে ইলাহীর আলেম বাবা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। সবসময় তাকে চোখে চোখে রাখা শুরু করলেন :

> আমাকে ধমীয় জলসা, মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠানে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। দেশের মানুষ আমাকে সমীহ করত। কারণ আমি শাইক সাহেবের ছেলে। সাপ বাচ্চা হলে কি বিষ থাকে না! কিন্তু আমি সুযোগ পেলে পালাতাম। তিনি ধরে এনে বেধড়ক পেটাতেন। ঘরের ঠুনির সঙ্গে বেঁধে গাছ থেকে লাল পিঁপড়া এনে গা উদোম করে লাগিয়ে দিতেন। দিনের পর দিন উপোস করতে বাধ্য করতেন (মরণ : ২০৫)

ফজলের বাবা বিয়ে করেছিলেন একটু উঁচু পরিবারে। খানদানে সৈয়দ বংশে। সেই সৈয়দ বংশকে তল্লাটের সবাই চিনত। ফজলের বাবা বাড়ি, নানা বাড়ি উভয়ই ইংরেজি লেখাপড়ার বিরোধী। ফজলের বাবার বিশ্বাস, স্কুল হল শয়তান তৈরির কারখানা। তবুও গেরস্থ ঘরের খ্যাতিমান মৌলানাকে জব্দ করার মতলবে নানাবাড়ির লোকজন ফজলে ইলাহিকে ইংরেজি স্কুলে পড়তে প্ররোচিত করে। মফস্বল স্কুল থেকে ঠেলেঠুলে বিএ পাশ করেন মন্ত্রী।

ফজলের বাবা বড় ছেলেকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ফজলে ইলাহী তো বখাটে। সৎ ভাই জন্মানোর পর আলেম বাবা আশায় বুক বাঁধলেন :

> মুখে বোল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাইটিকে আলেপ, বে তে ছে মুখস্থ করাতে থাকলেন। আরবি বর্ষপরিচয় লাভ করার পূর্বেই সে সুরা ফাতেহা থেকে সুরা ফিল পর্যন্ত গরগর মুখস্থ বলে যেতে পারত। সকলে বলাবলি করত কালে কালে আমার সৎভাইটি বাবার মুখ উজ্জ্বল করতে পারবে। কথাটি আমিও প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। ছোট্ট শাদা পাঞ্জাবি, চেক লুঙ্গি এবং মাথায় থোপাঅলা সুলতানি টুপি

> পণ্ডে যখন দুলে দুলে বাবার মুখে মুখে কোরআন আবৃত্তি করত, ফুলের মতো শিশুটিকে আমার নিজেরও আদর করার ইচ্ছে জাগত। (মরণ : ২০৭)

সৎ ভাইয়ের প্রতি এ আদর সহ্য করতে পারেনি ফজলে। দুধের ভেতর বিষ মিশিয়ে দিয়ে সে ১০ বছর বয়সী ছোট ভাইটিকে হত্যা করে। এই হত্যার পেছনে যুক্তি খুঁজেছে ফজলে ইলাহী। এখানে সে ওই হত্যার পক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতে চায়।

> কবুল করি হত্যামাত্রই খারাপ কাজ। এ কথা স্বীকার না করে কে? কিন্তু জেনেশুনে আমি সৎভাইটিকে জীবনের ওপারে পাঠালাম কেন? বালকটিতে বাঁচতে দিতে পারতাম। তাকে বাঁচতে দিলে ময়াল শেখের নাতির কাছে কাটাখালির সৈয়দ বাড়ির খানদান খাটো হয়ে যেত। এ রকম একটি ব্যাপার ঘটলে তুমি বুঝি খুব খুশি হতে। তা ছাড়া ওটি ছিল আস্ত একটা জারজ সন্তান। (মরণ : ২০১০)

'আলিম পরিবারের ঘরে জালিম' হয়ে যান ফজলে ইলাহী। তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে মাওলা বক্সের সঙ্গে একের পর এক নানা কর্মকাণ্ড প্রকাশের মাধ্যমে। স্কুলে নবমশ্রেণিতে পড়ার সময় সে চাচা ভাবির সঙ্গে গোপন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। চাচাতো ভাই ইয়াঙ্গুনে থাকার সুযোগে ফজলে ইলাহী ভাবির সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পায়। একসময় পেটে সন্তান ধারণ করে ভাবি। পেটে তিন মাসের বাচ্চা থাকাকালে চাচাচো ভাই দেশে ফিরে আসেন। একদিন তুচ্ছ ঘটনার জেরে পুকুরপাড়ে এক গাছের ডালে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় ফজলের ভাবি। ফজলে জানে ভাবি তাকে বিশাল এক কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

> ভাবির শরীরের সঙ্গে আমার সমস্ত কলঙ্ক কবরের নিচে ঢাকা পড়ে গেছে। আমাদের গ্রামের সকলেই জানে রেঙ্গুনের বর্মি মেয়ের সঙ্গে আমার ভায়ের পিরিতের সন্দেহ করে ভাবি আত্মহত্যা করেছিল। আসল ব্যাপার যদি সেদিন জানাজানি হত, তাহলে মাওলা বক্স ওইখানেই আমার জীবন থমকে দাঁড়াত। এখনো ভাবির কথা মনে ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যায়। আমার দুঃখ থেকে গেল, ভাবির নামে আমি কোনো প্রতিষ্ঠান করতে পারিনি। জীবনে আমরা যাদের সবচাইতে ভালোবাসি, যারা আমাদেও চলার পথ সুগম করে দেয়, সুদিনে আমরা তাদেরকেই ভুলে থাকি। (মরণ : ২১৪)

চাচাতো ভাবির এই পরিণতির জন্য হাসপাতালে মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকা মন্ত্রী ফজলে ইলাহীর কোনো অনুশোচনা নেই। যা কিছু ঘটেছে তার জন্য সে দায়ী করে ভাবিকে। ভাবির এই আত্মহত্যার জন্য সে কোনোভাবেই দায়ী নয়।

> প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দুর্ঘটনা ছাড়া সব মানুষ নিজেই তার অপঘাত মৃত্যুর জন্য দায়ী। ভাবি আত্মহত্যা করেছে, ওই সমাজে ওই সময়ে সম্মানরক্ষার এটাই ছিল প্রকৃষ্ট পন্থা। এই সময়ে হলে কোনো নার্সিং হোমে সাতদিন কাটিয়ে গর্ভটা পরিষ্কার করে আসত। আমার আমাদের দায়িত্বের কথা বলছ আমার কিসের দায়িত্ব? ভাবিই তো আমাকে উসকে দিয়ে উত্তেজিত করে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। আমি হাতের কাছে ছিলাম তাই সে আমাকে ব্যবহার করতে পেরেছে। আমার অপরাধ কোথায়? আমি তো তার শিকার হয়েছি। আসলে ভাবির চরিত্রটাই খারাপ ছিল। খারাপ মেয়েমানুষ সুযোগ এবং সুবিধেমতো সকলে সঙ্গে খারাপ কাজহ করবে। (মরণ : ২১৫)

মন্ত্রীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে অন্ধকার, মন্ত্রীর পুরোটাই কলুষিত। মন্ত্রী হাসপাতালের বিছানায় বিশ্বস্ত নফরের কাছে একের পর এক নিজের অন্ধকার জগতের উন্মোচন করে নিজের ভেতর পুষে রাখা পাপ হালকা হইতে চাইছে। তার পুরো জীবনটাই নিষ্ঠুরতায় ছোঁয়া, পুরো জীবনটা তার ঢেকে আছে অন্ধকার এক ছায়ায়।

মন্ত্রী ফজলে ইলাহীর আখ্যান বর্ণনার মধ্যদিয়ে ঔপন্যাসিক আমাদের সমাজে ক্ষমতার আসন জেঁকে বসা একদল মানুষের চরিত্র উন্মোচন করেছেন। এরা আদর্শের কথা বলেন, জনগণের টাকা খরচ করে নিজেদের নামে নিজের পরিবারের নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, এরা কারণে-অকারণে মানুষের উপকার করেন। কিন্তু যা কিছু করেন সবকিছুই ক্ষমতার পথ সুগম করার লক্ষ্যে। এরা যা কিছু করেন প্রায় সবই আদর্শহীন, যা কিছু করে এদের উদ্দেশ্য থাকে নিজেদের স্বার্থ আদায়। মরণবিলাস উপন্যাসে ক্ষমতার মাঝখানে থাকা আদর্শহীন মানুষের কথা ব্যক্ত হয়েছে। উপন্যাসে যে সক্রিয় মাত্র দুটো চরিত্র। এর মধ্যে একজন চরিত্র বর্ণনা করছেন তার পূর্বজীবনের ইতিহাস আরেকজন তোষামোদি। এরকম চরিত্র আমাদের সমাজে বিরল নয়। এরা এখনো জেঁকে আসে ক্ষমতার চেয়ারে। এরা এখনো আমাদের আশেপাশে। ঘর থেকে বাইরে বের হলেই এ সব চরিত্রের দেখা মেলে। আহমদ ছফা ওই চরিত্রের মুখোশ উন্মোচন করেছেন মন্ত্রী ফজলে ইলাহীর মাধ্যমে।

পূর্ব ফজলের নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডের বিবরণ পাওয়া যায়। সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে হেডমাস্টারের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় ফজলে ইলাহী।

> ফাজিলপুর হাইস্কুলে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল চারশোর মতো। তার মধ্যে মুসলমান ছাত্র পঞ্চাশজনের বেশি ছিল না। আমাদের ক্লাসে আমরা ছিলাম মাত্র তিনজন। তার মধ্যে একজন লেখাপড়ায় খুব ভালো ছিল। ছেলেটার মা-বাবা কেউ ছিল না। হেডমাস্টার মশায় নিজেই তার ব্যয়ভার বহন করতেন। আমি আর আবদুল বাকি দুজন প্রায় প্রতিদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাওয়ার জন্য স্কুলে যাওয়া-আসা করতাম। সাধারণ ছাত্রদের চাইতে গায়ে-গতরে আকারে আয়তনে আমরা ছিলাম লম্বা চওড়া। সেদিন ক্লাসে পড়া

না পারার অভিযোগে বেঞ্চির ওপর দাঁড়াতে হত, আমাদের দুজনের মাথা প্রায় ছাদ ছুঁয়ে যেত। এভাবে প্রতিদিন নিষ্ঠুরভাবে লাঞ্ছিত হতে হতে আমি আর বাকি দুজনেই মনে করতে থাকলাম, মুসলমান বলেই প্রতিদিন বেছে বেছে আমাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়। আমরা দুজন হিন্দু ছাত্রদের, শিক্ষকদের, হেডমাস্টার মশায়কে এমনি তার প্রিয়পাত্র আমাদেও ক্লাসের ফার্স্ট বয় আমিনুল হককে ঘৃণা করতে আরম্ভ করলাম। (মরণ : ২১৮)

স্কুলের খারাপ ছাত্র বাকির প্ররোচনায় সরস্বতী আর ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপর নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। সেই বিরোধের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বিভেদের দিক উন্মোচন করেছেন লেখক। মাওলা বক্সের কাছে মন্ত্রীর স্বাকারোক্তি :

স্বভাবতই ওই সময়ে বাকি আমার অকৃত্রিক বন্ধু হয়ে দাঁড়াল। আমরা আমাদের স্কুলের সমস্ত কর্মকাণ্ড আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্যাখ্যা করতে লাগলাম। স্কুলে হিন্দুর ছেলেরা সরস্বতী পুজো করে, মুসলমান ছেলেরা মিলাদুন্নবি পালন করবে না কেন? এই ভাবনাটা আমাদের মাথা থেকে সরাসরি বেরিয়ে আসেনি। ভারতবর্ষেও রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নটি আস্তে আস্তে শক্তি সঞ্চয় করেছিল। (মরণ : ২১৮)

উপন্যাসে তৎকালীন মুসলমান সমাজের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ মুসলমানরা ছিলেন হিন্দুদের থেকে অনেক পিছিয়ে। হিন্দুরা যেখানে আধুনিক শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করছেন, ইংরেজি শিখছে সেখানে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ে আছে। তাদের কাছে হাইস্কুল, ইংরেজি শিক্ষা শয়তান উৎপাদক। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গের মাধ্যমে মরণবিলাসে দুই গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়ের সামাজিক অবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায় :

ওই এলাকাতে মুসলমানেরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। তবে তাদের অধিকাংশ ছিল গরিব। গ্রামটিকে বর্ধিষ্ণু বলতে হবে। সেই সময়ে ওই গ্রামে উকিল ছিল, ডাক্তার ছিল, এমনকি কিছু কিছু লোক কলকাতা শহরে বড় সরকারি চাকরিও করতেন। সেই তুলনায় মুসলমানদের অবস্থা ছিল একেবারে শোচনীয়। চাষাবাদ, জমিতে মজুর খাটা, পাহাড় থেকে বাঁশ কাঠ লাকড়ি এনে বাজারে বেচে অধিকাংশ মানুষ অন্নসংস্থান করত। হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন উঠলে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ জীবিকা অর্জনের নিরেট বাস্তব সত্যটি ভুলে যেত। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে দুয়েকঘর সম্পন্ন গেরস্থ ছিল। তাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার চল ছিল না বললেই চলে। (মরণ : ২২০)

স্কুলের মাস্টার কুলদা বাবু মুসলমানের নিন্দা করলে বাকি ও ফজলে ইলাহী এক রাতে তার মাথায় প্রস্রাব করে দেয়। উত্তেজিত হিন্দু শিক্ষকেরা এর বিচার দাবি করে। শাস্তি হিসেবে এ দুজনকে বহিষ্কার

করা হলে মুসলমানরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। পীরের ছেলে ফজলে ইলাহীর শাস্তি তারা মেনে নিতে পারেনি। এলাকার একদল মানুষ যখন হিন্দু-মুসলমান বিভেদে প্রবল বিশ্বাসী তখন স্কুলের প্রধান শিক্ষক এগিয়ে এসেছেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার মশাল হিসেবে। তিনি মনেপ্রাণে চেয়ে হিন্দু-মুসলমানদের বিভেদনীতিকে কাজে লাগিয়ে কেউ যেন গোলযোগ সৃষ্টি করতে না পারে। তিনি মুসলমান ছাত্রদেও নিবৃত্ত করেছেন, হিন্দু শিক্ষকদের বুঝিয়েছেন। তিনি মুসলমানদের মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন স্কুলেই। তিনি নবীজির গুণগান করেছেন মিলাদুন্নবীর সভায়।

বাকির প্ররোচনায় ফজলে ইলাহী হেডমাস্টারের ঘরে আগুন লাগানোর পরিকল্পনা করে। আগুন লাগানোর পরিকল্পনা করার কারণ 'হেডমাস্টার তো কংগ্রেসের লোক, কংগ্রেস মুসলমানের শত্রু এ কথা কে না জানে।' রাতের ওই ভয়াবহ আগুনে মারা যান হেডমাস্টারের পোষা ছাগল, মারা যায় স্কুলের ফার্স্ট বয় আমিনুল। সেই আগুন লাগানোর ঘটনা বর্ণনা করেছে মাওলা বক্সের কাছে।

> আমি তো এখন পুলিশ বিভাগের মন্ত্রী। অপরাধীদের মনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু জানি। অপরাধ বিজ্ঞান বলে, অপরাধীকে অবশ্যই তার অপরাধের স্থানে যেতে হবে। আমি কী করেছিলাম জান? জামাটি গায়ে গলিয়ে পায়ে পায়ে হেডমাস্টার মশায়ের ভস্মীভূত ঘরের দাওয়ায় চলে এলাম। লোকজন গিজগিজ করেছে। আমার বুকের ভেতর হাতুড়ির ঘা পড়ছিল। সর্বক্ষণ মনে হচ্ছিল সকলে আমার দিকে অদৃশ্য অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিল, ওই যে যাচ্ছে এই ধ্বংসযজ্ঞের নায়ক। (মরণ : ২৩০)

মন্ত্রী আরো বলছেন :

> হিন্দু-মুসলমান যত মানুষ তাঁকে দেখতে গিয়েছিল, তারা যদি বুঝতে পারত বাকিসহ মিলে আমি আগুন লাগিয়েছি, তাহলে চোখের জ্বলন্ত ঘৃণা দিয়ে আমাদের পুড়িয়ে ফেলত। আরো একটা কথা তোমাকে বলি। মানুষ গায়ের ঘ্রাণে মানুষকে চিনতে পারে। যেমন ধরো হেডমাস্টার মশায়ের ব্যাপরটা। গোটা গ্রামে হিন্দু-মুসলমান দুটি সম্প্রদায়ের সদ্ভাব একেবার শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকেছে। তবু সাধারণ মানুষদের কাছে হেডমাস্টার মশায়ের ভাবমূর্তি একটুকুও ম্লান হয়নি। মুসলমানদের মধ্যে একজন মানুষ ছিল যারা হিন্দুদের প্রাণের থেকে ঘৃণা করে। তথাপি এই মানুষটির ব্যাপারে অধিকাংশের মনের কোণে দয়া এবং মমতা সঞ্চিত ছিল। শুরুতে তো তোমাকে বলেছি, আমি মানুষ নই, আস্ত একটি পশু (মরণ : ২৩১)

সমালোচকের মতে, হিন্দু মধ্যবিত্তের নাক সিটকানো আর পশ্চাৎপদ মুসলমান মধ্যবিত্তের হীনমন্যতা কীভাবে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয়, দেশের প্রধান দুটি সম্প্রদায়কে ঠেলে দেয় সংঘর্ষের দিকে,

প্ররোচনা দেয় দেশভাগের, এই মন্ত্রীর জীবন থেকেই ছফা তার সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাৎপর্যময় চলচ্ছবি লিখে ফেলেন। (ইলিয়াস : ২০০৪)

ফজলে ইলাহী বস্তুবাদী মানুষ বলেই নিজের ভোগ-বিলাসকে প্রাধ্যান্য দিয়েছেন, হিংস্রতা আর যৌনতা তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। বেহেশতে আশ তার নাই। প্রার্থনা-টার্থনায় তার আস্থা নাই। প্রেতাত্মাও তিনি মানেন না। কিন্তু চলতি বিচারে তিনি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করেই রাষ্ট্রীয় জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলাদেশের তথা সারা উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার ভিত্তিটা নতুন করে আলোকিত হয় এই চরিত্রের অভিজ্ঞতায় (সলিমুল্লাহ ২০১৩ : ২৬৫)

মরণ বিলাস উপন্যাসে কলকাতা গ্রেট কিলিংয়ের বর্ণনা রয়েছে। মন্ত্রী ফজলে ইলাহীর স্বীকারোক্তি সে এই গ্রেট কলকাতা কিলিংয়ে অংশ নিয়েছে। ইতিহাস অনুসারে জানা যায়, ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট কলকাতায় সংঘটিত হয় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। এ সহিংসতা হিন্দু ও মুসলমান দুটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজ ঘৃণা ও অবিশ্বাস থেকে সৃষ্টি হয়েছিল।

মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে তথা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করে। উপমহাদেশের সকল স্থানের মুসলমানরা সকল কাজ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যদিকে হিন্দু চনমত পাকিস্তানবিরোধী স্লোগানকে কেন্দ্র করে সুসংগঠিত হতে থাকে। বাংলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তেমন একটা হিন্দু সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। যেহেতু দলের অধিকাংশ সমর্থক ছিল হিন্দু, তাই কংগ্রেস সদস্যদের একটি অংশ পাকিস্তান আন্দোলনকে আসন্ন বিপদ হিসেবে চিহ্নিত করে হিন্দুদের একাত্মতা বিষয়ে প্রবল অনুভূতি প্রকাশ করার প্রয়াস পায়। তাদের প্রচারণা নিঃসন্দেহে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের বিরুদ্ধে হিন্দুদের চেতনাকে প্রজ্জ্বলিত করেছিল।

১৬ আগস্ট ভোরে উত্তেজনা শুরু হয়, যখন মুসলিম লীগের স্বেচ্ছাসেবকরা উত্তর কলকাতায় হিন্দু ব্যবসায়ীদের দোকানপাট বন্ধ রাখতে বাধ্য করে এবং হিন্দুরা এর সমুচিত প্রতিশোধ হিসেবে মুসলিম লীগের শোভাযাত্রাসমূহে বাধা সৃষ্টি করে। ওইদিন অক্টারলোনি মনুমেন্টে লীগের সমাবেশ এ যাবতকালের মধ্যে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সমাবেশ ছিল। সমাবেশ থেকে প্রতিপক্ষ সম্প্রদায়ের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানানো হয়। শুরু হয় দাঙ্গা। সরকারি হিসাব অনুসারে ওই দাঙ্গায় চার হাজার মানুষ নিহত হন, আহত হন লক্ষাধিক। বেসরকারি হিসেবে এ সংখ্যা হয়ত আরো বেশি। তারপরও কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ চলে কলকাতায়। ২২ আগস্টের কলকাতার পরিস্থিতি শান্ত হয়। হিন্দু-মুসলমানদের এই দাঙ্গা কলকাতা গ্রেট কিলিং নামে পরিচিত। (হারুন ১৯৮৭, সুরঞ্জন ১৯৯১)

এতদিন খুনি ফজলে ইলাহীর পরিচয় পাওয়া গেলে মাওলা বক্সের কাছে তিনি জানাচ্ছেন গ্রেট কলকাতা কিলিং মিশনে অংশ নেওয়ার কথা। মননে মন্ত্রী খুনি, মগজেও মন্ত্রী সাম্প্রদায়িক। এই বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে তার কিলিং মিশনের অংশ নেওয়ার কাহিনি প্রকাশের মাধ্যমে :

> আমরা সবাই অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রেট কলকাতা কিলিংয়ে অংশ নিয়েছি। অনেক শিশু, অনেক বৃদ্ধা, অনেক নিরাপরাধ মানুষ মারা পড়েছে। অনেক নারীর সতীত্ব হরণ হয়েছে। এগুলো নিষ্ঠুর হৃদয়হীন কর্ম হতে পারে। কিন্তু আমরা এগুলোতে তত খারাপ মনে করিনি। আমাদের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান আদায় করা। কান মে বিড়ি মুমে পান লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। এ সব কর্মের অনুষ্ঠান না করলে পাকিস্তানের দাবি সফল হত না। আমরা পাকিস্তান সম্ভব করেছিলাম বলে আজকে তোমাদের বাংলাদেশ হয়েছে। খুন, ধর্ষণ, জ্বালানো পোড়ানো, মানুষকে কষ্ট দেওয়া এ সব প্রাণ থেকে সমর্থন করিনে বটে, কিন্তু এসবের প্রয়োজনও অস্বীকার করতে পারিনে।' (মরণ : ২৩৩)

তাহলে কী বোঝা গেল মন্ত্রী ফজলে ইলাহী পাকিস্তান দাবির মধ্যে থেকে উঠে আসা এক লোক, তিনি মগজে ধারণ করেন পাকিস্তান, যিনি কি না স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করেছেন। ভোল পাল্টে তিনি হয়েছেন স্বাধীন বাংলাদেশের আইন প্রণেতা। মননে খুনি, মগজে সাম্প্রদায়িক এই মন্ত্রীর মতো মানুষ আমাদের সমাজে নিশ্চয় বিরল নয়। এরা এখনো পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে মেনে নিতে পারে না, যে দেশের ক্ষমতায় বসেছে সেই দেশকে তারা নিজেদের দেশ মনে করে না। তাইতো মাওলা বক্সের কাছে মন্ত্রীর কথা পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল বলেই তোমাদের বাংলাদেশ হয়েছে। তার মানে এই বাংলাদেশ মন্ত্রীর নয়, অথচ মন্ত্রী ক্ষমতায়। দেশের মালিকানা যার নয়, সেই দেশের ক্ষমতায় এর চেয়ে বড় প্রতারণা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আর কী হতে পারে। মরণ বিলাস এই প্রতারণার গল্পও বটে।

জীবনের কোনোকিছুই অপূর্ণ থাকেনি মন্ত্রী ফজলে ইলাহীর। তারপরও মন্ত্রীর মনে হয় গভীর বিচারে তার কোনো অর্থ সে আবিষ্কার করতে পারে না। মন্ত্রী বুঝতে পারে তার জীবন ব্যর্থ, তার জীবনের কোনো মানে নেই। মন্ত্রী বুঝতে পারেন, 'আজ সূর্য ওঠার আগেই তার মৃত্যু হবে' সুতরাং জীবনের এই নির্মম সত্যটাকে তাকে মেনে নিতেই হবে। নফর মাওলা বক্সের কাছে জীবন সম্পর্কে তার উপলব্ধি :

ভালোমন্দ সবটা মিলিয়েই তো জীবন। তাই বুঝতে পারছি নে কোনটা রাখব, কোনটা বলব। প্রকৃতির সঙ্গে যখন মিলিয়ে দেখি আমি শব্দটির কোনো অর্থ খুঁজে পাইনে। আবার মানুষের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করতে যখন প্রবৃত্ত হই, আমি শব্দটা কী অসাধারণ গুরুত্ব-সম্পন্ন হয়ে ওঠে, কী অপূর্ব ব্যঞ্জনা ধারণ করে সে কথা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমি, কে আমি কী গভীরভাবে চিন্তা করে কোনো অর্থ আবিষ্কার করতে পারিনে।...মাওলা বক্স ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। ফুল ফুটবে, পাখি ডাকবে, ঘাসের ডগায় শিশির ঝলমল করবে, বালিকার শরীরে গাঙের ভরা জোয়ারের মতো যৌবন ভর করবে অথচ আমি থাকব না। হায়ওে মাওলা বক্স, এতবড় নিষ্ঠুর সত্যতা আমাকে মেনে নিতে হবে? হায়রে আল্লা! (মরণ : ২৩৪)

মন্ত্রীর চামচা মাওলা বক্স এতক্ষণ ধরে কেবল কথা শুনেই যাচ্ছে। এই প্রথম মনে হলো তার প্রতিবাদ করা উচিত। মন্ত্রীর সমস্ত অপরাধের বিচার পোড়ার দেশের আইন করতে পারবে না। তাই প্রতিবাদ করতে হচ্ছে মাওলা বক্সকেই। পোড়া দেশে যদি বিচার হতো তাহলে মন্ত্রী তার কৃতকর্মের যথার্থ সাজা পেতেন। পোড়ার দেশে বিচারহীনতা নিশ্চয় ইঙ্গিত দেয় স্বাধীন বাংলাদেশে বিচার না পাওয়ার সংস্কৃতি। এবং বিচার বিভাগের প্রতি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের বিষয়টি চিন্তা করলেও নিশ্চয় দোষের কিছু হবে না।

মন্ত্রী সাহেব আপনার জীবনের সমস্ত অপরাধের খতিয়ান করা হয়নি। সে ক্ষমতাও আমার হবে না। আমাদের এই পোড়া দেশে সুবিচার কোহিনুর পাথরের চাইতেও দুর্লভ। তবু আমি বলব যে-কোনো কলঙ্কিত আদালতের যে- কোনো হাকিমের কাছে আপনার কাহিনী সবিস্তারে উপস্থিত করা হলে আমি নিশ্চিত অন্তত আপনার মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিতেন। অথচ আপনি এখনো বেঁচে আছেন আর অতীতের দুষ্কর্মের সাফাই গেয়ে যাচ্ছেন। আপনার নিজের কৃতকর্মের দায় ইতিহাস সমাজ ওসব বায়বীয় জিনিসের ওপর চাপিয়ে যাচ্ছেন। আমি দুর্বল মানুষ না হলে এক্ষুনি আপনার কণ্ঠনালিটা দুহাতে চেপে ধরতাম। (মরণ : ২৩৫)

মাওলা বক্স কী শোনালেন? তিনি শোনালেন নষ্ট হয়ে যাওয়া এক রাষ্ট্রের ক্ষমতাবান মানুষের কথা। নষ্ট হতে হতে সে দেশ পরিণত হয়ে পোড়ার দেশে। মাওলা বক্সের কথায় প্রমাণ হয় বিচারহীনতার সংস্কৃতি থাকা এক দেশের কথা। যে দেশে ক্ষমতাবানরা আইনের নাগালের বাইরে। কারণ এরা আইন তৈরি করে, যে আইন তৈরি করে এরা সেই আইনের আওতায় পড়ে না। রাষ্ট্রের চোখে আইন সকলের কাছে সমান বলে বিবেচিত হলে পোড়ার এই দেশে আইন ক্ষমতাশীলদের দাশ। তাই তো পোড়ার দেশে সুবিচার কোহিনুর পাথরের চেয়ে দুর্লভ। তাই বলে থেমে থাকেনি মাওলা বক্স। সে

মন্ত্রীর অপকর্মের প্রতিবাদ করেছে। মন্ত্রীর কণ্ঠনালি চেপে ধরার ইচ্ছের কথা ব্যক্ত করেছে। মাওলা বক্স এই প্রথম অন্যায়-অত্যাচারের কাহিনি শুনতে শুনতে প্রতিবাদের ভাষা উচ্চারণ করলেন। মাওলা বক্স ইঙ্গিত দিলেন রাষ্ট্র যদি অপরাধীর বিচার করতে না পারে তাহলে প্রতিবাদ হতে পারে অপরাধীর প্রকৃত বিচার। আর এই প্রতিবাদ জনগণকেই করতে হবে। কারণ মাওলা বক্স ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা জনগণেরই একটা অংশ। তিনি মধ্যবিত্ত জনগণ। সুতরাং প্রতিবাদের জায়গায় মধ্যবিত্তেরও ভূমিকা আছে। মাওলা বক্সেও এই উচ্চারণ মধ্যবিত্তের দায়িত্ববোধকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

মন্ত্রী যত অপরাধ করুন না কেন মন্ত্রী আশাবাদী তার উদ্ধার হবে। তার জীবনের সব আশা এখনো ফুরিয়ে যায়নি। এখনো তার উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়নি।

> জেনে রাখো মানুষ মানুষের বিচারক হতে পারে না। যত অপরাধই মানুষ করুক, তার উদ্ধারের একটা পথ অবশ্যই আছে। তুমি তো ধর্মেকর্মে আস্থা রাখ। নিজামুদ্দীন আউলিয়ার গল্পটা শুনছে। নিরানব্বটা খুন করেও সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। আমি ধরে নিয়েছি ওটা একটা গল্প। তবু অন্তর্নিহিত সত্য আমার ভেতরের মানবসত্তাকে জাগিয়ে দেয়। (মরণ : ২৩৫)

কলকাতা গ্রেট কিলিং মিশনে অংশ নিয়ে মন্ত্রী এক কিশোরকে উদ্ধার করেছিল। মন্ত্রীর কাছে এটিই তার উদ্ধারের একমাত্র পথ। জীবনের যতসব পাপ এই একটি কর্মের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করার চেষ্টা মন্ত্রীর। মন্ত্রী তাইতো মাওলা বক্সের কাছে বলে :

> পাপকর্মসমূহ চারপাশে আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য উন্মত্ত আবেগে উদ্বাহু নৃত্য তরছে। কিন্তু কাছে ঘেঁষতে পারছে না। কিশোরটি আমাকে রক্ষা করছে। মাওলা বক্স আমার মানবজন্ম বৃথা যায়নি। আমারও কিছু সুকৃতি আছে। আমি উদ্ধার পেয়ে যাব। (মরণ : ২৩৬)

গল্প শেষ, মন্ত্রীর উদ্ধার পাওয়ার গল্প শেষ। মন্ত্রী জীবন থেকে উদ্ধার পেলেন। এই মৃত্যুতে মন্ত্রী যেন মাওলা বক্সের মতো মানুষকে উদ্ধার করলেন রাত্রি জেগে পাপের গল্প শোনা থেকে। মন্ত্রীর মৃত্যুত জনগণ আপাতত উদ্ধার পেল, এই আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয় অমূলক নয়।

> পড়ে আছে মন্ত্রীর শরীর। কোনো নড়চড় নেই। মাওলা বক্সের কেমন জানি সন্দেহ হল। নাকের গোড়ায় হাত দিয়ে দেখল আর নিশ্বাসপ্রশ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে না। তা হলে মন্ত্রী কি মারাই গেলেন?...সিগারেটটি শেষ করার পর আবার নাকে হাত দিয়ে দেখল এবং নিশ্চিত হল এবার মন্ত্রী সত্যি সত্যি মারা গেছেন। (মরণ : ২৩৬)

এখন প্রশ্ন আসতে পারে মরণ বিলাস উপন্যাসে সমাজ-রাজনীতির যে চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে তা কি মিথ্যা। বিনা সংকোচে বলা হয় একটা নিরেট সত্যের বন্ধন রয়েছে উপন্যাসে। সত্য প্রকাশে আপসহীনতা যদি লেখকধর্মের বৈশিষ্ট্য হয় তাহলে আহমদ ছফা সেই বৈশিষ্ট্য থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি।

তথ্যসূত্র

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, দ্বি-জাতি তত্ত্বের সত্য-মিথ্যা, বিদ্যাপ্রকাশ, ১৯৯৩, ঢাকা

শাওয়াল খান, *কালের কলকাকলি একটি মরণবিলাস : আহমদ ছফার আবিষ্কার*, আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ, মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ২০০৩

সুদীপ্ত হান্নান, *আহমদ ছফার উপন্যাস : বাংলাদেশের জন্ম ও বিকাশের রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যাকরণ*, সম্পাদক সলিমুল্লাহ খান, আহমদ ছফা বিদ্যালয়, প্রথমবর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, কার্তিক ১৪২১, অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৪

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *আহমদ ছফার পাঁচটি উপন্যাস*, *ভূমিকা*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ফাল্গুন ১৪০১, পৃষ্ঠা : ০৪

Harun-or Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh: Bengal Muslim League and Muslim Politics*, 1936-1947, Dhaka, 1987

Suranjan Das, *Communal Riots in Bengal 1905-1947*, Delhi, 1991 and 1993.

ঙ. মানুষ থেকে দূরে (পুষ্প বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ)

আহমদ ছফার 'পুষ্প, বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ'- এর বৈচিত্র্য এখানে যে, এ উপন্যাস আগেকার উপন্যাস থেকে আলাদা। ছফার পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলো সমাজ ও রাজনীতির প্রতিফলন কিন্তু পুষ্প, বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ উপন্যাসটি ব্যক্তিজীবনের অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। এই আকাঙ্ক্ষা সমগ্র মানুষ জীবন নিয়ে নয়, এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তির অন্তর্জাগতিক চাহিদা পূরণের। ফুল, গাছ, লতা-পাতা-পশু-পাখির প্রতি স্নেহ মায়ার মাধ্যমে আহমদ ছফা নিজ জীবনের সার্থকতা খুঁজেছেন। এই উপন্যাসে প্রেম আছে তবে তা নারীপ্রেম নয়, প্রকৃতির প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম। এই উপন্যাসে ধর্মীয় শোষণ নেই, যুদ্ধ নেই, বিপ্লব নেই, আন্দোলন নেই, গোলাগাগুলি নেই, রাজনীতি নেই, শরণার্থী জীবন নেই। আছে পাখির কথা, গাছের কথা, ফুলের কথা, প্রশান্তির কথা।

কেন তবে বৃক্ষপ্রেম? কেন তবে এই উপন্যাস লেখা?

> আহমদ ছফা বলেছেন, সেটা প্রথমত আমার মা। আমার মা সেটা, এই অনেকভাবে আসছে অনেক সোর্স থেকে। আমার মা যে কোনো গাছ লাগালে-তরকারি গাছি সেটি অবশ্যই ফল ধরতো এবং আমা মা বাগালে ঢুকলে তরকারি গাছগুলো নেচে উঠতো। এবং আমার ভাবি কিন্তু আবার এই বাগানে ঢুকলে গাছপালা ভয় করতো তারে। (নাসির ২০১৩ : ৫৭)

বৃক্ষের প্রতি, পাখির প্রতি, ফুলের প্রতি আহমদ ছফা নগরজীবনে যে প্রেম দেখিয়েছেন তা কি হঠাৎ? না তার মানসলোকে এতদিন এ প্রেম লুকিয়ে ছিল? ইট-পাথরের শহরে এ প্রেম কি আরোপিত, নকল, ফাঁকা কিছু। এর মীমাংসা দরকার। নিছক কি সাহিত্যের জন্য আহমদ ছফা তার পুষ্প, বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ নির্মাণ করলেন? আহমদ ছফা জানাচ্ছেন, তার এই বৃক্ষপ্রেম, প্রকৃতি প্রেম গ্রাম জীবন থেকে পাওয়া। আহমদ ছফা বিজ্ঞানের বরাত দিয়ে জানাচ্ছেন গাছরা প্রাণময় সত্তা, তাদেরকে যারা ভালোবাসে তাদের দেখে গাছ হেলেদুলে ওঠে।

গ্রামজীবনের কথা প্রসঙ্গ আহমদ ছফা বলছেন, নতুন নতুন গাছ দেখি। যতই গাছ দেখি আমি কিনতে চেষ্টা করি। কিনতে না পারলে আমি চুরি করি। এবং যেটা, সেটা হলো কী, তখন গাছের মধ্যে নানারকম গাছ, যেমন কলাগাছ, চৌদ্দ-পনের রকম কলার গাছ আমি জোগাড় করেছিলাম। তারপরে ফুলের গাছ। গোলাপ সে সময়, গোলাপ একটা বিলাস ছিল আমার। তারপরে এই, পরে আমার

ভাইয়ের ছেলেরা এগুলো পেয়েছে। ফুলের প্রকৃতিকে। তারপরে স্কুলে আবার সারদাবাবু বলে এক ভদ্রলোক আমার টিচার জন।

ছফা আরো জানাচ্ছেন, সারদাবাবু উনি বছরের ছয় মাস পাগল তাকতেন। পাগল থাকলে একটা গাছের সঙ্গে কথা বলতে থাকতেন। এবং তার সঙ্গে যে সমস্ত জিনিস উনি, সে সময় যে সমস্ত এক্সপেরিমেন্ট উনি আমাকে নিয়ে করতেন সেগুলো এখন... (নাসির ২০১৩ : ৬১) আহমদ ছফা জানাচ্ছেন, চাষাবাদের কিছুটা কলাকৌশল তিনি সারদাবাবুর কাছ থেকে রপ্ত করেছেন। বিশেষ করে গাছে কলম করার কৌশল তা সারদাবাবুর কাছ থেকে শেখা।

উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আহমদ ছফা জানাচ্ছেন ১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে এক ধরনের মানসিক উদ্বেগাকুল মুহূর্তে, লেখকের ভাষায় একটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় মানসিক অবস্থায় তিনি উপন্যাসটি লেখেন। খানিক উদ্বৃতি দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে :

> ১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাত চলছিলো, সে সময়টিতে মানসিকভাবে আমি অত্যন্ত উতলা হয়ে পড়েছিলাম। আওয়ামী লীগ বিএনপিকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য যেভাবে অনবরত ইত্যাদি করে যাচ্ছিলো, সেগুলোর সঙ্গে আমি মন মেলাতে পারছিলাম না। অন্যদিকে বিএনপিকে সমর্থন করাও আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই কিংকতর্ব্যবিমূঢ় মানসিক অবস্থাতেই আমি একটি উপন্যাস লেখার কাজে হাত দেই এবং 'পুষ্প, বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ' উপন্যাসটি লিখে ফেলি। অল্পদিনের মধ্যেই লেখাটি বই আকারে প্রকাশিত হয়। (ছফা ২০১১ : ১৫২)

যে অস্থিরতার ভেতর বইটির জন্ম, সেই অস্থিরতার মধ্যেই আহমদ ছফা বইটির ইংরেজি ভাষায় রূপদানের চেষ্টা করেন। আহমদ ছফা লিখেছেন :

> দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ছিলো। আমি ছিলাম মানসিকভাবে প্রচণ্ডরকম অশান্ত। নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্যে উপন্যাসটি ইংরেজি করা যায় কি না চেষ্টা করছিলাম। প্রিসিলা (রাজ) নামের একটি স্নেহভাজন মেয়ে আমাকে সাহায্য করতে রাজি হলো। আমি মূলত বই দেখে ইংরেজিটা বলে যেতাম, প্রিসিলা লিখে নিতো। এইভাবে অনুবাদ কাজটি শেষ করে ফেলি। (ছফা ২০১১ : ১৫২)

এমন অবস্থায় মেরি ডানাহমের সাথে আহমদ ছফার যোগাযোগের সেতু তৈরি হয়। আহমদ ছফা যে অনুবাদ তৈরি করেছিলেন তা মেরি ডানাহমের সহায়তায় সংশোধন করেন। সেই অনুবাদটি আজ অবধি প্রকাশিত হয়নি।

সলিমুল্লাহ খান বলছেন, দুর্ভাগ্যের মধ্যে সেই ইংরেজি তর্জমাটি অদ্যাবধি যোগ্য প্রকাশকের অভাবে কোন চিলেকোঠায় পড়িয়াই রহিয়াছে। একপ্রস্ত আমার ঘরেও সেদিন খুঁজিয়া পাইয়াছি। তাহাতে শুধুমাত্র দুটি অধ্যায় পাওয়া যাইতেছে না। মেরির তর্জমাটি আমার বিচারে আরো একটু সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব হইবে না। কেহ ইচ্ছা হয় সম্পূর্ণ আনকোরা তর্জমাও করিতে পারেন। (সলিমুল্লাহ ২০১৩ : ২৫)

আহমদ ছফার পুষ্প, বৃক্ষ বিহঙ্গ পুরাণ আত্মজীবনীমূলক লেখা। এই উপন্যাসে কল্পনার চেয়ে বাস্তবের প্রাধান্য দেখা দিয়েছে বেশি। ব্যক্তিমনের অনুভূতির প্রকাশ হয়েছে। আহমদ ছফা উচ্চারণ করলেন প্রকৃতিপ্রেমের কথা। মানুষ যখন অবিবেচনাপ্রসূতভাবে নিজে প্রকৃতি নষ্ট করছে, নষ্ট করে প্রকৃতির স্বাভাবিক ভারসাম্য, গাছ-গাছালি নষ্ট করছে, পাখি নিধন চলছে। তখন ঔপন্যাসিক শোনালেন এদের প্রতি প্রেমের কথা। ঘরের ছাদের আশেপাশে যত পাখি আসে, আশেপাশে যত গাছ-গাছালি আহমদ ছফা মনে করেন সবকিছুর মালিকানা তার। লেখকের সমস্ত চেতনা তাদের কারণে আচ্ছন্ন।

> আমার ছাদটি ঘেঁষে একটি নারকোল গাছ দাঁড়য়ে আছে। চিরল চিরল পাতাগুলো বাতাসে ঝিরিঝিরি কাঁপছে। একটা শাখা আমার ছাদ ছুঁয়েছে। গায়ে হলুদ ফুল এসেছে। হঠাৎ করে চোখে পড়ে না। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে তবেই দেখা যায়। নারকোল গাছটির পাশে আরেকটি নারকোল গাছ। সেটির মাথা বাড়ি ছাড়িয়ে গেছে। শুধু কাণ্ডটি দেখা যায়। আমার দক্ষিণের জানালা বরাবর একটি আমগাছ। গাছটি যথেষ্ট উঁচু নয়। শাখাপ্রশাখা পত্রপল্লব মিলিয়ে গাছটির নিজস্ব একটি সংসার রয়েছে। এই গাছে নিবিড় পাদার আড়ালে কাকেরা রাত্রিযাপন করে। ভোরের অনেক আগে থেকে দোয়েলেরা শিস দিতে থাকে। একটু বেলা হলে এক ঝাঁক বুলবুলি কোত্থেকে উড়ে এসে ডালে ডালে ছুটোছুটি করে। আসে ঝুঁটিশালিক, গাঙশালিক। দুটো ঘুঘু গলা ফুলিয়ে যখন ডাকে, আমার গ্রামের ছাড়া ভিটির কথা মনে পড়ে যায়। এত পাখি দলে দলে, এা একা জোড় বেঁধে কোথা থেকে আসে? আমি কি জানি কোথায় পাখিদের দেশ। একঝাঁক সবুজ টিয়ে আকাশে চক্কর দিয়ে বেড়ায়, তাদেও কর্কশ আওয়াজ কানে এসে লাগে। বিশাল আকাশের প্রাণস্পন্দরের মতো তাদের ওড়াউড়ির শব্দ আমার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে রাখে। (পুষ্প : ৪৭৩)

গল্পের প্রথমদিকে আসে যত্ন করে একটি তুলসী গাছের চারা পালনের কথা। লেখকের পালক ছেলে সুশীল আধমরা তুলসী গাছটি পালন করে। খ্রিস্টান বলে তুলসী গাছ কোনো কাজে লাগবে না জানালেও সুশীল জানায় তুলসী গাছটিকে সে বাচিয়ে তুলবে। কেননা তুলসী গাছ কেবল নির্দিষ্ট কোনো

সম্প্রদায়ের গাছ নয়, এটির কাজ মানুষকে উপকার করা। তুলসী গাছ পালনপ্রক্রিয়ায় যুক্ত হলেন ছফাও।

> অল্প কিছুদিন না যেতেই তুলসী গাছের ডালপালা শাদামতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলে ছেয়ে গেল। নয়নতারায় লাল বরন ফুল এল। প্রতিদিন কত ফুলই তো দেখি। তুলসী এবং নয়নতারার ফুল দেখে প্রাণে যে হিল্লোল জাগে, অন্য ফুলে তেমন হয় না কেন? বোধ হয় প্রাণের সঙ্গে সংযোগটি স্থাপিত হয়নি বলে। এই তুলসী এবং নয়নতারার শিশুগুলোকে একদম মৃত দশা থেকে বেঁচে উঠতে দেখেছি। আমার পালক ছেলে সুশীলের হাতের অনেক যত্নের পরশ পেয়ে তারাও বাড়ির ছেলের মতো বেড়ে উঠেছে। আমি যখন তুলসী এবং নয়নতারার ফোটা ফুলগুলো দেখি সেগুলোকে জীবনের সংগ্রামলব্ধ বিজয়-মুকুটের মতো মনে হয়। তুলসী এবং নয়নতারার ফুল দেখে আমার জীবনের প্রতি আস্থা এবং বিশ্বাস নতুন করে জন্মায়। আমার ভেতরে কে যেন বলে যেতে থাকে তোমার জীবনে দুঃখ কষ্ট যা-ই আসুক, তুমি ভেঙে পড়বে না। এক সময়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ তুমি পাবে। নীরবে তুমি কাজ করে যাও, ফুলের বাবার সাধ্যি নেই, না ফুটে থাকতে পারে। (পুষ্প : ৪৭৭)

এর মধ্যে সুশীল একটা কাণ্ড করে বসল। নীলক্ষেতে চিড়িয়ার দোকানে গিয়ে একটু ঝুঁটশালিক কিনে খাঁচায় ভরে ঘরে নিয়ে এল। শালিকটি যাতে ভালোভাবে হাঁটাচলা করতে পারে, সে জন্য হাজার টাকা খরচ করে বড় খাঁচা কিনলাম। এই শালিকটিকে লাল নীল হলুদ এসব রঙের একেকটি একেকদিন পানিতে গুলে গুলে স্নান করিয়ে তার পালকের রং পালটে দিতাম। আহমদ ছফা উল্লেখ করেছেন :

> লোকে যখন পাখিটির নাম জানতে, একেক সময় একেক নাম বলতাম। কখনো বলতাম পাখিটি কামস্কাটকা থেকে আনা হয়েছে। কখনো কিলিমাঞ্জরো কিংবা উরুগুয়ে এ সকল দেশের নাম বলতাম। লোকে অবাক হয়ে পাখিটির দিকে তাকাত। শালিকের সঙ্গে আমার শৈশবকালীন প্রণয়ের একটা দগদগে ক্ষত মনের ভেতর লুকিয়ে আছে। পাখিটি উপস্থিত মুহূর্তে ভিন দেশী পরিচয় নিয়ে খাঁচায় ঘোরাফেরা করুক, অথবা ছাতু খেতে থাকুক। আমাকে বৃক্ষ সমন্ধীয় উপলব্ধির বিষয়টি প্রকাশ করতে হবে। (পুষ্প : ৪৭৮)

বৃক্ষের সঙ্গে থাকতে থাকতে আহমদ ছফার মনে বোধ তৈরি হয়ে জীবনের। বৃক্ষেরও জীবন আছে, মানুষের সঙ্গে বৃক্ষের আশ্চর্য মিল এখানে। তবে জীবনের প্রকাশ ভিন্ন। বৃক্ষ জীবন থাকলেও সে জড়শক্তি অপরদিকে মানুষ গতিশীল। অন্তরের অনুভব থাকলেই কেবল বৃক্ষের প্রাণস্পন্দন উপলব্ধি করা যায়। ছফা জানাচ্ছেন :

> অনেক পূর্ব থেকে আমার মনে একটা ধারণা জন্মেছে। আল্লাহতালা তার গোপন বাতেনি শক্তির একটা অংশ বৃক্ষজীবনের মধ্য দিয়ে ক্রিয়াশীল করেছেন। এই কারণেই একদিন না একদিন মানুষকে বৃক্ষের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করতে জয়। মানুষ যদি বৃক্ষের শরণাগত না হয়, তার জীবনীশক্তিই জীবনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। ভেবে দেখুন আল্লাহ কী পরিমাণ বুদ্ধিমান। বৃক্ষের ভেতরে যে সকল সরল জীবন-জীবন প্রবাহ স্পন্দিত হয়, তার সঙ্গে মানুষের হৃদস্পন্দরের অবশ্যই একটা মিল আছে। প্রকৃতিগতভাবে উভয়ে একই বস্তু। কিন্তু তারতম্য জচ্ছে শক্তি ও গতিশীলতার। একজন পুরুষ একজন নারীর সঙ্গে যেভাবে সম্পর্ক নির্মাণ করে, সেভাবে একজন মানুষ একটি বৃক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু কোন মানুষ? যিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে পারেন, বৃক্ষের একটি জীবন্ত সত্তা রয়েছে, অন্য যে কোনো প্রাণীর মতো। (পুষ্প : ৪৭৮)

ওই বাসাটিতে কেবল তুলসী গাছ নয় একে একে লাগানো হয়েছে কমলা গাছ আঙুর গাছ। কমলাগাছের প্রতি প্রেম প্রকাশ প্রসঙ্গে উপন্যাসে উঠে এসেছে চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের কথা। ছফার মানসপটে এস এম সুলতানের বিশাল প্রভাব ছিল। জীবনযাপনে বোহেমিয়ানাপনা থাকায় দুজনের রসায়ন মিলেছিল যুতসই। সুলতান প্রসঙ্গে আহমদ ছফার মনোভাব :

> এই সয়েলের সবচেয়ে বড় পেইন্টার। আবার দার্শনিকও। তার এই দিকটা কেউ উন্মোচন করল না। প্লেটো এরিস্টটলের দরকার। আমাদের সমাজে এরিস্টটলের খুবই অভাব। সবাই সক্রেটিস হতে চায়। (নাসির ২০১৩ : ১৪)

আহমদ ছফার মানসপটে ভেসে ওঠে ফেলে আসা এক কমলা গাছের কথা। এই কমলা গাছ ঘিরে সুলতানের প্রতি ছফার অভিমানও প্রকাশ পেয়েছে :

> কমলা গাছটি ছাদ ছুঁইছুঁই করছিল, ড্রাম থেকে উঠিয়ে নিয়ে পেছনে পাম্প হাউজের কাছে গভীর গর্ত করে চারদিকে পুনঃরোপণ করেছিলাম। গাছটি টিকে গিয়েছিল। আমি যখন সুলতানের ফ্ল্যাটটি বেচি, সুলতান কথা দিয়েছিল সে গাছটিকে সেবাযত্ন করবে এ কারণে সুলতানের কাছে অন্তত পঞ্চাশ হাজার টাকা কম নিয়েছিলাম। আমি সময়ে গাছটির খবর নিতাম। একদিন শুনলাম গাছটিকে কেটে ফেলা হয়েছে। এখন যদি আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, আমার মনে হয় না তার সঙ্গে আমি প্রসন্নভাবে কথাবার্তা বলতে পারব। (পুষ্প : ৪৭৯)

কেবল কমলা গাছ নয়, আঙুরের প্রতি তার ছিল মোহনীয় আকর্ষণ। আঙুর গাছের প্রতি ছফার প্রেম প্রকাশ পেয়েছে। আঙুর গাছ সম্পর্কে তিনি বলছেন।

> এমনিভাবে আদর জানাতে এক সময় অনুভব করি এই তরুশিশুটির প্রতি আমার এক বিশেষ মায়া জন্মে গেছে। তাড়াহুড়োর কারণে কখনো যদি গাছটির শিয়রে হাত না বুলিয়ে বাইরে যাই, আমার মনটা আপনাআপনি আইটাই করতে থাকে। আপেলশিশুর পত্রপল্লব আকর্ষণ করে আদর না জানালে রাতে আমার ঘুম আসতে চায় না। আফেল গাছটি দিনে দিনে যেমন বাড়ছে, তেমনি আমার চেতনায়ও সে একটু একটু করে সে অল্প অল্প স্থান দখল করে নিচ্ছে। একদিনের জন্য কোথাও যেতে হলে আমার মনটা ধক কওে ওঠে। আমি চলে যাই বৃক্ষশিশুটি একেবারে একা থাকবে। (পুষ্প : ৪৮০)

এস এম সুলতানের প্রভাবে ছবি আঁকার আগ্রহ তৈরি হয়েছিল আহমদ ছফার। অল্প কিছু ছবি আঁকতে পারলেও আফসোস তার রয়ে যায়। আহমদ ছফা প্রকৃতিতে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। রঙ তুলির প্রতিভা অনুকূলে থাকলে এই বৃক্ষপ্রেমকে তিনি ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু যথার্থ শিল্পী না হওয়ার রয়ে গেছে তার সীমাবদ্ধতা। আহমদ ছফা বলেন :

> আমার একটা খুব বেদনার কথা হচ্ছে আমি পেইন্টার না। পেইন্টার হলে আমি যখন রাস্তা দিয়া যাই, গাছগুলো যখন দেখতে থাকি গাছের যে বাক, গাছের যে ডাল, ওঠা-নামা, এই যে শরীরের গঠন প্রকৃতি, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের দিকে যাওয়ার সময় অথবা সিলেটের তামাবিল অঞ্চলে, এখন চট্টগ্রাম অঞ্চলে দিকে যাওয়ার সময়, এগুলোর উপর আমি মনে মনে খুব জৈবসত্ত্বা আরোপ করে দেখতে পাই। (নাসির ২০১৩ : ১০২)

আহমদ ছফার আপেল গাছ সম্পর্কে জার্মান উন্নয়ন সংস্থা নেটৎসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা টোবিয়াস শুয়েট উল্লেখ করেন, আহমদ ছফাকে নিয়ে কিছু বলতে গেলে আমি ওঁর আপেল গাছের গল্প দিয়ে শুরু করি। ছফা ছিলেন গল্পের মানুষ, সে সব গল্প তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার, নিজের বলা এবং লেখা। আর আছে ওঁকে নিয়ে অন্যদের করা গল্প। যিনি ছিলেন একাধারে বিপ্লবী, প্রেমিক নারী, মরমী, মানবতাবাদী, স্বাপ্নিক, কবি কিংবা তারও চেয়ে বেশি কিছু। ওঁকে বিশেষ বিশেষণে বাঁধা যায় না। ওঁকে নিয়ে গল্পই কেবল বলা যায়।

...এক নার্সারিতে ছফা একটি আপেল চারা পেয়ে নিব বাগানে রোপণ করেছিলেন। প্রতি বিকেলে চারাটির সঙ্গে উনি কথা বলতেন, আলতো করে ছুঁয়ে দিতেন। চারাটি আরেকটু বড় হলে প্রায় বিকেলেই এর পাশে বসে পড়তেন অথবা কাজ করতেন। এক সময় ছোট গাছটি ছফার কাঁধ ছুঁতে শুরু করে। হ্যাঁ, সত্যিই বাতাসের দোলা ছাড়াই গাছটির একটি শাখা প্রতিদিন ওর কাঁধ ছুয়ে দিত। প্রথমবার শুনে আমি বিশ্বাস করিনি। আমি নিজেকে বলেছিলাম, গল্পটা মিথ্যা নয়-ছফা স্বভাববশত সত্য ও আবিষ্কারের ভেদরেখা পেরিয়ে আরও বড় কোনো সত্য তুলে ধরতে চাইছেন।

টোবিয়াস শুয়েট আরো লিখেছেন, এটা অবশ্যই সত্য যে গাছটি তার পরিচর্যাকারীকে ভালোবাসত। গাছটি আক্ষরিক অর্থে ওঁকে ছুঁয়ে দিত। নাকি কাব্যিকভাবেই মাত্র ছুঁয়ে যেত সে ভেদাভেদ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।...একবার ছফাকে কলকাতায় যেতে হয়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন যাওয়ার আগে হাছটির জন্য বিশেষ কিছু কওে যাওয়া উচিত। গাছে বেশ করে সার দিয়ে গেলেন। কলকাতায় গিয়ে তিনি স্বপ্নে দেখলেন গাছটি কাঁদছে। প্রতিটি পাতা থেকে কান্না ঝরছে, পাতাগুলি বিবর্ণ হলুদ হয়ে হেছে, ঠিক যেন পুড়ে গিয়েছে। প্রচণ্ড অস্থিরতায় উনি পরদিনই কলকাতা ভ্রমণ বাতিল করলেন, পরের টিকেটেই ঢাকায় ফিলে এলেন আপেল গাছের কাছে। দেখলেন স্বপ্নে যা দেখেছিলেন সত্যি সত্যি তাই ঘটেছে। সব পাতা বিবর্ণ হলুদ ও শুষ্ক হয়ে গেছে, গাছটি যেন মারা গেছে। আসলে ভুল সার প্রয়োগ করা হয়েছিল। ছফা গাছটি তুলে, এর শেকড়বাকড় ধুয়ে অন্য জায়গায় লাগিয়ে দিলেন। গাছটি আবার বেঁচে উঠল। কিন্তু গোটা একটি বছর গাছটি ওঁকে আর ছোঁয়নি। (টোবিয়াস ২০১৪ : ৩)

টোবিয়াস শুয়েটের উপরিউক্ত বর্ণনার মিল আছে পুষ্প, বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ উপন্যাসে। আহমদ ছফা লিখেছেন :

> একজন হাতুড়ে মৃত্তিকাবিজ্ঞানী আমার কাছে এসে একদিন ঘটা করে বলল, আমি যদি আপেল গাছের গোড়ায় মাটির আঁশ বদলে দিতে পারি তাহলে আপেল ধরবে এবং মিষ্টি হবে। সে আমাকে গাছের গোড়া খুঁড়ে তাজা চুন দেওয়ার পরামর্শ দিল। আমি সেই হাতুড়ের কথা শুনে গোড়ায় মাটি উঠিয়ে নিয়ে গর্ত করে এক কেজি চুন মিশিয়ে দিলাম। এই কর্মটি করার পর আমাকে কলকাতায় যেতে হলো। এক সপ্তাহ সেখানে থাকতে হল। আরো তিনদিন থাকার কথা ছিল। একরাতে স্বপ্ন দেখলাম, আমার আপেল শিশুটির প্রতিটি পাতা থেকে টুপ টুপ করে পানি ঝরছে। (পুষ্প : ৪৮১)

এরপর আপেল গাছের চারাটিকে অন্য জায়গায় রোপণ করা হয়। আহমদ ছফা লিখেছেন :

> আপেল শিশুটিকে অন্য জায়গায় রোপণ করলাম। বেঁচেও উঠল। কিছুদিন না যেতেই ডালপালা ঝাঁকড়া দিয়ে উঠল। কিন্তু বেদনার সঙ্গে লক্ষ করলাম, আমি কাছে দাঁড়ালে তার ডালপালা আমার শরীর স্পর্শ করতে ছুটে আসে না। আমার ওপর তার ক্ষোভ অভিমান এবং অবিশ্বাস গাঢ়মূল হয়েছে। একবার আমি তাকে খুন করার চেষ্টা করেছি। সে কেন আমাকে প্রীতি নিবেদন করবে। তার অবিশ্বাস এবং সন্দেহ দূর করতে আমার চারমাস সময় লেগেছে। গাছ কিছুই ভোলে না, সবকিছু মনে রাখে। (পুষ্প : ৪৮১)

কেন এই ফুলের কাছে বৃক্ষের কাছে, প্রাণীর কাছে মানবের আত্মসম্পর্ণ। আহমদ ছফা তার উত্তর দিয়েছেন। ব্যক্তিজীবনে আহমদ ছফা ছিলেন রাজনীতিমুখর মানুষ। তিনি বিপ্লবের পক্ষে ছিলেন। তিনি

চাইতেন সমাজে শোষণ পদ্ধতির পরিবর্তন হোক, প্রতিষ্ঠিত হোক গণমানুষের অধিকার। কিন্তু নানা কারণে তাকে হতাশ হতে হয়েছে, মানুষের মধ্যকার বিভেদ, সংঘর্ষ, হানাহানি ব্যথিত করেছে শিল্পীর সরলমন। আহমদ ছফা তাই চলে এলেন প্রকৃতির কাছে।

> বানের জল সরে গেলে যেমন পড়ে থাকে থিকথিকে কাদা, বিপ্লব করার প্রাথমিক জোশ কেটে যাওয়ার পর অবিশ্বাস, সংশয়, কাদা ছোড়াছুড়ি এগুলো ওপরে উঠে আসতে শুরু করেছে। অতীত শোভাযাত্রা স্লোগান এ সবের কথা যখন ভাবি মনে হতে থাকে নায়াগ্রার জলপ্রপাতের গর্জন আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। কোথায় বিপ্লব, আকাশের পূর্বে জেগে ওঠা রঙিন রামধনুর বিলীয়মান আভার মতো সবকিছু কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। এই এতগুলো বছর কোন মরীচিকার পেছনে ছুটলাম! এখন অনুভব করছি আমি ভীষণ ক্লান্ত এবং ভীষণ একাকী। (পুষ্প : ৪৮২)

তারপরও ঘুরে দাঁড়ানোর আত্মবিশ্বাস পেয়েছেন সামান্য এক বেগুন চারার কাছ থেকে। পুষ্প, বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণে সামান্য এক বেগুন চারা হয়ে উঠেছে হতাশাগ্রস্ত মানুষের জীবন আকাঙ্ক্ষার তীব্র প্রতীক, ওই বেগুন চারা হয়ে উঠেছে সংশয়াপন্ন মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতীক।

> এই থ্যাঁতল্যানো বেগুনের চারা যদি উঠে দাঁড়াতে পারে, আমারো তো হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমার সম্ভাবনার পথ এখনো বন্ধ হয়ে যায়নি। আছে, এখনো আমার আশা আছে। আমি আবার নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করতে পারি।...চারাটিকে এভাবে বেঁচে উঠতে দেখে আমার মনের পেশি সকল মনের ভেতর শিশুর হাত-পা ছোড়ার মতো করে ঢেউ তুলতে লাগল। এখনো আমি একেবারে আনকোরা তরুণ। যদি লেগে পড়ি কতকিছু তো করতে পারি। (পুষ্প : ৪৮৩)

আহমদ ছফা আবার ফিরে যান নিজ অতীতে। রাজনীতি জীবনের ব্যর্থতার দিকে। একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন কিন্তু বিপ্লবের ফল চোখে পড়েনি। একজন ব্যর্থ বিপ্লবীর নানা হতাশার প্রমাণও পাওয়া যায় আলোচ্য উপন্যাসে :

> আমি অন্তত ১০ বছর কাজ করেছি বিপ্লবের পেছনে। এই এতদিন একটানা দিনরাত কাজের ফল কী হয়েছে দেখবার সুযোগ কোনোদিন হবে না। কৃষ্ণের গরু চরানোর মতো। ছোটবেলায় বায়োস্কোপের চোঙে মুখ লাগিয়ে দেখতাম বায়োস্কোপওয়ালা বামহাতে কার্ড পাল্টাছে, তার বাম হাতে ঘণ্টি টুংটুং বাজাচ্ছে, মুখে সুর করে উচ্চারণ করে যাচ্ছে- আকারে দেখো প্রকার দেখো, জার্মানির যুদ্ধ দেখো বন্দুক দেখো, কত কত সৈন্য দেখো, আগ্রার তাজমহল দেখো, রাম-রাবণের লড়াই দেখো, বীর হনুমান দেখো, সীতা দেবীর কাঁদন দেখো, ছিরি কৃষ্ণের মন্দির দেখো...। এই দেখো দেখো মধ্যে কৃষ্ণের গরু চরানোর আটটেমও ছিল। এক মানুষ কঞ্চি হাতে বিশাল চারণভূমিতে ছুটে বেড়াচ্ছে, মলমূত্র পরিষ্কার করে যাচ্ছে,

> কিন্তু যে গরুগুলো চরে বেড়াচ্ছে সেগুলো দেখা যাচ্ছে না। একেই বলে কৃষ্ণের চরানো।...বিপ্লবের কাজ কৃষ্ণের গরু চরানো। কাজ করে যাবে ফল দেখবে না। দেখতে পাবে না। (পুষ্প : ৪৮৫)

পুষ্প এবং বৃক্ষের পরিচর্যার মাধ্যমে আহমদ ছফার অনুভূতি তিনি সত্যিকার একজন চাষা হওয়ার পথে। কারণ তার অস্তিত্বে মিশে আছে পূর্ব-পুরুষদের চাষা হওয়ার বংশপরম্পরার ইতিহাস। আহমদ ছফা উঠেছেন এক চাষা পরিবার থেকে। যে পরিবার বাঙালি মুসলমান পরিবার। এক চাষা মুসলমান পরিবার থেকে তার উঠে আসা। আহমদ ছফা বিশ্বাস করতেন নিজেকে চাষা পরিচয় দেওয়ার মধ্যে অগৌরবের কিছু নেই। যারা বরং চাষার অস্তিত্বকে স্বীকার করে না তাদের মতো অকৃতজ্ঞ আর কেউ নেই। এই চাষা চেতনার মাধ্যমে আহমদ ছফা যেন নিজ অস্তিত্বের কাছে ফিরে গেলেন, তিনি ফিরে গেলেন শেকড়ের কাছে, সমর্পিত হলেন মাটির কাছে, ধরা পড়লেন অবারিত সবুজের মাঝে।

> চাষা হয়ে ওঠার একটা আনন্দ আছে। আমি যে মাটিটা কোপাচ্ছি, সেই মাটিটাই ফলে ফসলে ভরে উঠবে, ভাবতে বেশ ভাল লাগছে। নিজের শরীরের মেহনতের একটা মূল্য আছে, আর কোনো কাজে এমন অনুভব করা যায় না। (পুষ্প : ৪৮৯)

আহমদ ছফা যে গাছগাছালি প্রেমের কথা বলছেন তার অধিকাংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঘিরে। আহমদ ছফা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে থাকাকালে বিক্ষিপ্তভাবে ঘরোয়া চাষাবাদে যুক্ত হয়ে পড়েন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এই উপন্যাসে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চাষাবাদ সম্পর্কে আহমদ ছফা উল্লেখ করেছেন :

> এক সময় সত্যি সত্যি জুরাইন থেকে ঠেলাভরতি গোবর আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের মাঠের গোড়ায় এল। সেই দিনটাকে আমরা উৎসবের দিন বলে ধরে নিয়েছিলাম। আমি, নীনু, কোয়েল বস্তাগুলো পৌঁছুতে পৌঁছুতে ঠেলা দিয়ে নামিয়ে কোপানো জমিটার কাছে নিয়ে এলাম। বস্তা খুলে গোবর এক জায়গায় জড়ো করে দুহাত দিয়ে কচলে কচলে চাকাগুলো ভেঙে মিহি করে নিলাম। এই গোবরের চাকা গুঁড়ো করতে করতে গুবরেপোকার সঙ্গে পরিচয় ঘটল। (পুষ্প ৪৯৩)

ক্যাম্পাসে কোপানো জমিতে চারা লাগানো প্রসঙ্গে আহমদ ছফা বলছেন :

> শুক্রবারে চারা লাগানো শুরু করার পূর্বে আপনাআপনি একটা উৎসব জমে গেল। আমরা কাউকে ডাকিনি। অথচ অনেক মানুষ এসে আমাদের সঙ্গে জুটে গেল। তাদের অনেককেই আমরা চিনিনে। চারা লাগাবার একটি আলাদা আনন্দ আছে। মানুষ হয়তো সচেতনভাবে বুঝতে পারে না, কিন্তু অবচেতনে একটা অনুভূতি ক্রিয়াশীল থাকে। চারা লাগানোর মধ্যে যে

একটা অমল আনন্দ আছে, তার কারণ বোধ করি ওই যে তার সঙ্গে অমরতার একটা আকাঙ্ক্ষা যুক্ত থাকে। প্রকৃত কৃষক যেমনভাবে ক্ষেতের কাজে সাহায্য করে আসা বেগার দেয়া লোকদের আপ্যায়ন করে, আমাদেরও সে রকম সামান্য খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করতে হল। মুড়ি আনা হল, মোয়া আনা হল, নারকোল কুরিয়ে সবাইকে পরিবেশন করতে হল। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মাঠটিতে চাষাবাদ করার মতো একটা মহৎ কাজের আয়োজন করতে যাচ্ছি। সংবাদ শুনে যাঁরা স্বেচ্ছায় সাহায্য দিতে ছুটে এসেছেন, তাঁদের খালিমুখে বিদেয় করি কেমনে। চাষা হওয়ার পূর্বেই আমাদের কৃষক সংস্কৃতি জন্ম নিতে আরম্ভ করেছে। যারা চাষের কাজে হাত লাগিয়ে সাহায্য করেছেন, তাদের মুখে যদি কিছু দানাপানি না পড়ে, তা হলে ক্ষেতের ফসলের অকল্যাণ হতে পারে। (পুষ্প : ৪৯৪)

প্রকৃতিপ্রেমের মধ্যেও বাধা রয়েছে। কোনো প্রেমই নির্বিঘ্ন নয়। আহমদ ছফা ফুল,বৃক্ষ, পাখি নিয়ে থাকলেও সেখানে বাধার কম নয়। তার মানে সৃষ্টিশীল কোনো কাজেই বাধা। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যে চারাগুলো লাগিয়েছেন সেখানেও পাতা খেকো, গাছ খেকো প্রাণীদের ভিড়।

চারা রোপার তো কাজ সারা। নতুন একটা উপসর্গ দেখা দিল। বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে গরু-ছাগল যে স্বাধীনভাবে চরে বেড়ায় সেই জিনিসটি আমরা কেউ ধর্তব্যের মধ্যেই আনিনি। আমরা চারা লাগালে সেগুলো গরু-ছাগল আদর করে ভক্ষণ করতে ছুটে আসবে, আমরাও চিন্তাও করতে পারিনি। কাঁটাতারের বেড়ার ওখানে ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। সেই বড় বড় ফাঁকগুলো দিয়ে এসে বারবার হামলা করতে লাগল। গরু-ছাগলে দোষ দিয়েও কী লাভ। এত সুন্দর বাড়ন্ত ক্ষেত থাকতে কোনো দুঃখে তারা মাছের শুকনো গাসের গোড়ায় কামড় বসাবে। একবার পাচিকেল রঙের একটা গাই এসে টপাটপ বিশ পঁচিশটা বেগুনের চারা শেকড়সুদ্ধ টেনে তুলে মুখ-গহ্বরের মধ্যে অদৃশ্য করে ফেলল। (পুষ্প : ৪৯৫)

কোনো বাধাই গল্পের কথককে আটকাতে পারেনি। নিজের সকল বাধা উপেক্ষা করে ফলমূলের গাছ লাগিয়েছেন, যে সবজিচারাকে লালন পালন করেছেন সেগুলো এখন প্রতিদান দেওয়ার মতো উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। এই প্রতিদান দেওয়ার উপযুক্ত গাছ-গাছালির ঘুরে দাঁড়ানো লেখককে দিয়েছে অসীম আনন্দ।

কার্তিক মাস না পেরোতেই আমাদের ক্ষেতের চারাগুলো এক আজব ঘটনা ঘটিয়ে দিল। সবগুলো চারা এত সবুজ, এত তাজা হয়ে বাড়তে আরম্ভ করল, চোখের দৃষ্টি আপনা থেকেই কেড়ে নিয়ে যায়। ক্ষেতের পাশ দিয়ে যারাই যাতায়াত করে এক নজর বাড়ন্ত চারাগুলোর দিকে না তাকিয়ে কারো উপায় নেই। বেগুন চারাগুলো ঝাঁকড়া হয়ে উঠতে লেগেছে। টম্যাটা চারার বাড় এত দ্রুত ঘটল, গোড়ায় গোড়ায়

আমাদের কাঠি পুতে দিতে হলো, যাতে পাতার ভারে চারা এলিয়ে না পড়ে। মরিচের একহারা চারা বাড়ছে এবং ডালপালা মেলে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ফুলকপির পাতায় সকালবেরার শিমির-বিন্দুগুলো গলানো রূপোর মতো সূর্যালোকে ঝলমল করতে থাকে। থালিতে লাগানো জালি লাউ এবং মিষ্টি কুমড়োর চারাগুলোর লতায় পরিণত হওয়ার আর বিশেষ দেরি নেই। জালি লাউয়ের চারাগুলোর গোড়ায় বরই গাছের শুকনো কাটা ডালগুলো পুঁতে দিলাম। কদিন পরেই তাদের লতানো শরীর থেকে আকর্ষীমূল বেরিয়ে বরইর ডালকে আঁকড়ে ধরবে। (পুষ্প : ৪৯৭)

পুষ্প বৃক্ষের কাহিনির আড়ালে লেখক সবুজের মতো নির্মল অপর এক চরিত্রের অল্পবিস্তর ইঙ্গিত আমাদের দিয়েছেন। যিনি ইত্তেফাক পত্রিকার সাংবাদিক নাজিমউদ্দিন মাস্তান। মননে ও চিন্তায় দুইজন মানুষ এক হয়ে উঠেছিলেন বলেই সম্ভব হয়েছে ছিন্নমূল শিশুদের জন্য স্কুলে দেওয়া। আহমদ ছফা ও নাজিমউদ্দিন মোস্তান চেয়েছিলেন নগরের বুকে যে সব শিশুরা অনাদর-অবহেলায় বেড়ে উঠছে। নগরের সোডিয়াম বাতির মাঝে তাদের চলাফেরা থাকলেও এরা এক অন্ধকার; বুকের মাঝে এক অন্ধকার নিয়ে বেড়ে উঠছে এরা। আহমদ ছফা ও নাজিমউদ্দিন মোস্তান ছিন্নমূল শিশুদের পড়াশোনার দায়িত্ব নেন। শাহবাগের কাঁটাবনে তৈরি করেন এস এম সুলতান পাঠশালা। এ ঘটনা বাস্তব। এই বাস্তবের প্রতিফলন ঘটেছে আলোচ্য উপন্যাসে। নাজিমউদ্দিন মোস্তান সম্পর্কে লেখক বলছেন :

এই সময়ে মোস্তানের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। মোস্তান মানে নাজিমউদ্দিন মোস্তান, ইত্তেফাক পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার। কী করে পরিচয় উপলক্ষটার কথা বলি। পাকিস্তানের পদার্থবিদ প্রফেসর আবদুস সালাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার আবিষ্কৃত তত্ত্বের ওপর একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই শোনার ভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু ইত্তেফাক পত্রিকার রিপোর্ট পড়ে মনে হলো প্রফেসর সালামের তত্ত্বটি বুঝতে আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। এটা তো বড়ই আশ্চর্যের কথা। (পুষ্প : ৪৯৯)

স্কুলে শিশু ছাত্রদের বর্ণনা পাওয়া যায় এভাবে :

যে বাচ্চাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাদের এত উদ্যোগ আয়োজন, তাদের সঙ্গে প্রথম মুলাকাতের দিনে মনে হল আমরা লোহার কাঠে ভোঁতা বটি দিয়ে আঘাত করতে যাচ্ছি। বাচ্চারা বুঝতেই পারল না তাদের কেন লেখাপড়া শিখতে হবে। রাস্তার কাগজ কুড়িয়ে, লোহালক্কড়ের টুকরো সংগ্রহ করে, নিউমার্কেটে মিস্তির কাজ করে, হলের ছাত্রদের ফাইফরমেশ খেটে তারা তো বেশ আছে। অল্পস্বল্প পয়সাও হাতে আসে। সন্ধে হলেই মা-বাবার হাতে আট-দশ টাকা তুলে দিতে পারে। ভদ্রলোকের ছেলেদের মতো অত কষ্ট করে তাদের লেখাপড়া শিখতে হবে কেন, অবসরের সময়টাতে তা ঘুড্ডি উড়ায়, মারামারি করে, গ্রামদেশ থেকে বয়ে নিয়ে আসা হুলি ডান্ডা কিংবা হাডুডু খেলে। হরতালের দিন

রিকশার পাম্প ছেড়ে দেয়, পুলিশের ইটপাটকেল ছোড়ে। এই প্রচণ্ড উত্তেজনার জীবনের মধ্যে লেখাপড়ার স্থান কোথায়। (পুষ্প : ৫০১)

স্কুলেপড়ুয়া এ সব শিশুরা বেড়ে উঠছে অবহেলায়। এদের উল্লেখ করার মতো সামাজিক পরিচয় নেই। এরা জানে না লেখাপড়ার মূল্য। ইট-পাথরের দেয়ালে অনাদর-অবহেলায় বেড়ে ওঠা এ সব শিশুরা আমাদের বর্তমান সময়েও বিরল নয়। চাকচিক্যময় রাজধানীর বুকে এ সব শিশুদের সম্পর্কে উল্লেখ করে আহমদ ছফা ফাঁপা নগরের জীবনযাপনের প্রতি একধরনের বিদ্রোহও তো করলেন। নিশ্চয় এই বিদ্রোহ আমাদের বিবেককে জাগাবে :

দ্বিতীয় দিনে বাচ্চাদের মা বাবাদের পেশার পরিচয় নিতে গিয়ে আমাদো কানে আঙুল দিতে হল। এই বাচচারা কেমন অবলীলা জীবনের নিষ্ঠুর সত্যসমূহ প্রকাশ করতে পারে, সে কথা আমিও স্বপ্নেও ভাবিনি। ধরুন একটা বাচ্চাকে প্রশ্ন করলাম তোমার নাম কী? সে বলল সেলিম। তারপর যখন জিজ্ঞাসা করলাম তোমার বাবা কী করেন? সেলিম মুখ খোলার আগেই পাশের বাচ্চাটি বলে বসল, বড় ভাই অর বাপ ছিঁচকা ঘোর। আরেকটা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলাম তোমার নাম কী? মেয়েটি মুখে আঙুল দিয়ে চুপ করে রইল। জবাব দিল না। পাশের মেয়েটি বলল, বড় ভাই অর নাম মরিয়ম, হের মা ঘরে নাঙ ঢুকায়। দিনে দিনে আমরা এই ধরনের বুলির সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। (পুষ্প : ৫০১)

সাংবাদিক নাজিমউদ্দিন মোস্তানও শিখিয়েছেন অকাতরে। অবহেলিত এ সব বাচ্চাদের পাশে বসিয়েছেন নিজের মেয়েকে। স্ত্রীকে ডেকে এনেছেন, ছবি আকার ক্লাসে যুক্ত করে দিয়েছেন। নাজিমউদ্দিন উচ্চারণ করলেন, বস্তির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশতে না পারলে যথার্থ মানুষ হওয়া সম্ভব নয়। শ্রেণি- বৈষম্যের বিরুদ্ধে এর মতো জোরালো প্রতিবাদ আর কী হতে পারে।

মোস্তান এত অনুরাগ নিয়ে বাচ্চাদের শেখাচ্ছিলেন দেখে মনে মনে আমার খুব ঈর্ষা হত। অফিসের সময়টুকু ছাড়া সমস্ত অবসর তিনি বাচ্চাদের পেছনে দিতেন। নিজের মেয়ে দুটোকেও তিনি বাচ্চাদের সঙ্গে বসিয়ে দিতেন। আমি বললাম একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না মোস্তান? মোস্তানের ওই এক জবাব, বস্তির ছেলেদেও সঙ্গে বসতে না শিখলে কোনো বাচ্চা সঠিক মানুষ হতে পারবে না। মাঝে মাঝে বউটাকে নিয়ে এসে বাচ্চাদের লেখা শেখাতে লাগিয়ে দিতেন। মানুষ নিজেকে এত নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পারে কেমন করে? (পুষ্প : ৫০৫)

আহমদ ছফা বুঝতে পারেন সে ঢুকলে ক্ষেতের চারাগাছ আনন্দে নৃত্য করে। মন্দ মানুষ ক্ষেতে ঢুকলে চারাগাছের শরীরে তাদের স্পর্শ লাগলে চারাগাছ অপরিসীম বেদনায় কাঁদে। গাছের ভাষা তিনি বুঝতে পারেননি, অনুমান করেছেন। দুষ্টু লোকের নজর থেকে বাঁচতে কালো হাড়িতে চুনের ফোটা লাগিয়ে

দিলেন। আহমদ ছফার এই কর্মকাণ্ড মনে করিয়ে দেয় গ্রামীণ চাষা জীবনের সংস্কারকে। ওই যে আহমদ ছফা উঠে আসা চাষা পরিবার থেকে, আহমদ ছফা নিজেকে মনে করতেন জাত চাষা হিসেবে। পুষ্পের সেবায়, গাছ-গাছালির সেবায় আহমদ ছফার জীবনে আর কোনো নারীসত্তা, বাস্তব নারীর অনুপস্থিতি তার জীবনে আসেনি। এই গাছগাছালিকেই নারীপ্রেমের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

> অল্পদিনের মধ্যে বেগুনগুলো এমন আকার পেয়ে গেল অনায়াসে পুষ্ট স্তনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। শুধু বোঁটার অংশটি নেই। তেলতেলে মসৃণ শরীরে হাত বুলোতে কী আরাম। মনে হয় নারীর স্তনের পরশ নিচ্ছি। (পুষ্প : ৫০৭)

আহমদ ছফা চিন্তা করেছেন জীবনে মহৎ কোনো কর্ম তিনি করেননি। আপাতত বিচারে তার জীবন অর্থহীন মনে পারে। তবুও এই সবুজ প্রকৃতির উপাদান আহমদ ছফাকে দান করেছে অনন্যতা। আহমদ ছফা লিখেছেন :

> আমি জীবনে মনে করার মতো কোনো মহৎ কর্ম করিনি। রাজনীতির নেনতৃত্ব দিইনি, সাহিত্যের সেনাপতিত্ব করিনি। পড়াশোনায় কখনো কৃতিত্বের পরিচয় রাখিনি। এই ফলবান প্রেম আমার জীবনে কোনোদিন আসেনি যা আমার জীবনকে একটি স্থির বিন্দুতে দাঁড় করাতে পেরেছে। আমার গোটা জীবনটাই আমার কাছে একদম ফাঁকা এবং অর্থহীন মনে হয়। এ জীবনে আমি এমন কোনো কাজ করিনি যা আমার নিষ্ফল জীবনের ঊষর মুহূর্তসমূহে একটি সান্ত্বনার স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দিতে পারে। তবু আমি যখন পেছনে তাকাই, আমার স্মৃতিতে সেই ফলবান ক্ষেতের ছবিটি মূর্ত হয়ে ওঠে, প্রতিটি গাছ, প্রতিটি চারা, প্রতিটি লতা আলাদা করে শনাক্ত করতে পারি। এই ক্ষেতটি আমার মনে চিরহরিৎ উদ্যান হয়ে বিরাজ করছে। (পুষ্প : ৫১০)

আহমদ ছফা ফুলের কথা বললেন, গাছের কথা বললেন। এবার শোনাচ্ছেন পাখির কথা। আহমদ ছফা উল্লেখ করেছেন,

আমার বড় ভাই একদিন একটি পাখি নিয়ে আসলো, শালিকের বাচ্চা। শালিকের বাচ্চাটাকে আমরা পুষলাম। আমার এখনো মনে আছে সে বাচ্চাটা একদিন পালিয়ে গেলো। পালিয়ে যাওয়ার পরে একদম গাছের মগডালে উঠে বসেছে। আমার ভাই ক্যামনে পাখিটা আবার ধরে নিয়ে আসলো। ধরে নিয়া সেটা আমরা পুষলাম। এই দুধশালিক। তখন এটাকে আমার মা একটু একটু করে আফিম খাওয়াতে লাগল। আফিম খাওয়ার পরে এটা আমরা ছেড়ে দিতাম। পাখিটা আর যেতো না, আফিমের

লোভে লোভে বাড়িতে চলে আসতো। আর শেষে হলো, স্কুলে আসবার সময় মাথার উপর দিয়ে এক্কেবারে উড়ে সঙ্গে সঙ্গে এসে...

আহমদ ছফা আরো বলছেন, সে শালিক যখন মরে গেল, অনেকদিন বাঁচার পর। একটা বুড়ো বিড়ালের থাবা লাগছিলো। তখন শালিকের ব্যথাটা এতো লাগছিলো, অনেক পাখি পুষলাম, কিন্তু শালিকের ঐ জায়গাটা ভরেনি। জীবনের প্রথম মৃত্যু আমার। (নাসির ২০১৩ : ৬৪)

আহমদ ছফা তার পুরাণে এই শালিকের কথা বলেছেন। পাখির এই মরে যাওয়ার ঘটনা কি অতীত জীবন থেকে উৎসারিত। উপন্যাসে বর্ণিত শালিক পাখি, তার আফিম খাওয়ানো এবং মরে যাওয়া এসব তো আহমদ ছফার বাস্তব জীবনেও ঘটেছিল।

> আমার মা আফিম খেতেন। পাখিটাকেও কলার ভেতর করে নিয়মমাফিক আফিম খাওয়াতেন। দীর্ঘদিন কলার মধ্যে আফিমের লোভে ঘরে ফিরত, নাকি পোষ মেনেছে বলে সন্ধেবেলা খাঁচায় এসে ঢুকত বলা মুশকিল। এই পাখিটা যখন মারা যায় শোকে এক সপ্তাহে আমি ঘুমোতে পারিনি। এই পাখিটিকে আমি মরা মানুষকে যেমন কবর দেয়া হয়, তেমনি কবর দিয়েছিলাম। অনেকদিন একা একা পাখিটির কবরের পাশে বসে থাকতাম। (পুষ্প : ৫১৯)

আহমদ ছফার খাঁচা থেকে উড়ে যায় তার এক পাখিপুত্র। এই পাখি শিখিয়ে দিয়ে গেল স্বাধীনতার কথা, মুক্তি জীবনের কথা। খাঁচা ছেড়ে উড়ে যাওয়ার পর আর খাঁচায় ফিরে না আসা এটির প্রমাণ দেয়। আহমদ ছফা বলছেন :

> পাখিটি চলে যাওয়ার পর থেকেই আমার বুকের একটা পাশ কেবলই খালি খালি মনে হতে লাগল। বুকের ভেতরের কিছু বাতাস এমনভাবে বেরিয়ে গেছে, যেন সেখানে একটা ফাঁক তৈরি হয়েছে। শূন্য খাঁচাটি যখন চোখে পড়ত, এই ফাঁকটির কথা বেশি করে অনুভব করতাম। খাঁচার ভেতরে ছাতুর বাটিটি তেমনি রয়েছে, পানির ভাঁড়টি এখনো পানিতে টলটল করছে। কিছুতেই মন মানতে চাইত না, থাকা খাওয়ার এমন পাকা ব্যবস্থা, এর সবকিছু ছেড়ে পাখিটি একেবারে চলে গেছে, এটা কী করে সত্যি হতে পারে? (পুষ্প : ৫২৫)

পিতাপুত্র সম্পর্কের টানা পোড়েন বিহঙ্গ পুরাণের আখ্যানভাগ দখল করেছে। আহমদ ছফা যে পাখিটিকে আদর করে পুত্র মনে করতেন সেই পাখিপুত্র একসময় উড়ে যায়। পাখিপুত্র এখন স্বাধীন। স্বাধীনতার নগদ লাভের মধ্যে সে একটা বান্ধবী জুটিয়ে নিতে পেরেছে। ছফা বলছেন : 'আমার পাখিপুত্রটি একটি বউ জুটিয়ে নিতে পেরেছে, দেখে আমার মনে খুব আনন্দ হলো। মেয়েটি নেহায়েত

পাখি বলে আমি খায়-খরচের দায় থেকে রেহাই পেয়ে গেলাম।' পাখিপুত্রের কাছে ছফার ঋণের শেষ নয়। ছফার ভাষায় :

> আমি পাখিপুত্রটির কাছে অনেক ঋণে ঋণী। সে আমার দৃষ্টি খুলে দিয়েছে, অনুভূতিকে তীক্ষ্ণতর করেছে। পাখির কণ্ঠের বৈচিত্র্য শুনে অনুভব করতে পারি এখনো মানুষের ভাষা কতদূর সীমিত। কতকিছুই আমি জানতাম না। আমার জানালার পাশের পাশের আমগাছটিতে যে দশ-বরোটি বুলবুলি স্থায়ীভাবে বাসা করে থাকে, তার কিছুই আমি জানতাম না। এখন সকালবেলা দরোজা খুললেই দেখি আমার ডাইনে বাঁয়ের বাড়িগুলোর দেয়ালে, গাছে গাছে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলবুলি ছুটোছুটি করছে। এতকাল চোখ বন্ধ করে ছিলাম কেমন করে। (পুষ্প : ৫৩১)

এরপর ছফা যা দেখছেন প্রাণিকুলের মাঝেও হানাহানি। এখানেও দখলদারিত্ব, এখানেও শক্তি প্রদর্শন। আহমদ ছফা যে মানুষগুলোর হানাহানি দেখে বিরাজ করেছিলেন প্রাণী জগতে, পশু জগতে এখানেও বিভেদ হানাহানি ছফার মনকে নাড়া দেয়।

> আমি তাকিয়ে দেখলাম, আট দশটা দাঁড়কাক একজোট হয়ে যেখানেই পাঁতিকাক দেখছে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারপরদিন থেকে দেখতে থাকলাম দাঁড়কাকেরা দলবেঁধে জঙ্গি বিমানের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানেই পাঁতিকাক দেখছে হামলা করছে। কাকের জগতেও হিংস্রতা এবং মস্তানি প্রবেশ করেছে। একসময় হয়তো এমনও হতে পারে দাঁড়কাকেরা এই শহর থেকে পাতিকাকদের তাড়িয়ে দেবে। এখন কথা হলো কাকের রাজ্যে বিপর্যয়ের যে লক্ষণগুলো দেখতে পাচ্ছি, অন্যেরা কি সেভাবে দেখছে? (পুষ্প : ৫৩৭)

এরপর ছফা চলে এলেন আবার মানুষের মাঝে। তার মানুষই তার কাছে শেষ অবলম্বন মনে হয়েছে। ছফার দর্শন সকলে আমার মধ্যে আছে, আমি সকলের মধ্যে রয়েছি :

> মনুষ্যলীলার করুণ রঙ্গভূমিকে আমাকে নেমে আসতে হবে। তথাপি আমার জীবন আমি একেবারে অর্থহীন মনে করিনে। আমার প্রাণে পুষ্পের আঘ্রাণ লেগেছে, জীবনের একেবারে মধ্যবিন্দুতে বৃক্ষজীবনের চলা-অচলার ছন্দদোলা গভীরভাবে বেজেছে, বিহঙ্গজীবনের গতিমান স্পন্দন বারংবার আমার চিন্তাচেতনাকে অসীমের অভিমুখে ধাবমান করেছে। এই পুষ্প, এই বৃক্ষ, তরুলতা, এই বিঙ্গ আমার জীবনকে এমন কানায় কানায় ভরিয়ে তুলেছে, আমার মধ্যে কোনো একাকিত্ব, কোনো বিচ্ছিন্নতা আমি অনুভব করতে পারিনে। সকলে আমার মধ্যে আছে, আমি সকলের মধ্যে রয়েছি। (পুষ্প : ৫৩৮)

আহমদ ছফার পাখিপুত্র খাঁচা থেকে বিদায় নিয়েছে। পাখিটি মুক্ত, একইসঙ্গে এই বোধ পাখিটি প্রতিষ্ঠা করেছে স্বাধীনতা বড় কাঙ্ক্ষিত, স্বাধীনতা বড় প্রতিবাদ। খাঁচা থেকে বেরিয়ে পাখিপুত্রটি এই

প্রতিবাদের ভাষা দিয়ে গেল। অপরদিকে আহমদ ছফা এতদিন প্রকৃতির সাম্রাজ্যে এসে মানুষের নানা অজাচারের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ করেছেন; ব্যস্ত ছিলেন পাখি নিয়ে, ফুল নিয়ে বৃক্ষ নিয়ে। আহমদ ছফা প্রকৃতিরাজ্যে এসে নিজেকে ব্যস্ত রাখলেন চার দেয়ালের সীমানায় কিংবা ঘরের ছাদে। প্রকৃতিরাজ্যেও হানাহানি। তিনি ফিরে এলেন মানুষের মানুষের মাঝে। ঘরের ছাদ থেকে এলেন মনুষ্যলীলার করুণ রঙ্গে। তাই আহমদ ছফার পুষ্প, বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণকে বলা যায় একদিনে বন্দিজীবন অপরদিকে মুক্তি জীবনের মহাকাব্য।

তথ্যসূত্র

নাসির আলী মামুন, *আহমদ ছফার সময়*, *শ্রাবণ প্রকাশনী*, চতুর্থ সংস্করণ, ঢাকা ২০১৩

আহমদ ছফা, '*ড. ড্যানিয়েল ডানহাম এবং আমাদের মুক্তিসংগ্রাম*' আজকের কাগজ, ২৮ জুন ২০০১

সলিমুল্লাহ খান, '*পুষ্প বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ*' ও *মার্কিন দেশের ডানাহ্ম পরিবার*' সর্বজন, আহমদ ছফা বিশেষ সংখ্যা, নবপর্যায় ১৯, ২৬ জুলাই ২০১৩, ঢাকা

টোবিয়াস শুয়েট, *কী পরিপূর্ণ জীবন ! আহমদ ছফাকে মনে পড়ে*, অনুবাদ : সামসুদ্দোহা সাজেন, আহমদ ছফা বিদ্যালয়, প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৪, ঢাকা।

চ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চালচিত্র (গাভী বিত্তান্ত)

আহমদ ছফার 'গাভী বিত্তান্ত' উপন্যাসে স্বাধীন বাংলাদেশ পরবর্তী রাষ্ট্রীয় এক প্রতিষ্ঠানের দুর্দশার কথা, ভঙ্গুরতার কথা ব্যক্ত হয়েছে। রাষ্ট্রের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কীভাবে দিনে দিনে তার মূল আদর্শ ও লক্ষ্যের জায়গা থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে সে বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে উপন্যাটিতে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাজনীতি-শাসনকাঠামোর দুর্বলতার পরিচয় আহমদ ছফার আগের উপন্যাসগুলো পাওয়া গেছে। গাভী বিত্তান্ত উপন্যাসে এসেছে 'নষ্ট রাজনীতির' সঙ্গে নষ্ট হয়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠানের গল্প। এবং এ প্রতিষ্ঠানের গল্পকে প্রকাশের আশ্রয় হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে উপাচার্যের পরিবার ও সংলগ্ন কাহিনিকে। বাইরের দিক থেকে উপন্যাসটি যেমন বিশ্ববিদ্যালয় চালচিত্রের কাহিনি, ভেতরের দিক থেকে একটি পরিবারের নানা সংকট, সন্দেহ, জীবনযাপনের কাহিনিও এই উপন্যাস।

খবরের পিঠেও অনেক খবর থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার স্থান এটি একটি সাধারণ খবর। আহমদ ছফা উপন্যাসের মধ্যে সাধারণ খবরের পেছনের খবর তুলে এনেছেন। এ উপন্যাসে আছে রাষ্ট্রের কথা, আছে ক্যাম্পাসের কথা, আছে রাজনীতির কথা, পরিবারের কথা, আছে গাভীর কথা, আছে বাসনার কথা আছে হিংসার কথা আছে সুখের কথা। সবমিলিয়ে উপন্যাসটিতে প্রকাশ করা হয়েছে নব্বই পরবর্তী নষ্ট সময়ের বাস্তব কথামালা।

গাভী বিত্তান্তে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষপদের প্রভাব এবং সেটিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা ক্ষমতার জগতে সমাজের সবোর্চ্চ ডিগ্রিপ্রাপ্ত ও উচ্চশিক্ষিত বলে কথিত ব্যক্তিদের অদ্ভুত-হাস্যকর বিচরণ। ব্যঙ্গাঘাতে সিদ্ধহস্ত ছফা একটি কামধেনুকে পর্যন্ত বিদ্যাপীঠটির চৌহদ্দিদে অনুপ্রবেশ করিয়েছেন যা জ্ঞানচর্চার নামে চলমান কর্মকাণ্ডকে সার্কাসের ভাঁড়ে পরিণত করেছে।...সমকালীন পাঠে গাভী বিত্তান্ত হয়তো বা খানিকটা নকশা এবং খানিকটা সমকালমনস্ক রচনা মনে হতে পারে, কিন্তু গভীর অর্থে এর আবেদন দূরপ্রসারী। উপন্যাসের যে চরিত্রের অনেকেই এখনও জীবিত এবং যে ঘটনাচক্রকে কেন্দ্র করে আখ্যানভাগ, আজ থেকে পঞ্চাশ, একশো বছর কি তারও অধিককাল পর তা সম্পূর্ণ ভিন্ন তাৎপর্য-উৎসারী হয়ে উঠতে পারে। একটি সমাজ ও রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ জ্ঞানপীঠ বিশ্ববিদ্যালয় কাচের বাক্সে শোভমান বিচ্ছিন্ন বস্তুর মতই শোভমান থাকবে তা আশা করা যে দুরাশার নামান্তর গাভী

বিত্তান্ত সেই সংবাদ জানায়। উল্টোভাবে দেখলে, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রচণ্ডতা অনুভব করবার ব্যারোমিটার ছফা-চিত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়-জীবন ও সংস্কৃতি (মহীবুল ২০০৩ : ৩৩৪)

আলোচ্য উপন্যাসের বিষয় সম্পর্কে আহমদ ছফা বলেছেন :

> বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে এ উপন্যাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ঠিকাদার একটি গাভী উপহার দিয়েছিল। এই গাভীকে ঘিরেই আমার উপন্যাস। বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় নেমে গেছে, আশা করি এই উপন্যাসের মধ্যে আমি দেখাতে পারব। লেখাটি আমি দুই সপ্তাহের মধ্যে শেষ করতে পারব। বিশ্ববিদ্যালয় বলতে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বুঝি। এই বিশ্ববিদ্যালয় আমার আলমামেটর। আলমামেটর শব্দের অর্থ হলো জ্ঞানদায়িনী মা। কে কী মনে করবেন জানিনে। বিশ্ববিদ্যালয় বললেই আমার মনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আসে। এখানে এতদিন থেকেছি যে মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সঙ্গে বাধা পড়ে গিয়েছে। (ছ. সা. স ২০১৩ : ৭৩)

আমাদের চোখের সামনে অনেক কিছু ঘটে যা আমরা অকপটে বলতে বা লিখতে পারি না। সমাজে বিষয়গুলোকে বলা হয় 'ওপেন সিক্রেট'। আমাদের সাহিত্যেও এ ধরনের বিষয় কদাচিৎ আসে। শুধুমাত্র গভীর পর্যবেক্ষণক্ষমতা থাকলেই এ ধরনের বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচনা করা যায়। আহমদ ছফার 'গাভী বিত্তান্ড়' উপন্যাসটি তেমনই এক বিষয়ের ওপর লেখা, যা নিয়ে সচরাচর সাহিত্য হয় না।

উপন্যাসের মূল কেন্দ্র একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং মূল চরিত্র সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নির্বাচিত উপাচার্য মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদ। বিশ্ববিদ্যালয়টির কোনো নাম উচ্চারণ না করলেও বর্ণনার মাধ্যমে তিনি পাঠকের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিষ্কার করে তুলেছেন। তিনি লিখেছেন, 'আমাদের দেশের সবচাইতে প্রাচীন এবং সম্ভ্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয়।' আহমদ ছফা তার সাক্ষাৎকারেও তো স্বীকার করেছেন 'বিশ্ববিদ্যালয় বলতে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বুঝি।' তাহলে সিদ্ধান্তে আসা যায় আহমদ ছফা গাভী বিত্তান্ত উপন্যাসের জন্য যে ভৌগোলিক এলাকা বেছে নিয়েছেন তা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ পদে আবু জুনায়েদের আরোহন এবং এর সামান্য পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী ঘটনাচক্র উপন্যাসটির বিষয়বস্তু।

গাভী বিত্তান্ত উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়েছে শিক্ষক আবু জুনায়েদের উপাচার্য পদে নিয়োগের খবর দিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আগের উপাচার্য সালেহকে নির্বাচনে হারানোর জন্য ডোরাকাটা দল মরিয়া হয়ে ওঠে। এর প্রধান সংগঠক বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অবিবাহিতা শিক্ষিকা দিলরুবা খানম। তিনি শিক্ষকদের অপর দুটি প্যানেল হলুদ দল ও বাদামি দল থেকে বাঘা বাঘা শিক্ষকদের ডোরাকাটা দলে ভিড়িয়েছিলেন। কিন্তু সমস্যা বাঁধে উপাচার্য প্যানেল ঘোষণায়। ডোরাকাটা দলের বারোজন প্রবীণ শিক্ষক পচিশ বছর ধরে অধ্যাপনা করছেন। 'অবসরে যাওয়ার পূর্বে উপাচার্যের চেয়ারটিতে একটু পাছা ঠেকাতে পারলে নিঃস্বার্থ জ্ঞানসেবার একটা স্বীকৃতি অন্তত মেলে।' কিন্তু দেখা দেয় মতবিরোধ। কেউ কারো জায়গা ছাড়তে রাজি নয়। ফলে প্যানেল ঘোষণা দিতে দেরি হয় ডোরাকাটা দলের। দুইজন শিক্ষকের প্যানেল তৈরি হলেও আরেকজন শিক্ষকের নাম প্যানেলে আনতে পারেনি ডোরাকাটা দল। শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্বের মীমাংসা করলেন দিলরুবা খানম। তিনি 'ভ্যানিটি ব্যাগের চেন খুলে ডায়েরি বের করে একটা বাতিল খাতা ছিঁড়ে একটানে মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদের নামটা লিখে দিলেন।'

উপাচার্য নির্বাচনে ডোরাকাটা প্যানেল নির্বাচনে জয়ী হয়। আবু জুনায়েদ প্যানেলের মধ্যে সবচেয়ে কম ভোট পেয়েছিলেন। তারপরও চ্যান্সেলর আবু জুনায়েদকে উপাচার্য নিয়োগ দিলেন। উপন্যাসে উল্লেখ আছে :

> আবু জুনায়েদের উপাচার্য পদে নিয়োগপ্রাপ্তির ঘটনাটি প্রমাণ করে দিল আমাদের এই যুগেও আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা ফ্যাকাল্টির সদস্যবৃন্দ আবু জুনায়েদেও উপাচার্যের সিংহাসনে আরোহণের ব্যাপারটিকে নতুন বছরের সবচাইতে বড় মজার কাণ্ড বলে ব্যাখ্যা করলেন। আবু জুনায়েদ স্বয়ং বিস্মিত হয়েছেন সবচাইতে বেশি। আবু জুনায়েদের বেগম নূরুন্নাহার বানু খবরটি শোনার পর থেকে আণ্ডাপাড়া মুরগির মতো চিৎকার করতে থাকলেন। তিনি সকলের কাছে বলে বেড়াতে লাগলেন যে তাঁর ভাগ্যেই আবু জুনায়েদ এমন এক লাফে অত উঁচু জায়গায় উঠতে পারলেন। কিছু মানুষ অভিনন্দন জানাতে আবু জুনায়েদের বাড়িতে এসেছিলেন। নূরুন্নাহার বানু তাঁদের প্রায় প্রায় প্রতিজনের কাছে তার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর থেকে কী করে একের পর এক আবু জুনায়েদের ভাগ্যের দুয়ার খুলে যাচ্ছে সে কথা কথা পাঁচ কাহন করে বলেছেন। অমন ভাগ্যবর্তী বেগমের স্বামী না হলে, একদম বিনা দেনদরবারে দেশের সবচাইতে প্রাচীন, সবচাইতে সম্ভ্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদটি কী করে আবু জুনায়েদের ভাগ্যে ঝরে পড়তে পারে। যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই মুখে কিছু না বললেও মনে মনে মেনে নিতে দ্বিধা করেননি যে একমাত্র স্ত্রীভাগ্যেই এ রকম অঘটন ঘটতে পারে। (গাভী : ৩৫৯)

উপচার্য নিয়োগের এ প্রক্রিয়াটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় শিক্ষক রাজনীতির কথা। স্বার্থের কাছে রাজনীতিপরায়ণ শিক্ষকরা কীভাবে বন্দি সে বিষয়টির প্রমাণ মেলে প্যানেল মনোনয়ন ঘিরে। দলে দলে বিভক্ত শিক্ষক রাজনীতি। একদলের মাঝেও উপদল। শিক্ষকরা কখনো ঐক্য আবার কখনো অনৈক্য। এই ঐক্য এবং অনৈক্যের যে শিক্ষক রাজনীতি তার চালচিত্র পাওয়া যায় গাভী বিত্তান্তে। কেবল শিক্ষক রাজনীতি নয় শিক্ষকদের ব্যক্তিগত সুবিধাবাদ ও পারস্পরিক আচরণ সম্পর্কেও বর্ণনা পাওয়া যায় উপন্যাসে।

> কোনো শিক্ষক যখন অবসর নেন, তাঁর বাসাটি দখল করার জন্য শিক্ষকদের মধ্যে যেভাবে চেষ্টা তদবির চলতে থাকে, কে কাকে ল্যাং মেরে আগে তালা খুলবে, সেটাও একটা গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারে। পরীক্ষার খাতা দেখার বেলায়, কে কার চাইতে বেশি খাতা হাতিয়ে নিয়েছে, তা নিয়ে যে উত্তাপ, যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলতে থাকে, তা একটা স্থায়ী অসুখ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বিনা যুদ্ধে নাহি দেগা সূচ্যগ্র মেদিনী' এটা একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদ বিনা প্রয়াসে বলতে গেলে একরকম স্বপ্ন দেখতে দেখতে উপাচার্যের আসনটি দখল করে বসবেন, সেই ঘটনাটি সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করে ছেড়েছে। (গাভী : ৩৬০)

আবু জুনায়েদের উপাচার্য পদে আরোহনের 'চমক' বর্ণনা করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা রোগব্যাধির প্রসঙ্গ তুলেছেন। পাশাপাশি শিক্ষক রাজনীতির সক্রিয় অবস্থান ও তার কদর্যতাকে তুলে ধরেছেন। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় ইতিহাস ছিল, যে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল গোটা মানুষের আত্মা, এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ছড়িয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধের দাবানল সেই বিশ্ববিদ্যালয় আজ জর্জরিত নানা অসুখে। গাভী বিত্তান্তে আছে এই অসুখের কথা :

> অতীতের গৌরব গরিমার ভার বইবার ক্ষমতা বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। সাম্প্রতিককালের নানা রোগ ব্যাধি বিশ্ববিদ্যালয়টিকে কাবু করে ফেলেছে। মাছের পচন যেমন মস্তক থেকে শুরু হয়, তেমনি যাবতীয় অসুখের জীবাণু শিক্ষকদের চিন্তা চেতনায় সুন্দরভাবে স্থান করে নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্বরজারি, ধনুষ্টঙ্কার, নানারকমের হিস্টিরিয়া ইত্যকার নিত্য নৈমত্তিক ব্যাধিগুলো শিক্ষকদের ঘায়েল করেছে সবচাইতে বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় বারোশো শিক্ষক। এখন শিক্ষকসমাজ বলতে কিছু নেই। আছে হলুদ, ডোরাকাটা, বেগুনি এ সব দল। (গাভী : ৩৬৫)

শিক্ষক প্রসঙ্গের সমান্তরালে ছাত্ররাজনীতির কথাও উঠে এসেছে গাভী বিত্তান্তে। ছয় এর দশক থেকে নয় দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির সোনালি অতীত ছিল। ষাটের দশকে ছাত্ররাজনীতি ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সচেতন হয়, অংশগ্রহণ করে। এরপর নব্বই দশকে এরশাদবিরোধী আন্দোলনেও ছাত্ররাজনীতির গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। এরপর আসে তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার। ছাত্ররাজনীতি ঢুকে পড়ে

মূল দলের গহ্বরে। ফলে অধিকার আদায়ের পরিবর্তনে ছাত্ররাজনীতির কাজ হয়ে দাঁড়ায় মূল দলের লেজুড়বৃত্তি করা।

১৯৯৭ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ক্ষমতায় থিতু হয়ে বসলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। এরপর পরিস্থিতি হয়ে উঠল আরও ভয়াবহ। রাজনীতিকে কলুষিত করার জন্য তিনি যে 'মিশন' নিয়ে নেমেছিলেন, ছাত্ররাজনীতি তার গ্রাস থেকে রেহাই পায়নি।... নব্বইয়ে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে ছাত্ররাজনীতির ভূমিকা ছিল অনন্য। কেননা, ছাত্রছাত্রীদের শক্তিশালী আন্দোলন এবং শিক্ষকদের বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণে এরশাদের পতন ঘটে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে, কিছুদিনের মধ্যে ছাত্ররাজনীতি তার নিজস্বতা বিসর্জন দিয়ে লেজুড়বৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ে। (কার্জন ২০১২)

আগে যে রাজনীতি নেতা তৈরি করেছে, যে নেতারা ছাত্রদের স্বার্থ নিয়ে কাজ করেছে; সে ধারা থেকে বেরিয়ে এসেছে ছাত্ররাজনীতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখল, টেন্ডারবাজি, গোলাগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে ছাত্ররাজনীতির মূল কাজ। ফলে ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আহমদ ছফা ছাত্ররাজনীতির কলুষিত দিকটিও উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

> আমাদের দেশের এই সবচাইতে প্রাচীন এবং সবচাইতে সম্ভ্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয়টি হাল আমলে এমন এক রণচণ্ডী চেহারা নিয়েছে, এখানে ধন প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। এখানে যখন-তখন মিছিলের গর্জন কানে ঝিম ধরিয়ে দেয়। দুই দলের বন্দুকযুদ্ধে পুলিশ এসে পড়ে, সেটা তখন তিন দলের বন্দুকযুদ্ধে পরিণত হয়। কোমলমতি বালকেরা যেভাবে চীনা কুড়াল দিয়ে অবলীলায় তাদের বন্ধুদের শরীর থেকে হাত-পা বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারে, সেই দক্ষতা ঠাঁঠারিবাজারের পেশাদার কশাইদেরও আয়ত্ত করতে অনেক সময় লাগবে। (গাভী : ৩৬০)

ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক ছাত্ররাজনীতির ধরন সম্পর্কে বলা যায়, বর্তমানে ছাত্ররাজনীতি আর ভবিষ্যতের রাজনৈতিক নেতা তৈরি করতে পারছে না। এই খরা চলছে উপরতলার রাজনীতিতেও। অর্থাৎ ডান বামে কোনো রাজনৈতিক দলই পারছে না নতুন রাজনৈতিক নেতা তৈরি করতে। বাংলাদেওে যে রাজনীতি একদা শেখ মুজিব থেকে শেরেবাংলা পর্যন্ত ক্ষণজন্মা নেতাদের জন্ম দিয়েছে, আজ সেটি এতই অনুর্বরা যে তাতে আগাছাই জন্ম নিচ্ছে বেশি। তার প্রভাব পড়েছে ছাত্ররাজনীতিতেও। বর্তমান অবস্থার জন্য একা ছাত্ররাজনীতি দায়ী নয়। দায়ী সন্ত্রাস ও দুর্নীতি কবলিত মূল রাজনীতি। (গাফ্ফার : ২০১৫)

আবু জুনায়েদ উপাচার্য পদ পাওয়ার সঙ্গে বেড়ে যায় তার দায়িত্ব, দৈনন্দিন জীবন-যাপনে পরিবর্তন অনিবার্যভাবে ধরা দেয়। আবু জুনায়েদ শীর্ষ পদে আরোহনের পর উপাচার্য ভবনে ওঠেন। এরপর

ঔপন্যাসিক বর্ণনা করছেন ঘরের ভেতরের কাহিনি, উপাচার্যের স্ত্রী নুরুন্নাহার বানু স্বামীকে সন্দেহ করা শুরু করেছেন। স্বামীর প্রতি তার অবিশ্বাস জমা বাঁধে, এক পর্যায়ে সেটি পারিবারিক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্ত্রীর এই সংশয়, সন্দেহ মধ্যবিত্তের পারিবারিক বন্ধনের দুর্বলতাকে ইঙ্গিত দেয়, মধ্যবিত্তের অবিশ্বাসে অভ্যস্ত জীবনের ইঙ্গত দেয়। এই অবিশ্বাসের পেছনে নুরুন্নাহার বানুর বয়সও দায়ী। উপন্যাসে বর্ণনা :

> নুরুন্নাহার বানু বুড়িয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আবু জুনায়েদ দেখতে এখনো তরুণ। মাথার একগাছি চুলেও পাক ধরেনি। নুরুন্নাহার বানুর সঙ্গে সঙ্গে আবু জুনায়েদের শরীরে কেন বার্ধক্য আক্রমণ করছে না, এটাই ছিল নুরুন্নাহার বানুর অসন্তোষের একটা বড় কারণ। নিয়মিত নামাজি না হয়েও আবু জুনায়েদ মাঝে মাঝে ফজরের নামাজ পড়তেন, দেখে নুরুন্নাহার বানু মনে করতেন, তিনি যে তাঁকে সন্দেহ করছেন ওটা কেমন করে টের পেয়ে গেছেন, তাই কখনো সখনো নামাজের পাটিতে দাঁড়িয়ে তার কাছে প্রমাণ করতে চাইছেন, দেখো আমি নামাজ পড়ি এবং আমার মনে প্রবল ধর্মবোধ বর্তমান, সুতরাং অন্য স্ত্রীলোকের ওপর আমি কোনো আসক্তি প্রমাণ করতে পারিনে। কিন্তু নুরুন্নাহার বানু মনে করতেন, আবু জুনায়েদ অন্য মেয়েমানুষের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছেন সেটা গোপন করার জন্য মাঝে মাঝে নামাজ পড়ে দেখিয়ে থাকেন। ' (গাভী : ৩৬১)

আবু জুনায়েদ সম্পর্কে মেয়েলি যে যোগসূত্র তা নুরুন্নাহার বানুর বানানো। তিনি মনে মনে এ যোগসূত্র খুজেছেন কার্য-কারণ বিবেচনা না করেই। এই সন্দেহের কোনো মীমাংসা করতে না পেরে তিনি নিজেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তিনিই সান্ত্বনা খুঁজেছেন অন্য মেয়েদের মতো সে নয়। লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে উঠেছে নুরুন্নাহার বানুর মনোভাব :

> অনেকদিন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাস করে নুরুন্নাহার বানুর মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে এখানে মেয়ে পুরুষ মাঠে ছেড়ে দেয়া গরু মোষের মতো ঘুরে বেড়ায়, তাই যে- কোনো সময়ে তারা যে-কোনো কিছু করে ফেলতে পারে। সব মেয়ে মানুষ কি আর নূরুন্নাহার বানুর মতো! (গাভী : ৩৬২)

উপাচার্য আবু জুনায়েদ ভিসি ভবনের নির্জন পরিবেশের এক সকালে স্ত্রীকে নিয়ে হাঁটতে বের হন। 'সবুজ সতেজ দূর্বাবেষ্টিত প্রসারিত ভূমির ওপর হাঁটতে হাঁটতে আবু জুনায়েদের মনে এল, তিনি এখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তার হাতে এখন অনেক ক্ষমতা।' আবু জুনায়েদ ভাবতে লাগলেন :

> এই ক্ষমতা নিয়ে কী করবেন? এই অপার ক্ষমতা দিয়ে যদি তার কোনো একটা শখ পূরণ করতে পারতেন, তাহলে সবচাইতে খুশি হয়ে উঠতে পারতেন। সহসা তাঁর মনে এল, তিনি একটা দুধেল গাই পুষবেন। অঢেল জায়গা, প্রচুর ঘাস। অনায়াসে একটা গাই পোষা যায়।' (গাভী : ৩৭৬)

স্ত্রীকে আবু জুনায়েদ তার শখের কথা খুলে বলেন :

> আমি একটা গাইগরু কিনব। এখানে রাখার জায়গার অভাব নেই এবং ঘাসও বিস্তর। একটা গরু পোষার শখ অনেক দিনের। এবার আল্লাহ আশা পূরণ করার সুযোগ দিয়েছেন।
>
> নুরুন্নাহার শুনে লাফিয়ে উঠলেন।
>
> -সত্যি তুমি গাইগরু কিনবে?
>
> -হ্যাঁ। আবু জুনায়েদ জবাব দিলেন?
>
> খুশিতে নুরুন্নাহার আবু জুনায়েদকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। আবু জুনায়েদ তার মুখচুম্বন করলেন। (গাভী : ৩৭৭)

আবু জুনায়েদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ ব্যক্তি হলেও নিজের ঘরে বেগম নুরুন্নাহার বানুর কাছে তিনি বড় অসহায়। শ্বশুরের টাকায় আবু জুনায়েদ লেখাপড়া করেছেন, এই খোটা নুরুন্নাহার বানু উঠতে বসতে তাঁকে দেন। আবু জুনায়েদ রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক। একমাত্র বাজারের তরকারি এবং মাছওয়ালা ছাড়া আর কারো সঙ্গে কোনোদিন হম্বিতম্বি করেননি তিনি। নিতান্ত গোবেচারা এবং সহজ-সরল মানুষ।

ঘটনাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচয় ঘটে ঠিকাদার তবারক হোসেনের সঙ্গে। একসময় শ্বশুরকুলের আত্মীয় হয়ে যান তবারক হোসেন। ভিসির স্ত্রী তবারককে চাচা সম্বোধন শুরু করে। বর্তমান উপাচার্য সাহেব যে শ্বশুরের পয়সায় লেখাপড়া করেছেন সেটি খুব ভালোমতো জানতেন তবারক আলী। কারণ আবু জুনায়েদের শ্বশুর ছিলেন একজন ঠিকাদার আর তাঁর হাত ধরেই তবারক আলীর সব উন্নতি। সে কারণে তিনি আজও কৃতজ্ঞ।

ঘটনাক্রমে শেখ তবারক আলীর বাড়িতে সপরিবারে দাওয়াতে যান আবু জুনায়েদ। সেখানে তিনি তবারক আলীর অঢেল সম্পদের নমুনা দেখতে পান এবং সুযোগ পেয়ে নিজের আজন্ম লালিত সাধের কথা চাচাশ্বশুরকে জানান।

এই তবারক হোসেন কৌশলী ঠিকাদার বটে। কেননা ব্যবসার প্রয়োজনে তিনি রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তি থেকে শুরু করে বস্তির মানুষদের সঙ্গে সম্পর্কে মানিয়ে চলেন। ঢাকায় আলিশান বাড়ি তৈরি করেছেন। বাড়িটি নিরাপদ রাখার জন্য তার সামনে গড়ে তুলেছেন বস্তি। যাতে বিপদের দিন বস্তির লোকেরা

তবারকের পাশে এসে দাঁড়ায় কৃতজ্ঞতার খাতিরে। উপাচার্য জুনায়েদের কাছে এ সম্পর্কে ঠিকাদার জানায় :

> স্যার কথাটা হলো সেখানে। আমাদের এটা কি দেশ? এই দেশে কি মানুষ বাস করতে পারে? এখানে কি কোনো আইনশৃঙ্খলা আছে? প্রেসিডেন্ট এরশাদের বিরুদ্ধে লোকজন যখন আন্দোলন শুরু করল, পশ্চিম দিকের কম্পাউন্ড ওয়াল ভেঙে এক অংশে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। অনেক কষ্টে থামাতে পেরেছি। এরশাদ পাপ করেছে তবারককে কেন শাস্তি ভোগ করতে হবে? বোঝেন অবস্থাটা। আমরা ঠিকাদারি করে খাই। যে সরকার আসুন না কেন আমাদের তো সম্পর্ক রাখতে হবে। সেবার তো একটা মস্ত শিক্ষা হলো। তারপর এই ঘরগুলো বানিয়ে গরিব মানুষদের থাকতে দিয়েছি। কারো কাছ থেকে ভাড়াপত্তর কিছু আদায় করিনে। বিপদে-আপদে একটু সামনে এসে দাঁড়ায়। (গাভী : ৩৯৯)

তবারক হোসেনের বাড়িতে গিয়ে আবু জুনায়েদ দেখতে পান রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এমডি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব, পুলিশ প্রধান, চোর গুণ্ডা এমনকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও এসেছেন তবারক হোসেনের সেই আলিশান বাসায়। সেই বাসাতেই আলাপের একপর্যায়ে তবারক হোসেনের সঙ্গে দেশের সমসাময়িক অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়।

> দেশটা আজ কোথায় যাচ্ছে? মোটা অঙ্কের টাকা সরকারি দলকে দিতে হয়, মাস্তানদের দিতে হয়। আমাদের মতো সৎ ব্যবসায়ী যারা পলিটিক্যাল ব্যাকিঙে রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছে পরিণত হয়নি, ঘরের টাকা ঢেলে ব্যবসাপাতি করে থাকে, তাদের কি টিকে থাকার কোনো উপায় আছে? ব্যাংকগুলোতে যেয়ে দেখুন, ব্যাংকের ষাটভাগ টাকা নানারকম প্রভাব খাটিয়ে ফাটকাবাজ ব্যবসায়ীরা নিয়ে গেছে। কলকারখানার নাম করে টাকা নিয়েছে। যেয়ে দেখুন একটা কম্পাউন্ড ছাড়া কিছু নেই, ভেতরে ফাঁকা। (গাভী : ৪০৩)

আলাপের একপর্যায়ে উপাচার্য তবারক হোসেনকে জানালেন তার শখের কথা। উপাচার্য নিজের লালিত শখের অকপটে প্রকাশ করে :

> ছোটবেলা থেকে আমার একটা গাইগরু পোষার খুব শখ। গোটা চাকরি জীবন তো ফ্ল্যাট বাড়িতে কাটাতে হল। জায়গার অভিবে সে শখটা অপূর্ণ থেকে গেছে। এখন জায়গা আছে, ঘাসও বেশ আছে। আমার হচ্ছে একটা গরু আমি পুষতে পারি। গরু কোথায় বেচাকেনা হয়, কীভাবে পছন্দ করে কিনতে হয় কিছুই জানিনে। আপনার হাতে লোকজন আছে, যদি একটা গরু দেখেশুনে কেনার ব্যবস্থা করে দিতেন। আপনার হাতে কি সে রকম সময় আছে? (গাভী : ৪০৫)

উপাচার্য জামাইয়ের এই সাধ পূরণ করা শেখ তবারক আলীর জন্য কোনো বিষয়ই ছিল না। তাই তিনি সব দায়িত্ব নিজের কাধে তুল নেন। উপাচার্য ভবনের আঙিনায় একটা গোয়ালঘর তৈরি করে দেন।

কোনো বিষয়ই ছিল না। তাই তিনি সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন এবং উপাচার্য ভবনের আঙিনায় একটি সুদৃশ্য গোয়ালঘর তৈরি করে দেন। সেই গোয়ালে ঠাঁই হয় 'তরণী' নামে একটি গাভীর। 'গোয়ালঘরের দরজায় একটা নেমপ্লেট লাগিয়ে দেয়া হল। গরুটির যেহেতু তরণী নামকরণ করা হয়েছে, সুতরাং গোয়ালটির নাম হল তরণী নিবাস।'

এই গরু ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বাড়তে থাকে কৌতূহল। সময়ে-অসময়ে শিক্ষকরা গরু দেখতে এসে তাদের কৌতূহল নিবারণ করে যান।

> এই গরুটির মা-বাবা উভয়েই শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ভুক্ত। বাবা অস্ট্রেলিয়ান, মা সুইডিশ।... গরুটি যে একবার দেখবে প্রথম দর্শনেই বোঝা যাবে এটা ভিন্ন জাতের। বাংলাদেশের গরু সম্প্রদায়ের আত্মীয়স্বজন কেউ নয় এই চতুষ্পদের বেটি। তারপরেও জাতীয়তার বিচারে তরুণীকে বাংলাদেশী বলতে হবে, কারণ তার জন্মস্থান বাংলাদেশ। (গাভী : ৪২৩)

উপাচার্য আবু জুনায়েদের জীবনে বিশাল পরিবর্তন নিয়ে এলো তরণী। তাঁর মন এখন পড়ে থাকে গোয়ালঘরে। দিনরাত সেখানেই কাটান তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মিটিং বা কাগজপত্র সই করেন সেখানে বসে। তাঁর কাছে যেসব শিক্ষক আসেন, তাঁদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় আলাপও তিনি সারেন গোয়ালঘরে।

উপাচার্য বাংলাদেশের মানুষ, তিনি বাংলাদেশের একটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদে আসীন। তার ভেতর দেশপ্রেম থাকার কথা প্রবলভাবে। গাভী পালনের শখ পূরণ করতে পারতেন দেশীয় জাতের গরু দিয়ে। সেখানে বিদেশি গরু কেন? এই গাভী দেখে সংস্কৃতের প্রবীণ অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্ত্তীর মন্তব্য :

> শোনো বৎস্য আমাদের শাস্ত্রে গাভীকে মাতার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। যে পাষণ্ড গাভীর মধ্যে মাতৃমূর্তি দর্শন করিতে না পারে, তাকে জন্মাজন্মান্তর ধরিয়া তির্যক যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই হইল গিয়া শাস্ত্রের বিধান। তথাপি তোমার এই চতুষ্পদের কন্যাটিকে দেখিয়া আমার মনে ভিন্ন ধরনের জল্পনা শুরু হইয়াছে। সংস্কৃতে কাব্যে এক ধরনের সুন্দরী রমনীকে হস্তিনী রমণী বলিয়া মহাকবিগণ শনাক্ত করিয়া গিয়াছেন। তোমার গাভী দর্শন করিয়া আমার কী কারণে হস্তিনী নায়িকার কথা

> মনে হইতেছে বলতে পারি না। মহাকাব্যের যুগে যেই ধরনের গাভীকে কামধেনু বলা হইত তোমার গাভীটি সেই জাতের। ইহাতে যত্ন করিয়া রাখিবে (গাভী : ৪৪০-৪১)

উপাচার্যের শখের আড়ালে পালন করা এই গাভীটি হয়েছে অন্য কিছু। মহাকাব্যের যুগ থেকে তুলে আনা কামধেনুকে আহমদ ছফা উপন্যাসযুগে কামনার ধন বানিয়ে ছেড়েছেন। বাংলাদেশের শাসকজাতির বৈদেশিক ইন্দ্রিয়পরায়ণতার চিহ্ন হিশাবে হাজির করেছেন তিনি এই গাভীটিকে। (সলিমুল্লাহ ২০১৩ : ২৭৭)

তরণী 'তরণী নিবাসে' আসার পর থেকে আবু জুনায়েদের পারিবারিক জীবনে নানারকম গণ্ডগোল ঘটতে আরম্ভ করল। তারপরও আবু জুনায়েদ গণ্ডগোলের মাঝে আশ্রয় খুঁজেছেন গাভীর কাছে। এই গাভী হয়ে উঠেছে আশ্রয়ের প্রতীক। অথচ আবু জুনায়েদের ঘরে বউ আছে, ওই নারীসত্তার কাছে আশ্রয় পাননি জুনায়েদ। তার কারণও বহুবিধ। সবচেয়ে মূল কারণ মধ্যবিত্তের বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন। আবু জুনায়েদ উপাচার্য হওয়ার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা কাজ, মিটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। অপরদিকে নুরুন্নাহার বানু সন্দেহ করতে থাকেন তার স্বামী। ফলে দুজনার জীবনে বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

> আবু জুনায়েদরা তিনটি প্রাণীমাত্র। স্ত্রী নুরুন্নাহার বানু, মেয়ে দিলু এবং স্বয়ং তিনি। পারিবারিক জীবনেও আবু জুনায়েদ সুখী নন। নুরুন্নাহার বানুর চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। তাঁর দুর্মূল্য জড়োয়া গয়না হয়েছে। হুকুম তামিল করার চাকরবাকর রয়েছে, এমনকি লাবণ্যও অনেকদূর বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিধি অনেকদূর বিস্তৃত। (গাভী : ৪২৬)

আবু জুনায়েদ একদিন স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করেন। সেদিন রাতে তার বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করেনি। তিনি ফিরে গেলেন গোয়ালঘরে।

> তরণীর চোখে আবু জুনায়েদের চোখ পড়ে গেল। তাঁর মনে হল গরুটি ছলছল দৃষ্টিতে তার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করছে। আবু জুনায়েদ সবকিছু ভুলে গিয়ে গরুটাকে আদর করতে থাকলে। তরণী একটু পেছনে হটে গিয়ে আবু জুনায়েদের হাত পা গাল চাটতে লাগল। আবু জুনায়েদের মনে হল এই বোবা প্রাণীটি ছাড়া তার বেদনা অনুভব করার কেউ এই বিশ্বসংসারে নেই। গরুটা নির্বাক নয়নে আবু জুনায়েদের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ আবু জুনায়েদের ওলানের দিকে চোখ গেল। বাচ্চা হবে, বাঁটগুলো আস্তে আস্তে পুষ্ট হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। হঠাৎ করে ওলানটা ধরে দেখবার ইচ্ছে তাকে পেয়ে বসল। প্রথম গরুটা দেখার সময়ও এরকম একটা ইচ্ছে তার মনে জেগেছি। কিন্তু তিনি

সঙ্কোচবশত ওলানের তলায় হাত দিতে পারেননি। কোনো মানুষের সামনে এটা করা কোনোদিনই সম্ভব হতো না। (গাভী : ৪২৯)

সেই রাতের জয় হয় আবু জুনায়েদের। ইচ্ছার স্বাধীনতাকে তিনি বাস্তবে রূপায়ণ করলেন।

ওলানটা রক্তিম বর্ণের। এই তুলতুলে মাংসপিণ্ড স্পর্শ করামাত্রই তার স্মৃতিতে ভেসে উঠল, আজ থেকে অনেকদিন আহে, যখন তার সবে গোঁফ গজিয়েছে, শিশ্নের মধ্যে বীর্যসঞ্চার হয়েছে, এক দূর সম্পর্কীয়া মামি আবু জুনায়েদকে দিয়ে তাঁর বিশাল স্তন মর্দন করিয়েছিলেন। আবু জুনায়েদের মনে সেই পুলক, সেই অনুভূতি জেগে উঠল। আবু জুনায়েদের মনে হল তরণীর এই রক্তিম ওলান, এই স্ফীত বাঁটগুলোর মধ্য দিয়ে চরাচরের নারীসত্তা প্রাণ পেয়ে উঠেছে। (গাভী : ৪২৯)

গাভীর ওলানের সঙ্গে উপাচার্যেও বাসনার মিলন মুহূর্তে বাধ সাধেন স্ত্রী নুরুন্নাহার বেগম। রাতের অন্ধকারে তিনি দেখতে পান মনুষ্যছায়া। সেই ছায়া স্ত্রীর। প্রকাশ পেয়েছে আবু জুনায়েদের মনোভাব :

আবু জুনায়েদ আশা করেননি নুরুন্নাহার বানু এভাবে তার ওপর গুপ্তচর বৃত্তি করতে পারেন। প্রথমে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। সেটা সামলে উঠলেন। চরম বিতৃষ্ণায় তিনি চিন্তা করলেন, এই মেয়েমানুষটির হাত থেকে এ জীবনে তিনি নিষ্কৃতি পাবেন না। (গাভী : ৪২৯)

নুরুন্নাহার বানু বুঝতে পারেন এই গাভীটি সকল অশান্তির মূল। ঠিকাদার তবারক হোসেনের জামাতা তার মেয়ের সঙ্গে গোপনে গোপনে প্রেম শুরু করে দিয়েছেন। 'আবেদ হোসেন দীলুর স্তন টিপে টিপে আদর করছেন। আর দীলু গলা জড়িয়ে খিলখিল করে হাসছে।' নিজের মেয়ের এই কর্মকাণ্ড দেখে নুরুন্নাহার বানুর মনে হতে থাকে তার সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। তার পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। কেননা :

স্বামী তার অনুগত নয়। তাঁকে বিছানায় একা ফেলে একটা গরুর সঙ্গে রাতে এসে কী সব করে। আর নিজের মেয়েটির বাজারের খানকি হতে আর বাকি নেই। তবার আলীর জড়োয়া গয়না, বেনারসী শাড়ি, সুন্দর করে বানানো গোয়ালঘর, লক্ষ টাকা মূল্যের গাভীন গরু, তাকে একদিক দিয়ে সর্বস্বান্ত করে ফেলেছে। তিনি মনে মনে অনুভব করলেন তবারক আলী একজন শয়তান। তিনি যা কিছু স্পর্শ করবেন সেখানে পাপ ছাড়া আর কিছু জন্মাতে পারে না। (গাভী : ৪৩১)

গাভী ইস্যুতে নুরুন্নাহার বানুর সঙ্গে জুনায়েদের কথা বলা বন্ধ। 'হাত পায়ের একটা হাড় ভেতর থেকে ভেঙে গেলে যেরকম হয়, বাইরে কোনো রক্তপাত হয় না অথচ টনটনে ব্যথাটা ঠিকই থাকে; আবু জুনায়েদের সংসারেও সে অবস্থা।'

> বিয়ের পর এ রকম অবস্থা আর কোনোদিন হয়নি। নুরুন্নাহার বানু এখন বড় হওয়ার মজা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। ...তিনি মনে করছেন তার সর্বনাশ হয়ে গেছে। শেখ তবারক আলী তাঁদের গোটা পরিবারটারে সর্বনাশ করে ফেলেছেন। এই সংসারের প্রতি কোনো কর্তব্য, কোনো টান তিনি বোধ করেন না। অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই বলেই তিনি এই বাড়ি পাপী মানুষজনের সঙ্গে দিনরজনী যাপন করছেন। (গাভী : ৪৩২)

নুরুন্নাহার বানু চিন্তা করলেন তিনি গাভীটিকে হত্যা করবেন। রাতের আঁধারে তিনি গাভীটিকে বিষপ্রয়োগ করেন। এরপর থেকে শুরু হয় গাভীর পাতলা পায়খানা আর মুখ দিয়ে ফেনা ওঠা। খ্যাতনামা ডাক্তাররা রোগ ধরতে ব্যর্থ হলেন। গাভীটি মৃত্যুর দিকে যাত্রা করছে আস্তে আস্তে। এরকম দুর্দিনের সময়ে উপাচার্য আবু জুনায়েদ খবর পেলেন আমেরিকার একান্নটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে বক্তৃতা দিতে হবে। বক্তৃতা তিনি পাবেন চার হাজার ডলার। সে হিসেবে বাংলাদেশের টাকায় বিরাশি লাখ টাকা। তিনি স্ত্রী নুরুন্নাহার বানুকে খুশির খবরটি দিতে যান।

> নুরুন্নাহার বানু পূর্বের মতো ক্ষীণস্বরে বললেন, খুবই উত্তম সংবাদ। তুমি বিরাশি লক্ষ টাকা পাবে। এই টাকাটা তোমার দরকার হবে। গাভী প্রেমিকার কবরের ওপর তুমি তো তাজমহল বানাবে। শুনে রাখো তোমার প্রেমিকাটি আজ রাতে কিংবা কাল সকালে মারা যাবে এবং আমিই ওকে খুন করেছি। (গাভী : ৪৬৬)

উপাচার্য আবু জুনায়েদের জীবন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সবটাই হয়ে পড়ে গোয়ালঘরকেন্দ্রিক। এই গোয়ালঘরকে মঞ্চ বানিয়ে আহমদ ছফা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দৈন্যদশা এবং শিক্ষক রাজনীতির নোংরা দিকটি তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি তুলে ধরেছেন মধ্যবিত্তের পারিবারিক সংকটের চিত্রও। উপন্যাসের অনেক চরিত্রই পাঠকদের তাই চেনা-পরিচিত মনে হবে। বিশ বছর আগে এ উপন্যাসটি লেখা হলেও এটি স্মরণ করিয়ে দেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আজকের অবস্থা।

আহমদ ছফার গাভী বিত্তান্ত উপন্যাসের বিষয়বস্তু নতুন এবং প্রকাশভঙ্গি নতুন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবন নিয়ে রচিত এটিই একমাত্র উপন্যাস। যার মধ্যে আপাতত স্যাটায়ার বা কৌতুকবোধ থাকলেও এর ভেতরে প্রকাশিত হয়েছে ব্যক্তির সামাজিক-পারিবারিক জীবনের নানা জটিলতা। ব্যক্তির দুঃখ স্রোতস্বিনী নদীর মতো উপন্যাসে প্রবাহিত। এই অপরিসীম বেদনাবোধ প্রকাশের কারণে কোথাও কোথাও উপন্যাসটির গভীরতা সমুদ্রের মতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্পণে সমাজ ও দেশ এবং জাতিতে নিরীক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হতে পারে উপন্যাসটি।

তথ্যসূত্র

আহমদ ছফার সাক্ষাৎকার সমগ্র, সম্পাদনা নুরুল আনোয়ার, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা ২০১৩।

শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন, 'আত্মঘাতি ছাত্ররাজনীতি আর কত দিন', দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ আগস্ট ২০১২, ঢাকা।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, 'বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতিতে এত আগাছা কেন', বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫।

সলিমুল্লাহ খান, আহমদ ছফা সঞ্জীবনী, আগামী প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা ২০১৩।

আহমদ ছফা : তার সাহিত্যিক অনুসন্ধিৎসা, মহীবুল আজিজ, আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ, মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহবার হাসান সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩ ঢাকা।

ছ. গহন বুকের দুঃখকথা (অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী)

আহমদ ছফার আগের উপন্যাসগুলোতে রাষ্ট্র, সমাজ, রাজনীতি, রাষ্ট্র-সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষের বিপরীতে হতাশা, ব্যক্তির নানা বঞ্চনার কথা রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু অর্ধেক নারী, অর্ধেক ঈশ্বরীতে তিনি জানালেন খাটি প্রেমের কথা, ব্যক্তিগত প্রেমের গোপন কথা। আহমদ ছফা মনের গহিনে লুকিয়ে থাকা অব্যক্ত কথামালার মালা ছড়িয়ে দিয়েছেন পাঠকের গলে। উপন্যাসে প্রেম আছে, ব্যক্তির দোলাচল আছে, ব্যক্তির চাওয়ার পাওয়ার মাঝে প্রশ্ন উত্থাপন এবং এ থেকে মীমাংসার প্রয়াস আছে। অতীত স্মৃতি হাতড়ে ফেরার মাঝে ঔপন্যাসিক ব্যক্তির দুঃখবোধকে জাগ্রত করেছেন অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরীতে।

ঈশ্বরের মিথিক্যাল ধারণা ঈশ্বর এক, তার লিঙ্গান্তর নেই। এক্ষেত্রে আহমদ ছফা প্রচলিত মিথ ভাঙলেন। তিনি ঈশ্বরের শক্তির পাশে ঈশ্বরীর স্থান দিলেন শৈল্পিকভাবে। জীবনের বিগত নারীগুলো প্রেমে, বিশ্বাসে, বেদনায়, সুখে, বিরহে ঈশ্বরীর মতোই শক্তিমান। যে শক্তিতে তারা আজও কিংবা বছরের পর বছর দখল করে রেখেছেন প্রেমিকের হৃদয়। নারী প্রেমে ঈশ্বরের মতোই শক্তিমান, ঈশ্বরের মতোই অদ্বিতীয়। তাইতো নারী অর্ধেক নারী, অর্ধেক ঈশ্বরী।

আহমদ ছফা আলোচ্য উপন্যাসে যে ভৌগোলিক পরিমণ্ডল ব্যবহার করেছেন তা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। লেখকের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ কেটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালে যে সব নারীর প্রতি ছফার প্রেম জন্মেছিল সেগুলোকে শিল্পের ভাষায় প্রকাশ করেছেন উপন্যাসে। ১৯৭২ সালে আহমদ ছফা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে থাকতেন। পিএইচ-ডি কোর্সের ছাত্র হিসেবে তিনি এখানে স্থান করে নিয়েছিলেন। ছাত্রাবাসের ২০৬ নম্বর কামরায় তিনি উঠেছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে থাকার তারণে নানা ঘরনার মানুষের সঙ্গে তার যোগাযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময়ে শামীম শিকদারের সঙ্গে তার একটা আন্তরিকতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শামীম শিকদারের সঙ্গে তার সম্পর্কটি যেমন আতঙ্কের ছিল, মধুময়ও ছিল। ছিয়ানব্বই সালে ছফার

প্রকাশিত আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী'তে শামীম ঠিকদার সম্পর্কে একটা বড় অংশই স্থান পেয়েছে। এই বইতে শামীম শিকদারের নামটি পাল্টে লিখেছেন 'দুরদানা।' (নূরুল ২০১০ : ৯০-৯১)

'অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী' সমকালীন মানুষদের নিয়ে লেখা উপন্যাস। আমরা যারা সময়ের কুশীলব আমরা জানি, উপন্যাসটির মধ্যে বাস্তবতা আছে, তবে সে বাস্তবতা শিল্পচেতনাসমৃদ্ধ পরিশীলিত বাস্তবতা। নামটির মধ্যেই শিল্পরূচি ও শিল্পবোধ যেমন আছে তেমনি আছে ঐতিহ্য-স্বীকরণ ও ঐতিহ্য সম্প্রসারণের ইচ্ছা। সমকালীন উত্তাপ আহমদ ছফার সব উপন্যাসেই আছে কিন্তু সমকালের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার একটি শৈল্পিক সাধনা তাঁর মধ্যে বরাবর ছিল। (মুসা ২০০৩ : ৫৫-৫৬)

উপন্যাসে দুরদানা সম্পর্কে পরিচয় দিতে গিয়ে আহমদ ছফা বলেন :

> দুরদানার সঙ্গে থান্ডার শব্দটি বেশ মানিয়ে গিয়েছিল। কেউ- কেউ তাকে দুর্দান্ত চক্রযান বলেও ডাকত। কারণ নাখালপাড়ার দিক থেকে দ্রুতবেগে সাইকেল চালিয়ে সে আর্ট ইনস্টিটিউটে আসত। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে একটি উনিশ বছরের তরুণী ঢাকার রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে কলেজে আসছে-যাচ্ছে, ব্যাপারটা কল্পনা করে দেখো। দুপাশের মানুষ হাঁ করে তাঁকিয়ে দেখত। (অর্ধেক : ৫৪৫)

আহমদ ছফা ঢাকায় এসে শামীম শিকদারকে আবিষ্কার করেছিলেন। কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করে যেভাবে চমৎকৃত হয়েছিলেন শামীম শিকদারের সন্ধান লাভেও আহমদ ছফার সে রকম মনে হয়েছিল। এক সময় মানবিক সম্পর্ক তৈরি হয় শামীম শিকদার ও আহমদ ছফার মধ্যে। কিন্তু সম্পর্কের পরিণতি আসেনি। শামীম শিকদারকে নিয়ে ছফা একরকম দোদুল্যমনতায় ভুগছিলেন। তার প্রতি ছফার যে ভালোবাসা ছিল সেটিকে স্থায়ীরূপ দিতে তাঁর বাধছিল। তিনি শামীমের মধ্যে কী চেয়েছিলেন তা বোঝা মুশকিল। কবি অসীম সাহার লেখায় শামীম শিকদারের কথা এসেছে :

যতদূর মনে আছে, ছফা ভাই তাঁর উপন্যাস ওঙ্কার এর প্রকাশনা নিয়ে তখন খুব ব্যস্ত। এটা লেখার তিনি আমাকে ওঙ্কার থেকে বেশ খানিকটা অংশ পাঠ করে শোনান এবং আমাকে বলেন, এই বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকবেন শামীম সিকদারকে দিয়ে। তখন শামীমের সঙ্গে ছফা ভাইয়ের খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। শামীমের সঙ্গে আমারও দু'একবার দেখা হয়েছে। শামীম সম্পর্কে আগেই অনেকের কাছে অনেক কিছু শুনেছি। তাছাড়া আমরা একই এলাকার রোক বলে ওর সম্পর্কে একটা আলাদা কৌতূহল ছিল। তো, সেই কৌতূহল মিটলো ফা ভাইয়ের সৌজন্যেই। একদিন সন্ধ্যায় ছফা ভাইয়ের ওখানে যেতেই তিনি আমাকে বললেন, 'চলো অসীম, শামীমের ওখানে যাই।' আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের

পূর্বদিক দিয়ে তখন আর্ট কলেজে যাবার একটি রাস্তা ছিল। আমরা বেরিয়ে পড়ি। হাঁটার এক ফাঁকে ছফা ভাই আমাকে হঠাৎ করেই বলে ফেললেন, 'বুঝলে অসীম, আমি বোধহয় শামীমকে ভালোবেসে ফেলেছি।' আমি বললাম, 'ভালো কথা।' তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'না না কিন্তু আমি ওকে বিয়ে করব না।' আমি বললাম, 'কেন?'। তিনি বললেন, 'আমাকে মেরেই ফেলবে।' এই শিশুসুলভ আচরণে আমি অবাক বিস্ময়ে শুধু তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম, কোনো কথা বললাম না। (অসীম: ২০১৩)

ডায়েরিতে শামীম শিকদার সম্পর্কে ছফা লিখেছেন :

> শামীম শিকদারের পাশাপাশি আরও কজন নারীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তাঁরা সকলে সমসাময়িক। তাদের কথা আহমদ ছফার ডায়েরিতে নানাভাবে এসেছে এবং সকলের প্রতি তিনি কমবেশি দুর্বল ঝিলেন। শ্যামা নামের একটি মেয়ের কথা তাকে লিখতে হয়েছে বারবার। শামীমের সঙ্গে যখন তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন শ্যামা তাঁর গোটা হৃদয়জুড়ে বাস করছিলেন। আবার তাঁর চেয়ে বয়সে ভারি 'র' নামে একজনের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছেন ভীষণভাবে। 'র' একটি সাংকেতিক নাম। তারপর সুরাইনয়া খানমের আবির্ভাব এমনভাবে এলো যে পুরো ব্যাপারটাই তছনছ হয়ে গেল। (নূরুল ২০১৩ : ৯২)

সুরাইয়া খানম সম্পর্কে নূরুল আনোয়ার বলছেন, সুরাইয়া খানমের সঙ্গে পরিচিত হবার পর ছফা কাকা অন্যদের কাছ থেকে নিজেকে অনেকটা গুছিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর বিক্ষেপ্ত লেখা থেকে তা সহজে অনুমান করা যায়। 'অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরীতে' ছফা কাকা সুরাইয়া সম্পর্কে অনেক কাহিনী বয়ান করেছেন। এ উপন্যাসটি যেহেতু আত্মজীবনীমূলক, তাই কাহিনী নির্মাণে কল্পনার চেয়ে বাস্তবতাকে তিনি বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়। ছফা কাকা তো নানা জায়গায় বলেছেন, এ উপন্যাসটিতে তিনি একটু মিথ্যে লিখেননি। যা ঘটেছে, যা জেনেছেন, যা দেখেছেন তাকে তিনি তাঁর লেখনি শক্তি দিয়ে গুছিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন। ব্যত্যয় ঘটেছে শুধু নামের ক্ষেত্রে। এখানে তিনি সুরাইয়া নামটি বিসর্জন দিয়ে ব্যবহার করেছেন ছদ্মনাম কন্যা শামারোখ। (নূরুল ২০১৩ : ৯৩)

সুরাইয়া খানম প্রসঙ্গে আহমদ ছফার ডায়েরিতেও এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। এরপর লেখা হয়েছে, অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরীতে। দুই জায়গায় কাহিনী বিন্যাস দুরকম হলেও ঘটনা এক। তিয়াত্তর সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ডায়েরির পাতায় তিনি লিখেছেন :

> 'বেশ কদিন আগেই শামীমের মাধ্যমে সুরাইয়া খানমের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। মহিলার নামে অজস্র অপবাদ। একশ' পুরুষের সঙ্গে নাকি তার খাতির। এ সব কথা এখন হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

এ জাতীয় খারাপ বলে কথিত মহিলাদের প্রতি আমার তীব্র আকর্ষণ রয়েছে। হুমায়ুনের স্মৃতি পুরস্কারের চাঁদা তুলতে যেয়ে বাংলা একাডেমিতে এই অনুপম সুন্দর মহিলাকে দেখি। তাঁকে বোধ হয় খোঁচা দিয়ে কথা বলেছিলাম। সে যাক মহিলা দু'দুবার শামীমসহ আমার এখানে এসেছিলেন। একবেলা খেয়েছিলেন। দু'বার শামীমের হোস্টেলে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। টুকরো টুকরো কথাবার্তা হয়েছে। গতকাল মনে মনে প্রার্থনা করেছিলাম যেন উপযুক্ত কোন মহিলার সঙ্গে দেখা হয়। ঠিক তিনটের দিকে সুরাইয়া এসে উপস্থিত। গোটা অভুক্ত। ভদ্রমহিলা দৈনিক বাংলার শাহাদাত চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোককে চড় লাগিয়ে দিয়ে এসেছেন। আমার মনে হল তিনি আমার সঙ্গে অত্যন্ত পক্ষপাতের সুরে কথা কইলেন। প্রকারান্তরে বললেন, কাউকে বিয়ে করতে চান। বিগত স্বামীর দোষ বললেন। তাঁকে শামীমের হোস্টেল অবধি দিয়ে এলাম। যেতে যেতে দধিৎ ধহফ ঢ়বধপব্ব এর সেই আদ্রের মৃত্যুর দৃশ্যটার কথা বললেন, জীবনে আমি ভুলব না। ভদ্রমহিলা চরিত্র চরিত্রহীন হোন, মাথা খারাপ হোন তার প্রতি সুগভীর আকর্ষণ বোধ করছি। (ছফা ২০০৮ : ২৯৮)

উপন্যাসের কাহিনি-চরিত্র সম্পর্কে আহমদ ছফা বলেন :

বাস্তবে ঘটেনি এরকম কোনো ঘটনা বলি নাই। লিখতে গিয়ে আমি ফিল করেছি, কোনো লোকের প্রতি অবিচার করতে পারছি না। (নুরুল ২০১৩ : ৩৩)

আহমদ ছফা প্রেম করেছেন গোপনভাবেই জনসমাজে তা প্রচার করতে চাননি। এদের কথা জানাতে চেয়েছেন লেখার মাধ্যমে যাতে পাঠক তা জানতে পারেন সহজে। আহমদ ছফা বলেন :

পৃথিবীর হীরা সৃষ্টি হয় তাপ, চাপ এবং গোপনীয়তার কারণে। যাকে আমরা বলি নারীপ্রেম, একে বলা যায় হৃদয়ের হীরা। জনসমাজে এদের কথা বলতে আমার সংকোচ হয়। মানুষকে যদি আমার ভেতরের কথা বলে ফেলি তাহলে আমি তো নিঃস্ব হয়ে যাব। আমার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মাধ্যমেই আমার প্রেমিকাদের জানতে পারবে পাঠক। (নূরুল ২০১৩ : ২৪০)

জীবন চলার পথে আহমদ ছফা কেবল এক নারীর প্রেম পড়েননি। তিনি বারবার প্রেমে পড়েছেন। প্রতিবার প্রেমে পড়ার সময় তার মনে হয়েছে তিনি নতুন প্রেমে পড়েছে। প্রেম সম্পর্কে নতুনত্বের এই বোধই আহমদ ছফাকে বার বার প্রেম ফেলেছে। তবে স্থায়ী হয়নি নারীরের প্রতি এই সম্পর্কের এই বন্ধন। এইসব নারীরা আহমদ ছফার জীবনে স্রোতের মতো এসেছিলেন, শ্যাওলার মতো ভেসে গেছেন। তিনি চেষ্টা করেননি কাউকে ধরে রাখতে।

নূরুল আনোয়ার বলছেন, সারাজীবন নারীর ব্যাপারে তিনি দোদুল্যমানতায় ভুগেছেন। যখন কেউ তাঁকে বিয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি জবাব ছুঁড়ে দিয়েছেন আহমদ ছফাকে ধারণ করার মতো নারী তিনি পাননি। আবার বলেছেন, যাদের সঙ্গে শারীরিক শেয়ার করা যায় তাদের সঙ্গে মানসিক শেয়ার করা যায় না, মানসিক যাদের সঙ্গে শেয়ার করা যায় তাদের সঙ্গে শারীরিক শেয়ার করা যায় না। কথাগুলো কতটুকু সত্য জানি না। তবে কাছে ঘুরেফিরে একটা কথা মনে হয়েছে, তিনি নারীদের প্রতি যতটা দুর্বল তার চেয়ে কঠিন এবং যতটা কঠিন তার চেয়ে অধিক তরল। (নূরুল ২০১০ : ৯৪)

আহমদ ছফার ভেতর প্রেম থাকলেও ভেতরে ভেতরে তিনি একজন নিঃসঙ্গ মানুষ। অগণন প্রেমের মাঝেও তার জীবনটা দুঃখময়। আহমদ ছফার ডায়েরি সেই দুঃখকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ডায়েরিতে উল্লেখ আছে :

> আমার জীবনটা দুঃখময়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এই দুঃখটাকেই আমি ভুলে থাকি। বৈজ্ঞানিক নির্লিপ্ততা এবং অনপেক্ষতা নিয়ে বেশিরভাগ সময় কাজ করতে পারিনে। তারই চরিত্রের দুই বিপরীতমুখীর শক্তির মধ্যে একটা মাঝবিন্দু আবিষ্কার করা প্রায়ই ঘটে না। একদিকে অংক, শীতল চুলচেরা যুক্তি, বিতর্ক বিচার এবং অন্যদিকে অপরিমিত আবেগ- এই দুয়ের একটা সমতা সাধন করতে পারিনি- না জীবনে না শিল্পে। তাই আহমদ ছফা বলতে ক্ষেপা, একগুঁয়ে, কালাপাহাড় ধরনের একটা ধারণা সকলের মনে উদয় হয়। অথচ নির্জন মুহূর্তে, দুঃখের সময়ে আমি নিজের মধ্যে কত মহত্বের সমাবেশ দেখতে পাই। আমার সম্বন্ধে সবচাইতে ট্রাজেডি হল, আমি ডুবতে পারিনি।... মেয়েদের মধ্যে স্থিরতা এবং সরলতা এই দুটো গুণকেই আমি দাম দেই। অথচ যাদের সঙ্গে দেখি, কথা বলি এমনকি যারা স্বপ্নে এসে চরিত্র হনন করে, তাদের কেউ যেন আমার যোগ্য নয়। আমার ভেতরে কি প্রচণ্ড অহংকার শিলাময় পর্বতের মধ্যে জমাট বেঁধে আছে? নিজেও টের পাইনে। কখনো কখনো তার ঋজু চেহারা দেখে নিজেই ভয় পেয়ে যাই। যতগুলো মানুষ দেখেছি আমার চাইতে দুঃসাহসী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও জেদি কোন মানুষ এ পর্যন্ত দেখিনি। কখন, কি করে যে আমার মনের মধ্যে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়াবার ধারণা গেঁথে গেছে নিজেও জানিনে। যখনই কোনো মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় এসেছি আমার সে উদ্ধত অহঙ্কৃত আত্মবিশ্বাসে ঘা লাগে, প্রেম-টেম সব কোথায় চলে চলে যায়। নেপোলিয়নের জীবন আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে। বিশাল আকাশের মতো মানসম্পন্না একজন মহিলা আমার চাই। যতদিন না পাই, চলতি মহিলাদের পায়েই দলে যাব। তার মানে এই নয় যে, মহিলাদের আমি অসম্মান করি বা নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নই। কিন্তু কি করব, মনের সঙ্গে মেলে না তাই ছেড়ে যাই। ব্যথা নিজে পাই না? খুবই ব্যথা পাই। পাজর ভেঙে যেতে চায়। কাউকে শখ করে ব্যথা দেইনি, অনেকে

ব্যথা পেয়েছে। সব সময়ে এমনকি ঘুমে, আধঘুমেও আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা আমার লক্ষ্যের দিকে কম্পাসের মত এমনভাবে হেলে থাকে যে তারা যেরকমটি প্রত্যাশা করে সে রকম আচরণ করতে পারিনে। আমি কিছু অসাধারণ না করতে পারি- এই না করার ব্যথা বুকে নিয়ে মারা যাব। নিজেকে নিচে নামাতে পারব না। জীবনের কাছে আমার প্রার্থনা, হে জীবন তুমি যদি দ্রুত পক্ষ ঈগলের মতো অভীষ্ট অভিমুখে বাতাসে ভর করে ছুটতে না পার, সেইখানে থেমে যেও। কর্মহীন, গর্বহীন আমাকে কেউ যেন জীবিত দেখতে না পায়। আমি যেন লোভের কাছে, মোহের কাছে, হীনতা, পরবশ্যতা এবং আলস্যের কাছে পরাজিত না হই। প্রতিদিন জীবনের দিকে এই যে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিকে তাকাচ্ছি, এতে একটি লাভ হচ্ছে। নিজেকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে চিনতে পারছি। দায়িত্ব এবং লক্ষ্যেও চেহারা আর মাঝখানের ধাপগুলো স্পষ্ট আবার নিচ্ছে। লোকে যা-ই বলুক, যা-ই অনুভব করুক নিজের কাছে আমি অনন্য। দুঃখগুলো হজম করতে পারি বলে, ব্যথাকে অমান করিনে বলেই আমার সবটাই আমার। আমার জীবন আমারই নির্দেশ মেনে চলবে- এ রকম ভরসা অন্তত করতে পারে। (ছফা ২০০৮ : ২৭৯)

এত দুঃখের মাঝেও আহমদ ছফা শুদ্ধ জীবনযাপন করতে চেয়েছেন। নারীকে তিনি সম্মানের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। আহমদ ছফা বলেন :

আমি খুব শুদ্ধ জীবনযাপন করতে চেষ্টা করি। মেয়েদেরকে যথার্থ গুরুত্বের সঙ্গে আমি গ্রহণ করে থাকি। অনেক সময় প্রেম ভালবাসা এগুলো নামে অনেক উল্টো-সিধে নানাকথা বলে, সেগুলো আমার আসে না, এমন একটা অনুভূতি সেটা খুব কম ক্ষেত্রে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব। (নূরুল ২০১৩ : ২৪৪)

'অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী' উপন্যাসে প্রধান দুটো নারী চরিত্রের সন্ধান আমরা পাই। একজন দুরদানা একজন শামারোখ। এই দুরদানা চরিত্র সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে নারী স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে ওঠার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে, দেশ আজ স্বাধীন। সেই স্বাধীন বাংলাদেশের পথ টলার একটি স্ফূরণ যেন আহমদ ছফা দুরদানা চরিত্রের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। আহমদ ছফা যেন বোঝাতে চেয়েছেন যে ধর্মীয় ধান্দাবাজিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার অসারতা প্রমাণের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। দুরদানাও সাইকেলের প্যাডেল চালনার মাধ্যমে যেন সেই জীর্ণ জীবনকে দুপায়ে পেরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আমরা জানি বাংলাদেশ সেই পথে চলতে পারেনি। অচিরেই যেন বাংলাদেশ সেই পথ ভুলে যায়। আহমদ ছফাও তাই দুরদানাকে আর কাহিনীর বিকাশে আনেননি। উপন্যাসে হঠাৎ করেই দুরদানার কাহিনী শেষ করে দেওয়া হয়েছে। সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হলেও বাংলাদেশের নিয়তির মত দুরদানাও অকালে হারিয়ে গেছে। (হান্নান ২০১৪ : ৩২)

শামারোখ সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসে। নিজের যোগ্যতায় চাকরি পেলেও নানান বিড়ম্বনার মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। পুরুষের লোলুপ আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সংসার করতে চেয়েছিল শামারোখ। কিন্তু জীবন তার স্থায়ী হয়নি। পরে অন্য পুরুষের সঙ্গে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

স্বাধীনতা উত্তর ওই যে দিশাহীন জীবন বাংলাদেশের তাকেই যেন আহমদ ছফা দুরদানা এবং শামারোখ চরিত্রের ভেতর দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন। দিশাহীন সময়ে নারীর যে বিকাশ তা বিকশিত করার রাষ্ট্রীয় বা নেতৃস্থানীয় কোনো অবস্থা থেকে পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। ফলে স্বতস্ফূর্ত প্রগতির চর্চা অকালেই থেমে গেছে। দুরদানা বা শামারোখরা এ দেশের গতানুগতিক জীবনধারার বাইরে গিয়ে যে প্রগতির ধারা সূচনা করেছিল তা পারিপার্শ্বিক কাঠামোর সহায়তার অভাবেই মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে। (হান্নান ২০১৪ : ৩৩)

আহমদ ছফার উপন্যাসটি দ্বিতীয় খণ্ডে শেষ করার ছিল। কিন্তু সেটি শেষ করতে পারেননি। আহমদ ছফা বলেন :

'অর্ধেক নারী অর্ধেক নারী' এটা সেকেন্ড খণ্ডে শেষ হবে, ইঁস গোয়িং টু বি এ মন্যুমেন্ট অব লাভ। পুরুষ আর নারীর সম্পর্ক এটার একটা...নতুন কিছু না, উপন্যাসটার ভেতর থেকেই অন্যভাবে দেখা, যেভাবে আমরা নারী পুরুষকে দেখে আসছি...শরীর প্রধান নয়, মন প্রধানেরও নয়, টোটাল। যেমন জার্মানিরা বলে যে নারী আর পুরুষ কাঁচির দুইটা পার্টের মতো। (নূরুল ২০১৩ : ৩৫)

আহমদ ছফা এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছেন জাহিদ নামে। কল্পিত প্রেমিকা সোহিনীর কাছে প্রকাশ করছেন নিজের বিগত প্রেমের ইতিহাস। কারণ আহমদ ছফা নতুন প্রেমিকার কাছে গোপন রাখতে চাননি কিছুই। এই সোহিনী সম্পর্কে আহমদ ছফার মনোভাব :

> সোহিনী, তুমি আমার কাছে অর্ধেক আনন্দ, অর্ধেক বেদনা। অর্ধেক কষ্ট, অর্ধেক সুখ। অর্ধেক নারী, অর্ধেক ঈশ্বরী। তোমাকে নিয়ে আমি কী করব! তোমার টানাটানা কালো চোখের অতল চাউনি আমাকে আকুল করে। তোমার মুখের দীপ্তি মেঘ-ভাঙা চাঁদেও হঠাৎ-ছড়িয়ে-যাওয়া জোছনার মতো আমার মনের গভীরে সুবর্ণ তরঙ্গ জাগিয়ে তোলে। দিঘল চিকন কালো কেশরাশি যখন তুমি আলুলায়িত কর, হাওয়া-লাগা চারাগাছের মতো আমি কেমন আন্দোলিত হয়ে উঠি। (অর্ধেক : ৫৪৫)

এরপর প্রকাশ করছেন দুরদানা সম্পর্কে। দুরদানার সঙ্গে পরিচয়ে বিতান্ত তুলে ধরে জাহিদ চরিত্র আস্তে আস্তে প্রেমের আখ্যান বর্ণনা শুরু করেছেন। দুরদানা যে নারীসত্তা ধারণ করে আছে তা জাহিদের কাছে মনে হয়েছে নতুন যুগের প্রতীক।

> মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমার নতুন জন্ম হয়েছে। আমি অনেক তথাকথিত পবিত্র মানুষের লোভ-রিরংসা এখানে চোখের সামনে বীভৎস চেহারা নিয়ে জেগে উঠতে দেখেছি। আবার অত্যন্ত ফ্যালনা তুচ্ছ মানুষের মধ্যেও জ্বলন্ত মনুষ্যত্বের শিখা উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠতে দেখেছি। আমার চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে এমন একটা চৌম্বকক্ষেত্র তাপে-চাপে তৈরি হয়ে গেছে, সামান্য পরিমাণ হলেও খাঁটি পদার্থ দেখতে পেলে মন আপনা থেকেই সেদিকে ধাবিত হয়। গতানুগতিক নারীর বাইরে দুরদানার মধ্যে আমি একটা নারীসত্তার সাক্ষাৎ পেলাম, সর্বান্তকরণে তাকে আমাদের নতুন যুগের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করতে একটুও আটকাল না। (অর্ধেক : ৫৫৫)

সদ্য স্বাধীন দেশ যখন অচলায়তনের বিধিনিষেধ ভাঙতে শেখেনি ঠিক সেই মুহূর্তে দুরদানা চরিত্রটি হাজির হয় বিদ্রোহ হিসেবে। প্রথাগত সমাজের প্রতি তারা বিদ্রোহ দেখায় আচার-আচরণের মাধ্যমে। উগ্র পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে আঘাতের সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হন দুরদানা চরিত্র। সে সাইকেল চালিয়ে কলেজে আছে। নারীর প্রথাগত পোশাক না পরে সে শার্ট-প্যান্ট পরে আসে। দুরদানা সম্পর্কে জাহিদ জানায় :

> আমার মনে হতো দুরদানার প্রতিটি প্যাডেল ঘোরানোর মধ্য দিয়ে মুসলিম সমাজের সামন্তযুগীয় অচলায়তনের বিধিনিষেধ ভেঙে নতুন যুগ সৃষ্টি করছে। সে সময় আমরা সবাই এমন একটা বদ্ধ গুমোট পরিবেশের মধ্যে বসবাস করছিলাম, অনেক সময় নিজের নিশ্বাসের শব্দ শুনেও আতঙ্কে চমকে উঠতে হতো। (অর্ধেক : ৫৫৫)

তবে এই বিধি-নিষেধ ভাঙার বিদ্রোহ সূচনা করতে গিয়ে দুরদানা সম্পর্কে আঘাতের তীর কম আসেনি। দুরদানার প্রতি আক্রমণ এসেছে উগ্র পুরুষতান্ত্রিক সমাজ থেকে। সেই পুরুষতন্ত্র দুরদাসান এই জীবনকে মেনে নিতে পারেনি। তার সম্পর্কে কুৎসা রটনা করতেও তাদের বাধেনি। অথচ সেই কুৎসার অধিকাংশই ছিল তথাকথিত পুরুষদের কল্পনাপ্রসূত :

> লোকে দুরদানা সম্পর্কে যত আজেবাজে কথা বলুক না কেন, সেগুলোকে আমি জমাটবাঁধা কাপুরুষতা ছাড়া কিছুই মনে করতে পারলাম না। বিকৃত রুচির কিছু মানুষ যেমন এলিজাবেথ টেলর কিংবা সোফিয়া লোরেনের ছবি সামনে রেখে গোপনে মাস্টার্বেশন করে আনন্দ পায়; দুরদানা সম্পর্কে রটনাকারীদেরর তাদের সমগ্রোত্রীয় বলে ধরে নিলাম। মাঝে মাঝে মনে হতো যুগের প্রয়োজনে এই মেয়ে পাতাল-ফুঁড়ে

> গোড়া মুসলমান সমাজে আবির্ভূত হয়েছে। যে যদি শাড়ি-ব্লাউজের বদলে প্যান্ট-শার্ট পরে বেড়ায় তাতে কী হয়েছে? তুচ্ছ গয়নাগাটির বদলে ছুরি-পিস্তল নিয়ে ঘোরাঘুরি করে সেটা অনেক শোভন, অনেক বেশি মানানসই। (অর্ধেক : ৫৫৬)

দুরদানার সঙ্গে নানা স্মৃতি দানা বাঁধে জাহিদের। তারা একসঙ্গে সাইকেল চালিয়ে বিভিন্ন গন্তব্যে যায়। কখনো রিকশায় উঠে তারা গন্তব্যের দিকে যাতায়াত করে। যত সময় বয়ে যাচ্ছিল তারা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিলেন। জাহিদ প্রবলভাবে ঝুকে পড়েন দুরদানার দিকে। জাহিদের স্মৃতিচারণার মধ্যে পাওয়া যায় তার প্রমাণ :

> আমি দুরদানার দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়লাম। ঝুঁকে পড়লাম তার প্রেমে পড়েছি বলে নয়, তার মধ্যে প্রাণশক্তির সবল অঙ্কুরণ দেখে তার প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। লোকে তার নামে যা-তা বলে বেড়ায়, কারণ সে অন্যরকম। কেউ কখনো বলতে পারেনি সে পুরুষমানুষের সঙ্গে ক্লাবে গিয়ে মদ খেয়ে কখনো মাতাল হয়েছে, টাকা নিয়ে কোনো ধনী ব্যক্তির অঙ্কশায়িনী হয়েছে, কিংবা প্রেমের ছলনা করে সাত-পাঁচটা পুরুষমানুষকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে বেড়িয়েছে। লোকে তার নিন্দে করত, কারণ সে ছিল একান্তভাবে সুস্থ এবং স্বাভাবিক। (অর্ধেক : ৫৫৬)

দুরদানার পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড আলোচনা করতে গিয়ে এসেছে তার ভাই ইউনুস জোয়ারদারের কথা। আহমদ ছফার এই প্রেমিকা শামীম শিকদারের নাম যদি উপন্যাসে দুরদানা হয়। তাহলে বিপ্লবী সিরাজ শিকদারের নাম ইউনুস জোয়ারদার। বিপ্লবী সিরাজ সিরাজ শিকদার ছিলেন পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির নেতা। ১৯৭৫ সালে তিনি পুলিশের গুলিতে মারা যান। কী অবস্থায় সিরাজ শিকদার পুলিশের হাতে আটক হন এবং ঠিক কখন কোথায় কীভাবে তাকে নির্বিচারে হত্যা করা হয় সে সম্পর্কে অস্পষ্টতা রয়েছে।

অ্যান্থনি মাসকারেনহাস বলছেন : সিরাজ শিকদার ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরের শেষ দিকে চট্টগ্রামের কাছাকাছি এক এক এলাকা থেকে টেকনাফ পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। (অ্যান্থনি : ২০০৬)। সিরাজ শিকদারের বিপ্লবী রাজনীতির ইঙ্গিতও পাওয়া যায় 'অর্ধেক নারী, অর্ধেক ঈশ্বরীতে'। দুরদানার ভাই সম্পর্কে জাহিদের স্মৃতিচারণা :

> তার ভাই চরমপন্থি রাজনীতি করত। রাজরোষ তার মাথার ওপর উদ্যত খড়গের মতো ঝুলছিল। সরকার তার মাথার ওপর চড়া দাম ধার্য করেছে। এমন ভায়ের বোন হিসেবে তার লুকিয়েচুপিয়ে থাকা

উচিৎ ছিল। কিন্তু দুরদানা সে অবস্থাটা মেনে নেয়নি। ভাইয়ের বিপ্লবী রাজনীতি সম্বন্ধে তার অপরিসীম গর্ববোধ ছিল। তাই সবসয় সে মাথা উঁচু করে বেড়াত। (অর্ধেক : ৫৫৬)

দুরদানার সঙ্গে মেলামেশার কারণে নানা মানুষের কাছ থেকে কথা শুনতে হয়েছে জাহিদকে। তৎকালে অনেকের মনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়েছে দুরদানা খারাপ চরিত্রের এক মেয়ে। তার সঙ্গে মেলামেশা করাটাও রীতিমত অন্যায়।

তুমি ইউনুস জোয়ারদারের বোনের সঙ্গে ফুর্তি করে বেড়াও। মানুষ কি জানে না ইউনুস জোয়ারদার একটা খুনি। তার দলের লোকেরা গ্রামগঞ্জে মানুষ খুন করে বেড়াচ্ছে। লোকের ধনসম্পদ লুট করছে। ভাইয়ের দেমাকেই তো বোনটা সাইকেলে চড়ে সবাইকে পাছা আর বুক দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। (অর্ধেক : ৫৬১)

ইউনুস জোয়ারদারের বোনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও ইউনুস জোয়ারকে দেখেননি তিনি। তবুও তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জাহিদ চরিত্র ধারণা লাভ করলেন ধীরে ধীরে। একসময় তিনি মানসিকভাবে তার বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রতি সমর্থন জানান। তার মানে বোঝা গেলে রাজনীতির চিন্তাধারায় ইউনুস জোয়ারদার ও জাহিদ চরিত্র এক। ইউনুস জোয়ারদার সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক আর জাহিদ মননে-মগজে রাজনৈতিক। তিনি তার সমমনা রাজনৈতিক আদর্শের কথা ব্যক্ত করেছেন ইউনুস জোয়ারদারের প্রতি মৌন সমর্থনের মাধ্যমে।

ইউনুস জোয়ারদার মানুষটিকে আমি কোনোদিন নিজের চোখে দেখিনি, কথা বলিনি। তিনি কী দিয়ে ভাত খান এবং কোথায় যান, কিছুই জানিনে। তার রাজনীতির বিন্দু বিসর্গ সম্পর্কেও আমার কোনো ধারণা নেই। তারপরও আমার মনে হতে থাকল জোয়ারদারের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। আমি ভীষণ কৌতূহলী হয়ে তার সম্পর্কে নানান তথ্য সংগ্রহ করতে লেগে গেলাম। ধীরে ধীরে তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটা ধারণা আমার মনে জন্ম নিতে আরম্ভ করল। শহরের দেয়ালে দেয়ালে আলকাতরার লিখন দেখে আমার মনে হতে থাকল ইউনুস জোয়ারদার ধারেকাছে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে এবং আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পেতে রেখেছেন। আমি রিভলবার দিয়ে শ্রেণীশত্রু খতম করার কাজে অংশগ্রহণ করিনে, রাতদুপুওে আড়তদারের আড়তে হামলা করিনে, পুলিশ কিংবা রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে সামনাসামনি বন্দুকযুদ্ধে নামিনে, গ্রামগঞ্জের বাজাওে কারফিউ জারি করে গণশত্রুদের ধরে এনে গণ-আদালতে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করিনে। চেয়ারম্যান নে তুঙের নামে স্লোগান দিয়েও গাঁও- গেরামের জমাটবাঁধা অন্ধকার কাঁপিয়ে তুলিনে, গোপন দলের দয়ে চাঁদা সংগ্রহ করিনে, গাঢ় আলকাতরার অক্ষরে দেয়ালে লিখন লিখিনে, গোপন দলের সংবাদ আনা নেয়া করিনে। তাদের ইশতেহারও লি করিনে।

কোনো কাজে অংশগ্রহণ না করেই কেমন করে আমি মানসিকভাবে ইউনুস জোয়ারদারের সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম। (অর্ধেক : ৫৬৩)

বাস্তবের সিরাজ শিকদার ১৯৭৫ সালের ২ জানুয়ারি মারা যান। আর উপন্যাসের ইউনুস জোয়ারদারও মৃত। আগেই তো বলা হয়েছে সিরাজ শিকদার এবং ইউনুস জোয়ারদার একই নাম। ইউনুস জোয়ারদারের মৃত্যুতে জাহিদের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে এভাবে :

ইউনুস জোয়ারদার শট ডেড। এক কোনায় ইউনুস জোয়ারদারের একটা ঝাপসা ছবি ছাপা হয়েছে। আমি নিজের চোখে কোনোদিন ইউনুস জোয়ারদারকে দেখিনি। এই ঝাপসা ছবিটার দিকে তাকানোমাত্রই আমার বুকে মমতার ঢেউ উথলে উঠল। কী কারণে বলতে পারব না, আমি মনে করতে আরম্ভ করলাম ইউনুস জোয়ারদার আমার ভাই, আমার বন্ধু আমার সন্তান। তার মৃত্যু সংবাদে আমার চোখের সামনেকার গোটা পৃথিবীটা দুলে উঠল। তিনি আমার কেউ নন। তাঁর দলের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তবু আমার মনে হল, আমার দুচোখের দৃষ্টি নিভে গেছে। নিশ্বাস নিতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল। (অর্ধেক : ৫৭৪)

দুরদানা জাহিদের চোখে নারী হিসেবে প্রথমে ধরা দেয়নি। তার কাছে মনে হয়েছে এই দুরদানা একটি রহস্যের নাম, এক অজানা পৃথিবীর প্রতীক এই মানুষটি। জাহিদ তাই বলে :

দুরদানা একটি মেয়ে, একটি অজানা পৃথিবীর প্রতীক। এই ভাবনাটাই আমার জন্য যথেষ্ট ছিল। তার স্তনজোড়ার আকৃতি কীরকম, অন্য মহিলার মতো তারও একখানা যৌনাঙ্গ আছে কি না, মাসে মাসে তার রক্তস্রাব হয় কি না এবং রক্তস্রাবের যন্ত্রণা সে অনুভব করে কি না- এ সব কথা কখনো আমার ধর্তব্যে আসেনি। (অর্ধেক : ৫৬৪)

এরপর হঠাৎ করেই দুরদানা কাহিনি স্থগিত করে দিলেন আহমদ ছফা। আহমদ ছফা দুরদানা চরিত্রের মাঝে দেখেছিলেন সামন্তীয় অচলায়তন ভাঙার প্রেরণা। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই রাষ্ট্র তার আদর্শ হারাতে থাকে। হয়ত এ কারণেই দুরদানার সম্ভাবনাকে থামিয়ে দিতে হয়।

সে এই ঢাকা শহরেই আছে। তার স্বামী সংসার আছে, ছেলেমেয়ে আছে। চাকরি-বাকরি করে। অবশ্য অনেক আগে সাইকেল চালানো ছেড়ে দিয়েছে। এখন নিজের হাতে গাড়ি চালায়। (অর্ধেক : ৫৭৫)

এরপর আবার সোহিনীর প্রেমে আত্মসমর্পণ। জাহিদ চরিত্র সোহিনীর প্রতি আহ্বান রেখে জানায় :

আমার জীবনে বিচিত্র নারীর আনাগোনা দেখে আমাকে ঘৃণা কোরো না। মানুষ একজনমাত্র নারীকেই মনেপ্রাণে কামনা করে। আর সেই সম্পূর্ণ নারীজগতে মহামূল্যবান হীরক খণ্ডটির চাইতেও দুর্লভ। তাই

খণ্ড খণ্ড নারীকে নিয়েই মানুষকে সন্তুষ্ট থাকার ভান করতে হয়। তোমার মধ্যে অখণ্ড একটা নারীসত্তার সন্ধান আমি পেয়েছি। আমার কেমন জানি আশঙ্কা হয়, এই কাহিনী যখন আমি শেষ করব, তুমিও হয়তো এই বিশাল পৃথিবীর কোথাও হারিয়ে যাবে। তবু আমার সুখ, আমার আনন্দ, আমার প্রাণের সমস্ত উত্তাপ কেন্দ্রীভূত করে একটি সম্পূর্ণ নারীকে আমি ভালোবাসতে পেরেছি। জীবনে ভালোবাসার চাইতে সুখ কিসে আছে? (অর্ধেক : ৫৭৫)

জাহিদের জীবনে দুরদারা পরে আসে সুন্দরী এক বিবাহিতা নারী। উপন্যাসে তার নাম রাখা হয়েছে কন্যা শামারোখ। শামারোখের সঙ্গে প্রেমের স্বরূপ নিয়ে জাহিদ বলে :

সর্বত্র আমাকে নিয়ে নানারকম কথা হতে থাকল। কেউ বললেন, আমার সঙ্গে কন্যা শামারোখের বিশ্রী রকমের সম্পর্ক রয়েছে। আবার কেউ-কেউ বললেন, না না প্রত্যক্ষভাবে তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। তবে কন্যা শামারোখ ঢাকা শহরে বিনা মূলধনে যে একটি লাভের ব্যবসা ফেঁদে বসে আছে, তার খদ্দের জোগাড় করাই আমার কাজ। নিষিদ্ধ গালির পরিভাষায় ভেড়ুয়া। যে ভদ্রলোক জীবনে কোনোদিন কন্যা শামারোখকে চোখে দেখেননি, তিনি তাকে নিয়ে দুয়েকটি আদিরসাত্মক গল্প অনায়াসে ফেঁদে বসলেন। আমি শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের মুখ থেকেই শুনলাম, কন্যা শামারোখ অর্ধেক রাত ঢাকা ক্লাবে কাটায়। নব্য-ধনীদের গাড়িতে প্রায়শই তাকে এখানে-ওখানে ঘুরতে দেখা যায়। (অর্ধেক : ৫৮৮)

একদিন কন্যা শামারোখ ঘটনাক্রমে আসেন জাহিদের রুমে। আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে আসার ওই মুহূর্ত জাহিদের মনে রেখাপাত করে।

কন্যা শামারোখ একদলার সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে আমার ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। যেখানেই পদতল রাখছে, যেন গোলাপ ফুটে উঠেছে। আমার কাছাকাছি যখন এল, আপনা থেকেই একটা সুন্দর হাসি তার ওষ্ঠাধরে ফুটে উঠল। তার শাদা সুন্দও দাঁতগুলো ঝিলিক দিয়ে জেগে উঠল। আমার মনে হয় আমাদের হোস্টেলের ব্যালকনিতে সুমেরু রেখার ওপর সূর্যশিখা ঝলক দিয়ে জাগল। (অর্ধেক : ৫৯৩)

শামারোখ বিবাহিত নারী। তারপরও তাকে কন্যা বলে সম্বোধন করা হয়েছে আদর করে। কন্যা শামারোখ ডাকার কার্যকারণ সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায় উপন্যাসে :

শামারোখের সঙ্গে কন্যা শব্দটি যুক্ত রাখতে আমার মন সায় দিচ্ছে না। শামারোখ বিবাহিতা, এক সন্তানের জননী এবং স্বামীর সঙ্গে অনেকদিন হল সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। তার বয়স হয়েছে, আমি তার কানের গোড়ায় বেশকটা পাকা চুল দেখেছি। যদিও সে আশ্চর্য কৌশলে সেগুলো আড়াল করে রাখতে জানে, প্রচলিত সংজ্ঞা অনুসারে তাকে কুমারী বলা কিছুতেই যুক্তিসংগত নয়। তারপরও এ পর্যন্ত তাকে কুমারী বলেই প্রচার করে আসছি। (অর্ধেক : ৬০২)

শামারোখ উচ্চশিক্ষিতা, কেবল এখানেই শেষ নয় শিল্প-সাহিত্যের প্রতি তার অনুরাগ প্রবল। একদিন জাহিদকে কবিতার পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনায় শামারোখ। কবিতার ছন্দ তাল অনেক সময় ঠিক না থাকলে জাহিদের চোখে এই কবিতাগুলো খণ্ড খণ্ড দুঃখ প্রকাশের মাধ্যম। শামারোখ কবিত্ব সম্পর্কে জাহিদের অনুভব :

> অসহায় এবং দুঃখী মহিলা। এই দুঃখবোধটাই তার কবিতায় অগ্নিশিখার মতো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ওঠে। প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের পাপড়িতে শেষরাতের ঝরে পড়া শিশিরের মতো সূর্যালোকে দীপ্তিমান হয়। তার মুখমণ্ডলের অমলিন সৌন্দর্যের প্রতি যখন দৃষ্টিপাত করি, পিঠময় ছড়িয়ে পড়া কালো কেশের দিকে যখন তাকাই, যখন নিশিরাতের নিশ্বাসের মতো তার আবেগী কবিতাপাঠ শ্রবণ করি, আমার মনে ঢেউ দিয়ে একটা বাসনাই প্রবল হয়ে জেগে ওঠে, এই নারীর শুধু অঙ্গুলি হেলনে আমি দুনিয়ার অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ছুটে যেতে পারি। (অর্ধেক : ৬১৬)

কন্যা শামারোখকে মন থেকে গ্রহণ করতে পারেনি জাহিদ। কোথায় যেন বিনাসুতোর বন্ধনে ছেদ পড়ে। সিদ্ধান্ত নিতে না পারার দোলাচল জাহিদকে ক্ষত-বিক্ষত করে। ভেতরকে গ্রহণ করতে না পারা আবার ত্যাগ করতে না পারার দোলাচল যন্ত্রণাদগ্ধ করে তোলে প্রেমিক হৃদয়কে :

> এই মহিলাকে প্রাণের ভেতরে গ্রহণ করা যেমন অসম্ভব, তেমন প্রাণ থেকে ডালেমূলে উপড়ে তুলে বিষাক্ত আগাছার মতো ছুড়ে ফেলাও ততোধিক অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তার সম্পর্কে চোখ বন্ধ করে চিন্তা করলে কখনো অনুভব করি সে অমৃতের পেয়ালা হাতে দাঁড়িয়ে আছে, আবার কখনো মারাত্মক প্লেগের জীবাণুর মতো অস্পৃশ্য মনে হয়। এই দোলাচলবৃত্তির মধ্যেই আমি দিন অতিবাহিত করছিলাম। (অর্ধেক : ৬১৬)

আরো আছে :

> এইরকম অব্যবস্থিত চিত্তের মহিলাকে নিয়ে আমি কী করব ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। তাকে গ্রহণ করা অসম্ভব, আবার তাকে ছেড়ে দেয়া আরো অসম্ভব। গভীর রাতে আমি যখন নিজের মুখোমুখি হই শামারেখের সমস্ত অবয়বটা আমার মানস-দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অন্তরের সমস্ত আবেগ দিয়ে ওই মহিলাকে জড়িয়ে ধরার আকাঙ্ক্ষা আমার ঘনীভূত হয়ে ওঠে। মনে হয় তার জন্য প্রাণ-মন সবকিছু পণ করতে পারি। কিন্তু যখন তার অন্য কাণ্ডকীর্তির কথা স্মরণে আসে, মহিলার প্রতি আমার একটা অনীহাবোধ তীব্র হয়ে জেগে ওঠে। মনের একাংশ অসাড় হয়ে যায়। আমি নিজেকেই প্রশ্ন করি, এই আধপাগলা বিক্ষিপ্ত মানসিকতার মহিলার সঙ্গে আমি লেগে রয়েছি কেন? (অর্ধেক : ৬২৯)

শামারোখ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য চাকরি পেয়েছিলেন। নানা চক্রান্তে তার চাকরি আটকে যায়। এখানে আহমদ ছফা শিক্ষিত, সমাজের অভিভাবকরূপী কতিপয় মানুষের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। নারীর প্রতি তথাকথিত মানুষ গড়ার কারিগরদের বিকৃত মানসিকতাকে তুলে ধরেছেন। উঠে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের আংশিক চিত্র। অধ্যাপক তায়েব এ প্রসঙ্গে জাহিদকে বলে :

> এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্বর এবং স্যাডিস্ট মানুষেরা রাজত্ব করছে। একবার অ্যাপয়েন্টসেন্ট দিয়ে আবার নাকচ করা এই নোংরা প্যাকটিস আমাদের দেশেই সম্ভব। ইউরোপ-আসেরিকার কোথাও হলে সব ব্যাপাকে জেল খাটতে হত। শামারোখ কষ্টে পড়েছে সে জন্য তিনি চুকচুক করে আফসোস করলেন। (অর্ধেক : ৬২০)

যেখানে গেছে সেখানেই শামারোখকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। নারীর প্রতি যতটুকু মর্যাদা পাওয়ার কথা সেই মর্যাদা পুরুষ সমাজের কাছ থেকে পাওয়া হয়েছে যেন মরীচিকার মতো। জাহিদ এর প্রতিক্রিয়ায় জানায় এভাবে :

> বুঝলাম শামারোখের অবস্থা হয়েছে গোলআলুর মতো। গোলআলু যেমন মাছ, মাংস, শুটকি সবকিছুর জন্য প্রয়োজন, তেমনি শামারোখকেও সবার প্রয়োজন। বিপ্লবের জন্য, কবিতার জন্য, রাজনীতির জন্য, এমনকি লুচ্চোমি-ভ্যাঁদড়ামোর জন্যও শামারোখের প্রয়োজন। দিনে-দিনে নানাস্তরের মানুষের মধ্যে তার চাহিদা বাড়তে থাকবে। ভার বইবার দায়িত্বটুকু কেন একা আমার। যদি পারতাম কেঁদে মনের বোঝা হালকা করতাম। (অর্ধেক : ৬২২)

শামারোখ দুঃখী মানুষ। এই শামারোখের আশ্রয় দরকার, দরকার সামাজিক নিশ্চয়তা-নিরাপত্তা। জাহিদকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসলেও তাতে সায় দেয়নি জাহিদ। জাহিদের মনে হয়েছে এই বিয়ের প্রস্তাবে যতখানি না ভালোবাসা নিহিত রয়েছে ততখানি রয়েছে আশ্রয় খোঁজার লোভ।

> শামারোখ একটা ভাসমান অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তাকে আমি এই কমাসে যতদূর বুঝতে পেরেছি, এই মানসিক অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই সে আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছে। এই প্রস্তাবের পেছনে সত্যিকার ভারোবাসা আঠে, বিশ্বাস করতে পারছিনে। কিন্তু এটা কোনো সমাধান নয়। সমস্ত সদিচ্ছা সত্ত্বেও আমি তাকে একবিন্দু নিশ্চয়তা দিতে পারব না। শামারোখকে নিয়ে আমি কী করব। (অর্ধেক : ৬৩৮)

একসময় শামারোখ 'দুপেয়ে পশু' জমিরুদ্দীনকে বিয়ে করে। শামারোখকে সকাল-বিকেল ধরে পেটানো ছাড়া আর কোনো গুণপনা সে প্রদর্শন করতে পারেনি। সব জেনেশুনে শামারোখ

জমিরুদ্দীনকে বিয়ে করেছিল।' এ ছাড়া শামারোখের সামনে হয়ত আর কোনো পথ খোলা ছিল না। কারণ শামারোখের একটা আশ্রয় দরকার।

জীবন সম্পর্কে শেষে জাহিদের উপলব্ধি :

> জীবন শিল্প নয়, কবিতা নয়। জীবনে যা ঘটে শিল্প এবং কবিতায় তা ঘটে না। জীবন জীবনই। জীবনের সঙ্গে অন্য কোনোকিছুর তুলনা চলে না এবং জীবন ভয়ানক নিষ্ঠুর। সমস্ত প্রতিশ্রুতি, সমস্ত প্রতিজ্ঞা, সমস্ত দুঃস্বপ্নের ওপারে জীবনের লীলাখেলা। (অর্ধেক : ৬৭০)

প্রেম একটি অঙ্গীকার প্রেমের প্রতি দায়বদ্ধ না থাকলে সেই অঙ্গীকারময় প্রেমকে যথাযথভাবে প্রকাশ করাও যায় না। আহমদ ছফা 'অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী' উপন্যাসে প্রেমকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছেন, একেকটি নারীচরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছেন যা বাস্তবের জীবনযাপন থেকে উৎসারিত। প্রেমে পড়ার জন্য যেমন দরকার একনিষ্ঠতা আর সততা তেমনি প্রেমকে নিখুতভাবে বর্ণনা করা, প্রেমকে ধারণ করাও সততা ও একনিষ্ঠতা। আহমদ ছফা এই উপন্যাসে সেই সততার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র

সুদীপ্ত হান্নান, আহমদ ছফার উপন্যাস : *বাংলাদেশের জন্ম ও বিকাশের রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যাকরণ*, *আহমদ ছফা বিদ্যালয়*, প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, অক্টোবর-নভেম্বর, ২০১৪ ঢাকা।

মনসুর মুসা, *আহমদ ছফা : মিত্র ও শিল্পী*, *আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ*, মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী ২০০৩, ঢাকা।

নূরুল আনোয়ার, আহমদ ছফার সাক্ষাৎকার সমগ্র, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা ২০১৩।

নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত, *আহমদ ছফা রচনাবলি*, প্রথম খণ্ড, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি ২০০৮।

অ্যান্থনি মাসকেরেনহাস, অনুবাদ- মোহাম্মাদ শাজাহান, *বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ*, হাক্কানী পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ-জুলাই ২০০৬

উপসংহার

বাংলাদেশের সাহিত্যে যারা মুক্তবুদ্ধি এবং মুক্তচিন্তার চর্চা করেছেন, নির্দ্বির্ধায় প্রকাশ করেছেন তাদের অনন্য প্রতীক আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১)। তিনি তার প্রতিভার শক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন সমাজের প্রতি, সমাজে বসবাসরত মানুষের প্রতি কীভাবে দায়বদ্ধ থাকতে হয়। এই দায়বদ্ধতা নিয়ে লিখেছেন কবিতা, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, রাজনৈতিক নিবন্ধ প্রভৃতি। আবার গানও লিখেছেন। সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় আগ্রহ- কৌতূহলের পাশাপাশি ছিল দায়িত্ববোধ। কেবল সাহিত্য নয় শিল্পের প্রতিও ছিল তার গভীর মনোযোগ। শিল্পের প্রতি গভীর প্রেম এবং আগ্রহ থাকার কারণেই তার লেখা বিশেষ করে উপন্যাস নিছক উপন্যাস নয় তা হয়েছে কোনো নিখুঁত শিল্পীর সফল শিল্পকর্ম। তিনি চিত্রশিল্প নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, এঁকেছেন বেশ কিছু ছবি। আহমদ ছফা বাস্তবে রঙতুলি নিয়ে ছবি এঁকেছেন কিন্তু উপন্যাসে সত্য-কল্পনা মিলে তৈরি করেছেন ইতিহাসের ছবি। তার একেকটি উপন্যাস একেকটি সময় ধারণ করে রচিত। সেগুলো মনে হবে কালের পর্যায়ক্রমিক একেকটি চিত্ররূপ। তার লেখা রীতিমতো বিদ্রোহ জাগানিয়া, সাহস জাগানিয়া, তার লেখা সমাজ পরিবর্তনের নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহও বটে। লেখার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় সতর্ক যে কারণে তার ব্যক্তি-মানস সম্পর্কে সুতীব্র অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। পরিমিতবোধের বিশেষ রীতি মেনে লেখা তার সাহিত্যগুলো পাঠককে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে, পাঠকে তাড়িত করে বিশেষ বোধে।

লেখক জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছিল মাত্র একুশ বছর বয়সে 'সূর্য তুমি সাথী' উপন্যাসের মাধ্যমে। এরপর আর থেমে থাকতে হয়নি আহমদ ছফাকে। মৃত্যুর আগপর্যন্ত মনোযোগী থেকেছেন সাহিত্যকর্মে। বোধ, যুক্তি, আলোচনা-সমালোচনায় ভরপুর তার সাহিত্যকর্ম প্রতিনিয়ত পাঠককে আলোড়িত করে তুলেছে, এখনো করছে। তাঁর সাহিত্যকর্ম সামাজিক-রাষ্ট্রিক-সাংস্কৃতিক এবং মুক্তবৃদ্ধির আবহে রচিত হলেও তার মধ্যে রয়েছে স্বতন্ত্র এক মেজাজ, রয়েছে অভিনবত্বের আস্বাদ।

বিষয় বৈচিত্র্য ও চরিত্র চিত্রণে রাশি রাশি রাশি শব্দ থেকে অতিবাস্তব অথচ অকপট শব্দ সমন্বয়ে যে ছবি এঁকে গেছেন তা বাস্তব কিংবা বাস্তবের চেয়ে অনেক বেশি। লেখার মাধ্যমে তিনি যে বিদ্রোহের প্রেরণা জাগিয়েছেন, যে সব সাহসী উচ্চারণ করেছেন একবিংশ শতাব্দীর অনেক তরুণের মধ্যে যেরকম দৃঢ়তা চোখে পড়ে না।

আহমদ ছফার উপন্যাসগুলোর সমাজ ও রাজনীতি জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথা বলা যায় তিনি ইতিহাসের ভেতর দিয়ে বেড়ে ওঠার মাধ্যমে যেসব শিক্ষা-অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেগুলোর প্রমাণ পাওয়া যায় তার উপন্যাসে। কারণ ইতিহাসের বিরাট এক অংশের সঙ্গে আহমদ ছফার মেলবন্ধন ঘটেছিল ঢাকার জীবনে। তিনি দেখেছেন ঊনসত্তর সালের গণঅভ্যুত্থান, দেখেছেন একাত্তর সালের মুক্তি অর্জনের যুদ্ধ, দেখেছেন স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের নানামাত্রিক সংকটের চেহারা। এরপর প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-কাঠামোর মধ্যেও নানা অসঙ্গতি দেখেছেন; সেগুলোকে কলমের খাঁচায় বন্দি করেছেন সাহিত্যভাবনার অপূর্ব দক্ষতায়। এ ক্ষেত্রে আহমদ ছফা একজন দক্ষ কারিগর। তার ০উপন্যাস ইতিহাসকে ধারণ করেছে, সময়কে ধারণ করেছে, রাষ্ট্র-সমাজের ইতিবাচক-নেতিবাচক পরিবর্তনকে ধারণ করেছে। তবে রূপকের মাধ্যমে কিংবা উপন্যাসের বিদ্যমান চরিত্রগুলোর মাধ্যমে এ সব বিষয় উপস্থাপন করেছেন সাফল্যমণ্ডিতভাবে। একজন মহান দেশপ্রেমিকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আহমদ ছফা বাংলাদেশের ইতিহাসের বিভিন্ন কালপর্বকে মূল্যায়ন করেছেন এবং এদের মধ্যেকার অন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করেছেন।

আহমদ ছফা বিশ্বাস করতেন লেখককে অবশ্যই রাজনীতিবোধ সম্পন্ন হতে হবে এবং তার লেখার মধ্যে উদ্দেশ্য থাকতে হবে। তাইতো তিনি লেখাতে রাজনীতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন, লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাঠককে তিনি সহজেই পরিষ্কার করতে পেরেছেন। দেশজতা, ধর্মীয়তা, আঞ্চলিকতা-সব মিশিয়ে আহমদ ছফা যেসব সাহিত্য নির্মাণ করেছেন পরিমাণে তা অনেক। তিনি কেবল রাজনীতি নিয়েই ভাবতেন না, সমাজ নিয়েও ভাবতেন এবং তার এই ভাবনার যথেষ্ট প্রমাণ তার লেখাতেও। তাঁর লেখাগুলো গভীর চিন্তাপ্রসূত, লেখাগুলোর বিস্তৃতি গভীর এবং বহুমুখী। সবমিলিয়ে আহমদ ছফা শিল্পী ছিলেন, খণ্ডকালীন শিল্পী নয়, জীবন-শিল্পী। তাঁর অস্তিত্বের সমগ্রতাকে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন শিল্পসৃষ্টিতে, শিল্পরুচি, সাহিত্যবোধের উন্নয়ন ও পরিশীলনে।

আহমদ ছফা দেশকে ভালোবেসেছেন প্রাণ খুলে। তার মতো দেশকে এমন গভীর অনুভব করতে পারা এত সহজ কথা নয়। দেশ-দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল গভীর, অন্তরের সঙ্গে

সম্পর্কযুক্ত। কোনো মতবাদের ছাঁচে সে- ভালোবাসাকে ঢালাই করতে কিংবা আদর্শের হাঁড়িকাঠে তাকে উৎসর্গ করতে তিনি রাজি ছিলেন না। এ ব্যাপারে রাইট অর রং দিস ইজ মাই কান্ট্রি- প্রায় এ মনোভাব দ্বারাই তিনি চালিত হতেন। আর এখানে তিনি ছিলেন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থেকে আলাদা, সাধারণ মানুষের কাছাকাছি বা তাদের একজন।

আহমদ ছফা মানুষকেও ভালোবাসতে দরদ দিয়ে। তিনি ছিলেন চমৎকার খেয়ালি, স্বাপ্নিক এবং পরিপূর্ণভাবে নির্লোভ। তার পাশে যারাই এসেছেন তারাই পেয়েছেন অকৃত্রিম দরদ।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য পরিষ্কার করার পেছনে কাজ করেছে আহমদ ছফার সহজ গদ্যশৈলী। ফলে পাঠক সহজেই বুঝতে পারেন উপন্যাসের আখ্যান, বিষয় কিংবা তার মূলবস্তু। সহজ ভাষার বর্ণনার মাধ্যমে তার উপন্যাস হয়ে উঠেছে অসাধারণ এবং সর্বগ্রহণযোগ্য। আহমদ ছফার গদ্যে মাটির গন্ধ। অসাধারণ সব উপমা-প্রতীকের ব্যবহার।

আহমদ ছফা প্রতিবাদী, আপসহীন, নির্ভীক, প্রাণোচ্ছল এক জীবনাবাদী এক সমাজসচেতন লেখক। লেখালেখির মাধ্যমে আজীবন লড়াইয়ের এক পথকে অবলম্বন করেছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল সমাজের পরিবর্তন, রাষ্ট্রের পরিবর্তন, মানুষের অধিকার আদায়ের জন্যএকনিষ্ঠভাবে কাজ করা। আজীবন সেই লড়াইয়ের পথকে তিনি হাসিমুখে সাহিত্যের মাধ্যমে গ্রহণ করেছিলেন। তার কথাসাহিত্য বিশেষ করে উপন্যাস সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, ইতিহাস সর্বোপরী রাষ্ট্রের বসবাসরত মানুষের জীবনাল্লেখ্য ফুটিয়ে তুলেছেন। রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস কী, সমাজ কাঠামোর রূপান্তর-বিবর্তন কী, সমাজে বসবাসরত মানুষের বিচিত্র রূপ কেমন সবকিছুর ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছে আহমদ ছফার উপন্যাসে। তাই আহমদ ছফার উপন্যাস মানেই ইতিহাসের চর্চা, রাষ্ট্র-সমাজের নানা সঙ্গতি-অসঙ্গতি সম্পর্কে জানাশোনা, আহমদ ছফার উপন্যাস মানেই মানুষ-প্রকৃতির নানা আদল সম্পর্কে জানা। কেবল নিছক কাহিনি নয় আহমদ ছফার উপন্যাস হয়েছে সমাজ-রাষ্ট্রের বিভিন্ন সময়ে দলিল।

আহমদ ছফার চিন্তাশীল সৃষ্টি থেকে নানা রসদ সংগ্রহ করার আছে। তার ভাষার অন্তবর্তী সত্তা ও স্বভাব ছিল অগ্নিকাণ্ড, যৌক্তিক বিরোধের, দ্রোহের, প্রচণ্ড প্রতিবাদের। আহমদ ছফার আগ্নেয় প্রতিবাদের ভাষা হতে পারে আমাদের জাতীয় জীবনের ক্রান্তি ও সংকট উত্তরণের ভাষা।

গ্রন্থপঞ্জি

মূলগ্রন্থ

আহমদ ছফা

ক. উপন্যাস

সূর্য তুমি সাথী : আহমদ ছফা : *উপন্যাসসমগ্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা. ১৫-১০৬

ওঙ্কার : আহমদ ছফা : *উপন্যাসসমগ্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা. ১০৭-১৩০

একজন আলি কেনানের উত্থান পতন : আহমদ ছফা : *উপন্যাসসমগ্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা. ১৩১-১৮২

মরণ বিলাস : আহমদ ছফা : *উপন্যাসসমগ্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা. ১৮৩-২৩৬

অলাতচক্র : আহমদ ছফা : *উপন্যাসসমগ্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা. ২৩৭-৩৫৬

গাভী বিত্তান্ত : আহমদ ছফা : *উপন্যাসসমগ্র*, মাওলা ব্রাদার্স,

ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা. ৩৫৭-৪৬৬

পুষ্প বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ : আহমদ ছফা : *উপন্যাসসমগ্র*, মাওলা ব্রাদার্স,

ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা. ৪৬৭-৫৩৮

অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী : আহমদ ছফা : *উপন্যাসসমগ্র*, মাওলা ব্রাদার্স,

ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা. ৫৩৯-৬৭১

খ . গল্পগ্রন্থ : *দোলো আমার কনকচাঁপা*, কালিকলম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৮

: *নিহত নক্ষত্র*, কালিকলম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৯

গ. প্রবন্ধ : *জাগ্রত বাংলাদেশ*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭১

: *বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস*, প্রকাশভবন, ঢাকা ১৯৭২

: *বাংলা ভাষা : রাজনীতির আলোকে,* সুবর্ণ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৭৫

: *বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা*, দিগন্ত প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৭৫

: *বাঙালি মুসলমানের মন*, উত্থানপর্ব পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৬।

: *সংশয়ী রচনা*, মূল : বর্ট্রান্ড রাসেল, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২

: *আহমদ ছফার নির্বাচিত প্রবন্ধ*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৯২

: *আনুপূর্বিক তসলিমা ও অন্যান্য স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৯৪

: *সংকটের নানান চেহারা*, বার্ড প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৬

: *সাম্প্রতিক বিবেচনা : বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস*, প্রাচ্যবিদ্যা, ঢাকা, ১৯৯৭

: *শতবর্ষের ফেরারী : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়*, প্রাচ্যবিদ্যা, ঢাকা, ১৯৯৭

: *শান্তিচুক্তি ও অন্যান্য নিবন্ধ*, ইনফো পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৯৮

: *রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক প্রবন্ধ*, জাগৃতি, ঢাকা, ২০০০

: *বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র*, শ্রী প্রকাশ, ঢাকা, ২০০১

: *উপলক্ষের লেখা*, শ্রীপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০১

: *রাজনীতির লেখা*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ১৯৯৩

ঘ. কবিতা : *দুঃখের দিনের দোহা*, বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৯৭৫

: *একটি বটের গাছে প্রার্থনা*, বুক সোসাইটি, ঢাকা ১৯৭৭।

: *গো-হাকিম*, কলি-কলম, ঢাকা, ১৯৭৭

: *লেলিন ঘুমোবে এবার*, নিপ্পন একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯

: *জল্লাদ সময়*, প্রকাশ ভবন, ঢাকা, ১৯৭৫

ঙ. ইতিহাসগ্রন্থ : *সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস*, বুক সোসাইটি, ঢাকা ১৯৭৯

চ. স্মৃতিকথা : *যদ্যপি আমার গুরু*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮

প্রকাশক্রম অনুসারে আহমদ ছফার উপন্যাসসমূহ

সূর্য তুমি সাথী (১৯৬৭), *ওঙ্কার* (১৯৭৫) *একজন আলি কেনানের উত্থান-পতন* (১৯৮৮) *মরণ বিলাস* (১৯৮৯), *অলাতচক্র* (১৯৯৩) *গাভী বিত্তান্ত* (১৯৯৫), *অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী* (১৯৯৬), *পুষ্প বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ* (১৯৯৬)

সহায়কগ্রন্থ

অমলেন্দু দে : *স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা : প্রয়াস ও পরিণতি*, রত্না প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৫

অচ্যুত গোস্বামী : *বাংলা উপন্যাসের ধারা*, তৃতীয় সংস্করণ, কল্লোল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪

অশ্রুকুমার সিকদার : *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৮

আনিসুজ্জামান : *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য*, প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৯৯

আবদুল মুমিন চৌধুরী ও অন্যান্য : বাংলাদেশের ইতিহাস, ৭ম সংস্করণ, অষ্টম পুনর্মুদ্রণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯৯

অ্যান্থনি মাসকেরেনহাস : অনুবাদ মোহাম্মদ শাজাহান, বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ, হাক্কানি পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, জুলাই ২০০৬

আহমেদ মাওলা : *বাংলাদেশের উপন্যাসের শৈলী*, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯

কামরুদ্দিন আহমদ : *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, স্টুডেন্ট পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৩৭৬

: *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*, ইনসাইড লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৯৯৭

গাজী আজিজুর রহমান : *আধুনিক বাংলা উপন্যাসের বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাতিঘর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯

জয়া চ্যাটার্জী : *বাংলা ভাগ হল* (আবু জাফর অনূদিত), দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৩

দেবীপদ ভট্টাচার্য : *উপন্যাসের কথা*, সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬১

দেবেশ রায় : *উপন্যাস নিয়ে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯১

নাসির আলী মামুন : *আহমদ ছফার সময়*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা ২০১৩

নূরুল আনোয়ার : *ছফামৃত*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১০

: *আহমদ ছফার সাক্ষাৎকারসমগ্র* (সম্পাদিত), খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১৩

ফরিদা সুলতানা : *বাংলাদেশের উপন্যাসের জীবন চেতনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯

ফজলুল বারী : একাত্তরে কলকাতা, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩

বাংলা একাডেমী : *বাংলাদেশের সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,

(সংকলন উপ-বিভাগ কর্তৃক সংকলিত), ১৯৮৮

বিশ্বজিৎ ঘোষ : *বাংলাদেশের সাহিত্য*, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯

ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম : মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, কাগজ প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯১

মনসুর মুসা : *পূর্ব বাংলার উপন্যাস*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ঢাকা, ২০০৮

মমতাজুর রহমান তরফদার : *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫

মোরশেদ শফিউল হাসান : *ছফা ভাই আমার দেখা আমার চেনা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২

মোরশেদ শফিউল হাসান ও

সোহরাব হাসান : *আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩

রণেশ দাশগুপ্ত : *উপন্যাসের শিল্পরূপ*, কালিকলম প্রকাশনী, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, ঢাকা

রফিকউল্লাহ খান : *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭

: *কথাসাহিত্যের বিচিত্র বিষয় ও নন্দনতত্ত্ব*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০২

শহীদ ইকবাল : *বাংলাদেশের উপন্যাসে রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য*, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০

শহিদুল ইসলাম : *দেশভাগ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

শারমিন আহমদ : *তাজউদ্দীন আহমদ নেতা ও পিতা*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০১৪

শামসুল আরেফিন : *আহমদ ছফার অন্দরমহল*, বলাকা প্রকাশনী, চট্টগ্রাম ২০০৪

শেখ মাসুম কামাল : *প্রসঙ্গ : আহমদ ছফার মানস প্রকৃতি ও শিল্পানুভূতি*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ২০০৯

সলিমুল্লাহ খান (সম্পাদিত) : *বেহাত বিপ্লব* ১৯৭১, ১ম খণ্ড, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৭

: *আহমদ ছফা সঞ্জীবনী*, আগামী প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১০, ঢাকা

সাঈদ-উর-রহমান : *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ২য় সংস্করণ, ঢাকা, ২০০১

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : *দ্বিজাতি তত্ত্বের সত্য-মিথ্যা*, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩

সৈয়দ আকরম হোসেন : *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৭

হাসান হাফিজুর রহমান : *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, তথ্যমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮২

হাসান আজিজুল হক : *কথাসাহিত্যের কথকতা*, সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৯৪

হাবিব রহমান : *বাঙালি মুসলমানের সামাজিক ইতিহাস কতিপয় প্রসঙ্গ*, ধ্রুবপদ, ঢাকা

২০১০

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

Alan Friedman : The turn of The Novel : The Translation of Modern Fiction, New York and London, 1988

Christopher Hichens: The trial of Henry Kissinger, New York : verso, 2001

E. M Forster : Aspects of the Novel, Penguin Books, Reprinted New York, 1988

Jeremy Hawthorn : Studing The Novel : an introduction, Third Edition, Arnold, a member of the Hodder Headline Gorup, London, 1997

Lawrence Lifchurlz : Bangladesh : The Unfinished Revolution, London, Zed Press, 1979

Siddik alik : Witness to surrender, Dhaka, The University Press limited (by Arrangement with oxford University Press Karachi), 1997

W. J. Harvey : Character and the Novel, cornel University Press, Ithaca, New York, 1965

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সহায়ক-প্রবন্ধ

আফজালুর রহমান : *আহমদ ছফার সাধনা*, আহমদ ছফা স্মৃতিবক্তৃতা ১১, *সর্বজন*, আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা, ২০১৩, ঢাকা

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী : 'বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতি এত অগোছালো কেন' বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

খালেদা খাতুন : *আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা এবং লিঙ্গীয় সম্পর্ক নিয়ে অধিপতির ভাবনাজাল*, খালেদা খাতুন, রাষ্ট্রসভা পত্রমালা-২, ঢাকা ২০০২

টোবিয়াস শুয়েট : *কি পরিপূর্ণ জীবন! আহমদ ছফাকে মনে পড়ে*, আহমদ ছফা বিদ্যালয়, ২০১৪, ঢাকা

তাজউদ্দীন আহমদ : ইতিহাসের পাতা থেকে, দৈনিক বাংলা, ডিসেম্বর ১৩, ১৯৭২

নাজমা জেসমিন চৌধুরী : *'মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস'*, উত্তরাধিকার, ঢাকা, ৯ম বর্ষ, ৯ম-১০ ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৮০

নাসির আলী মামুন : *আহমদ ছফা পূর্বদেশের মনীষী*, রাষ্ট্রসভা পত্রমালা ৫, আহমদ ছফা স্মৃতিবক্তৃতা ২০০৪, ঢাকা

ফারহানা শাহরিন : *ইতিহাসের বাঁকচিহ্ন ও আহমদ ছফার উপন্যাস*, সাহিত্য গবেষণাপত্র, বর্ষ ১, সংখ্যা, ১, ২০১৪, বাংলা বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

মোমেনুর রসুল : *আহমদ ছফার উপন্যাসে সমাজ ও রাজনীতি*, সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ : ৪৯, সংখ্যা : ১, অক্টোবর ২০১১, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

রশীদ করীম : *আহমদ ছফার 'ওঙ্কার'*, জিজ্ঞাসা, সপ্তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৯৩

হাফিজুর রহমান কার্জন : *'আত্মঘাতি ছাত্ররাজনীতি আর কতদিন'* দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ আগস্ট ২০১২, ঢাকা।

সলিমুল্লাহ খান : *আহমদ ছফার সত্য ও সাহিত্য : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, সর্বজন, আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা, ঢাকা, ২০১৪

: *পুষ্প বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ' ও মার্কিনদেশের ডানাহম পরিবার*, সর্বজন, আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা, ঢাকা, ২০১৪

: *অলাতচক্র : আহমদ ছফার একখানা চিঠি প্রসঙ্গে*, সর্বজন, আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা, ঢাকা, ২০১৪

সরদার আবদুস সাত্তার : *আহমদ ছফা আলোকপথের অভিযাত্রী*, আহমদ ছফা স্মৃতিবক্তৃতা, আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা, ঢাকা, ২০১৫

সামসুদ্দোহা সাজেন : *১৯৬৯ সালের গণ অভুত্থান ও নতুন জাতির অভ্যুদয়*, আহমদ ছফা জন্মদিন বক্তৃতা ২০১৫, ঢাকা

সুদীপ্ত হান্নান : *আহমদ ছফার উপন্যাস : বাংলাদেশের জন্ম ও বিকাশের রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যাকরণ*, দ্বাদশ আহমদ ছফা স্মৃতিবক্তৃতা, আহমদ ছফা বিদ্যালয়, ২০১৪, ঢাকা